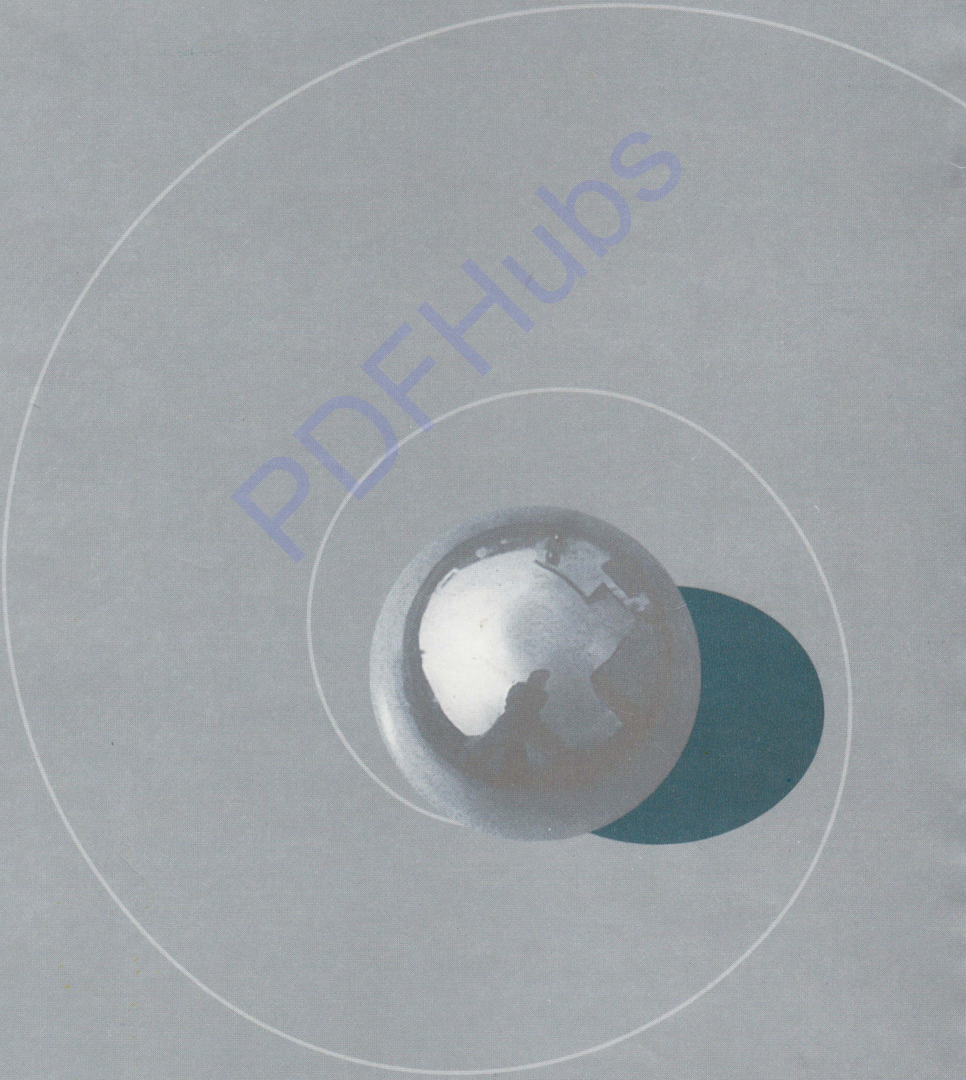
অলাতচক্র

আহমদ ছফা



অলাতচক্র

রচনা-১৯৮৫

আহমদ ছফা

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984-408-111-4

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০১২

কে এম ফিরোজ খান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত
মৌমিতা প্রেস, ২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার জার্মান বন্ধু
পিটার জেবিৎসকে

for more books visit: https://pdfhubs.com

ভূমিকা নয়

আহমদ ছফা 'অলাতচক্র' উপন্যাসটি লিখেছিলেন ১৯৮৫ সালে। সাপ্তাহিক 'নিপুণ' পত্রিকার ঈদ সংখ্যার জন্য লেখাটি তাঁকে লিখতে হয়েছিল। শুরুর তারিখটি ছিল ১০ মে। মাত্র বারদিনের মাথায় লেখাটি তাঁকে শেষ করতে হয়েছিল। অনেকটা তাড়াহুড়োর মধ্যে। ব্যত্যয় ঘটলে এ পত্রিকার মাধ্যমে উপন্যাসটি আলোর মুখ দেখত না। উপন্যাসটি তো নিপুণে প্রকাশ পেল। কিন্তু লেখাটি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। নানাজনের আপত্তিও ছিল। তখনই তিনি ঠিক করেছিলেন উপন্যাসটি পুনরায় লিখবেন। এ কাজে তাঁকে নামতে হয়েছে আরও কয়েক বছর পরে। নানা জনের আপত্তির কারণে তিনি উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের নামও পরিবর্তন করেছিলেন।

অনেক চড়াইউতরাই পেরিয়ে ১৯৯৩ সালে মুক্তধারা থেকে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটা পাঠকের হাতে হাতে পৌঁছে যায়। কিন্তু নিপুণে প্রকাশিত সেই আদিরূপটির কথা আমরা বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর না হলে এমনতর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন ভুলেননি, তিনি পণ্ডিত ড. সলিমুল্লাহ খান। তিনি আদিরূপটি খুঁজে পাবার জন্য যত্রতত্র চষে বেড়িয়েছেন। একসময় তিনি সফলও হয়েছেন। তাঁর মতে, আহমদ ছফার সাহিত্যে অলাতচক্রের আগের লেখাটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

তিনি লেখাটি উদ্ধারের পর তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত এবং এ কে এম আতিকুজ্জামান সম্পাদিত পত্রিকা 'অর্থে' হুবহু ছেপেছেন কোন রকম পরিবর্তন, পরিমার্জন ছাড়াই। ড. খান তারই কোমল কপিটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। যেই কারণে কোন রকম বাড়তি ভোগান্তিতে আমাদের পড়তে হয়নি। অর্থ পত্রিকার ছাপা লেখাটি আমরা অলাতচক্রের আদিরূপ হিসেবে অনেকটা কপি করেই এখানে জুড়ে দিলাম। ড. খানের অনুরোধে একাজটি করতে হল, তাঁর প্রতি সম্মান রেখে। পরিশিষ্টে তাঁর একটি মূল্যবান আলোচনাও সংযুক্ত করে দেয়া হল। এ লেখাটির মাধ্যমে অলাতচক্র উপন্যাসের আদি এবং নতুন দুটি রূপের সাদৃশ এবং বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রেগুলো খুঁজে পেতে পাঠকদেরকে সাহায্য করবে আশা করি।

—প্রকাশক

এক

আমি যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছলাম, সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। মনুমেন্টের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে নামছে। রবীন্দ্রসদনের এদিকটাতে মানুষজন গাড়িঘোড়ার উৎপাত অধিক নয়। মহানগর কলকাতার এই বিশেষ স্থানটি অপেক্ষাকৃত শান্ত নিরিবিলি। বিশেষ করে এই ক্ষণটিতে, যখন গোধূলির সঙ্গে বিদ্যুতের আলোর দৃষ্টি বিনিময় হয়।

ঝাঁকড়া গাছগুলোর ছায়া রাস্তার ওপর বাঁকা হয়ে পড়েছে। এখানে-সেখানে নগরকাকের কয়েকটি জলসা চোখে পড়ল। পরিবেশের প্রভাব বলতে হবে। বায়সকুলের সমবেত কাংসাধ্বনিও মোলায়েম কর্কশতাবর্জিত মনে হয়। ট্রাফিকের মোড়টা বাঁয়ে রেখে পি. জি. হাসপাতালে ঢোকার পর মনে হল, লাল ইটের তৈরি কমপ্লেক্স বিল্ডিং আমাকে আস্ত গিলে খাওয়ার জন্য যেন উদ্যত হয়ে রয়েছে।

হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ারের সময় শেষ হয়ে আসছে। মানুষজন চলে যেতে শুরু করেছে। আমার কর্তব্য কী ঠিক করতে না পেরে কম্পাউন্ডের প্রাচীর-ঘেঁষা নিমগাছটির তলায় দাঁড়িয়ে একটা চারমিনার জ্বালালাম। আমি একজনের খোঁজ করতে এসেছি। কিন্তু জানিনে কোন ওয়ার্ডে কত নম্বর বেডে আছে। তার ওপর নতুন জায়গা এবং আমি পরিশ্রান্ত। সুতরাং সিগারেট খেয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হল।

এই যে দাদা আগুনটা দেবেন ? একজন মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলল। গায়ে হাসপাতালের ইউনিফরম। আমার যা অবস্থা মনে হল অকূলে কূল পেয়ে গেলাম। মানুষটা লম্বাটে, বাঁ চোখটা একটু ট্যারা। দারোয়ান হতে পারে, ওয়ার্ডবয় হতে পারে, আবার মেল নার্স হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি ম্যাচ জ্বালতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিল লোকটি। আহা শুধুশুধু একটা কাঠি নষ্ট করবেন কেন ? দিন না সিগারেটটা। আমার হাত থেকে আধপোড়া সিগারেটটি নিয়ে লোকটি নিজের সিগারেট জ্বালাল।

ভাগ্যটা যে ফর্সা একথা মানতেই হবে। না চাইতে হাসপাতালের একজন খাস মানুষ পেয়ে যাওয়ায় মনে হল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি জিগগেস করলাম, আচ্ছা দাদা, আপনি কি এই হাসপাতালের লোক ? নাকে মুখে প্রচুর ধূম্ররাশি উদ্গিরণ করে জানাল, আমি চৌদ্দ নম্বর ফিমেল ওয়ার্ডে আছি। তারপর আমার দিকে একটা তেরছা দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, আপনি বুঝি

জয়বাংলার মানুষ। আমার জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কাপড়চোপড় মুখভর্তি দাড়ি এসব পরিচয়পত্রের কাজ করল। লোকটা এরই মধ্যে হাতের সিগারেটটি শেষ করে একটুখানি আমার কাছে ঘেঁষে এল। তারপর নিজে নিজেই বলতে থাকল, মশায় আজ সারাদিন কী হ্যাঙ্গামটাই না পোহাতে হল। তিন দিন ব্যাটা অ্যাবসেন্ট। ডবল ডিউটি করতে হচ্ছে। দিন আপনার একখানি চারমিনার। এখখুনি আবার ডাক পড়বে। এমন একটা মোক্ষম মওকা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম। পারলে গোটা প্যাকেটটাই দিয়ে দিতাম। আপাতত সেরকম কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়ায় একটি শলাকাতেই আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। লোকটার সিগারেট টানার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। অসন্তুষ্ট বিরক্ত শিশু যেমন মাতৃস্তনে মুখ লাগিয়ে গিসগিসিয়ে টান মারে সেরকম একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হতে চায়। কপালের বলিরেখাগুলো জেগে ওঠে, চোখের মণি দুটো বেরিয়ে আসতে চায়। বোধ হয় আমাকে খুশি করার জন্যই বলল, জানেন দাদা, আমাদের ওয়ার্ডে আপনাদের জয়বাংলার একটি ফিমেল পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। লোকটা এ পর্যন্ত দু দুবার জয়বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করল। কলকাতা শহরের লোকদের মুখে ইদানীং জয়বাংলা শব্দটি শুনলে আমার অস্তিত্বটা যেন কুঁকড়ে আসতে চায়। শেয়ালদার মোড়ে মোড়ে সবচে সস্তা, সবচে ঠুকনো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের নাম জয়বাংলা স্যান্ডেল। এক হপ্তার মধ্যে যে-গেঞ্জি শরীরের মায়া ত্যাগ করে তার নাম জয়বাংলা গেঞ্জি। জয়বাংলা সাবান, জয়বাংলা ছাতা কতকিছু জিনিস বাজারে বাজারে ছেড়েছে কলকাতার ব্যবসায়ীরা। দামে সস্তা, টেকার বেলায়ও তেমন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ট্যাকের দিকে নজর রেখে এ সকল পণ্য বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিছুদিন আগে যে চোখওঠা রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কলকাতার মানুষ মমতাবশত তারও নামকরণ করেছিল জয়বাংলা। এই সকল কারণে খুব ভদ্র অর্থেও কেউ যখন আমাদের জয়বাংলার মানুষ বলে চিহ্নিত করে অল্পস্বল্প বিব্রত না হয়ে উপায় থাকে না।

সে যাকগে। আমি জিগগেস করলাম, আপনার ওয়ার্ডের বাংলাদেশের পেশেন্টটির কী নাম জানেন? নামধাম জানিনে। উনি আছেন উনত্রিশ নম্বর বেডে। বললাম, আমি এসেছি একজন রোগিণীর খোঁজে। কী অসুখ, কোথায় ভর্তি হয়েছে কিছুই বলতে পারব না। আপনি কি এ ব্যাপারে কোনো উপকার করতে পারেন? চারমিনারের অবশিষ্ট সিগারেটগুলো তার হাতে তুলে দিলাম। লোকটা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, চলুন না চৌদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে, উনত্রিশের পেশেন্টটি যদি হয়ে যায়, তা হলে তো পেয়েই গেলেন। উনত্রিশের পেশেন্ট জয়বাংলার অন্য কোনো পেশেন্ট থাকলে সে খবরও হয়তো বলতে পারবে।

পিছে পিছে এল টাইপের একতলা বিল্ডিংটির লনের কাছে এলাম। লোকটি বলল, একটু দাঁড়ান, জিগগেস করে দেখি। চার পাঁচজন মহিলা লনে পায়চারি করছে। সেদিকে লক্ষ্য করেই হাঁক দিল, এই যে জয়বাংলার দিদিমণি। আপনাদের দেশের এক ভদ্দরলোক একজন ফিমেল পেশেন্টের খোঁজ করছেন। দেখুন তো সাহায্য করতে

পারেন কিনা। আমি তাকিয়ে দেখলাম, কপালের দিকে সরে আসা চুলের গোছাটি সরাতে সরাতে তায়েবা সুরকি বিছানো পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে ডাকছ নাকি গোবিন্দদা ! আজ্ঞে দিদিমণি আপনাদের জয়বাংলার এক ভদ্দরলোক একজন ফিমেল পেশেন্ট তালাশ করছে। আপনি একটু কথা বলে দেখুন তো।

এতক্ষণে জানা গেল লোকটির নাম গোবিন্দ। তায়েবা এরই মধ্যে তার পুরোনো সম্পর্ক পাতানোর ব্যাপারটি চালু করে ফেলেছে দেখছি। আমার চোখে চোখ পড়তেই তায়েবার চোখজোড়া আনন্দে চকচক করে উঠল। পিঠের ওপর ঢলের মতো নেমে আসা ছড়ানো চুলের রাশিতে একটা কাঁপন জাগিয়ে বলল, এঁকে কোথায় পেলে গোবিন্দদা। দিদিমণি আপনার অতসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, আমি চললাম। ডা. মাইতি আমাকে ওয়ার্ডে না পেলে একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। ডা. মাইতির কাঁচা খাওয়া থেকে বাঁচার জন্যই গোবিন্দ চলে গেল।

তায়েবাকে দেখাচ্ছে সুন্দর। এই কমাস তার চেহারায় একটা বাড়তি লাবণ্য ফুটেছে। তার পিঠঝাঁপা অবাধ্য চুলের রাশি। চোখে না দেখলে চিনে নিতে কয়েক মিনিট সময় নিত। তায়েবার এমন সুন্দর, সুগঠিত শরীরের কোথায় রোগ ঢুকে তাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে ভেবে ঠিক করতে পারিনে। আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে জিগগেস করল, দানিয়েল ভাই, এতদিন আসেননি কেন ? সেকথার জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন যে ? যান আপনার সঙ্গে কোনো কথা নেই। যান চলে যান। পরক্ষণে হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। এই যে আরতিদি, শিপ্রা, মঞ্জুলিকা, উৎপলা দেখে যাও কে এসেছে। তায়েবাকে কোনোদিন বুঝতে পারিনি। বোঝার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছি। পায়ে পায়ে চারজন নারীমূর্তি এগিয়ে এল এবং আমার মনে একটা খারাপ চিন্তা জন্ম নিল। এ সমস্ত মহিলা রোগ সারাতে হাসপাতালে এসেছে না বিউটি কম্পিটিশন করতে এসেছে। তায়েবা বলল, আসুন আরতিদি পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন দানিয়েল ভাই, ভীষণ প্রতিভাবান মানুষ। এস. এস. সি. হতে এম. এ. পর্যন্ত সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছেন। স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাবার ব্যবস্থাও পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল, মাঝখানে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল, তাই...। আর আরতিদির বাড়ি ছিল আপনাদের চাঁটগায়ে। আমার পাশের কেবিনে থাকেন। এ হচ্ছে শিপ্রা গুহঠাকুরতা। বরিশালের বানারী পাড়ার মেয়ে। আর যে মঞ্জুলাকে দেখছেন তারও আসল বাড়ি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। পোড়ামুখী তিন বছর ধরে এই হাসপাতালে ডেরা পেতে আছে। অবেশেষে উৎপলার হাত ধরে বলল, এর পরিচয় আপনি জানতে পারবেন না। ওর সাতপুরুষের কেউ কস্মিনকালেও পদ্মার হেপাড়ে যায়নি। একেবারে জাত ঘটি তার ওপর আবার ব্রাহ্মণকন্যা। এখন ঠেকায় পড়ে এই মেলেচ্ছনির সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হচ্ছে। রাত্রিবাস শব্দটি এমন এক বিশেষ ভঙ্গি-সহকারে উচ্চারণ করল সকলে হো হো করে হেসে উঠল। এই ঘটা করে পরিচয় করানোটা যে আমার ভালো লাগেনি তায়েবার অজানা থাকার কথা নয়। তুচ্ছ

জিনিসকে বড় করে দেখানোর ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। কিন্তু আজকের বাড়াবাড়িটা সমস্ত সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। জীবনে আমি ফার্স্ট সেকেন্ড কোনোদিন হতে পারিনি। একবার উত্তীর্ণ ছাত্রমণ্ডলীর তালিকায় ওপরের দিক থেকে লাস্ট এবং শেষের দিক থেকে ফার্স্ট হয়েছিলাম। গোটা ছাত্রজীবনে সাফল্যের সেই ধারাটিই আমি মোটামুটিভাবে রক্ষা করে আসছি। এজন্য আফসোসও নেই। বরঞ্চ পরীক্ষায় যারা ভালোটালো করে, তাদের প্রতি রয়েছে আমার মুদ্রাগত আক্রোশ। মুখে সাত আট দিনের না-কামানো দাড়ি। পায়ে জয়বাংলা চপ্পল, জামাকাপড়ও তেমনি। অনাহার অর্ধাহার অনিদ্রার ছাপ মুখে ধারণ করে আমি জয়বাংলার মূর্তিমান শিলাস্তম্ভে পরিণত হয়েছি। এটাই আমার বর্তমান, এটাই আমার অস্তিত্ব। এই কলকাতা শহরে অনেক মানুষ আমাদের সমাদর করেছে, আশাতীত দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছে, অনেকে হেলাফেলাও করেছে। ভালো লাগুক খারাপ লাগুক সব নির্বিচারে মেনে নিয়েছি। কিন্তু তায়েবার আজকের আচরণ আমার কাছে একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা বলে মনে হল। তার ঠিকানা সংগ্রহ করে হাসপাতাল অবধি আসতে আমাকে কি কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ! পারলে মুখে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সোজা পা ঘুরিয়ে ফেরত চলে যেতাম। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। তা ছাড়া শরীরে মনে এতদূর ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত ছিলাম যে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় আনকোরা একটি অভাবিত নাটক জমিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

তায়েবা আমাকে তার কেবিনে নিয়ে গেল। দুটো মাত্র খাট, পানির বোতল, গ্লাস ইত্যাদি রাখার একটা কাঠের স্ট্যান্ড, স্টিলের একটা মিটসেফ জাতীয় বাক্স, যেখানে প্রয়োজনমতো কাপড়চোপড় রাখা যায় এবং ভিজিটরদের জন্য একটি টুল...এই হল আসবাবপত্তর। তায়েবা বিছানায় উঠে বালিসটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে আমাকে টুলটা দেখিয়ে বলল, বসুন। জানেন তো ভিজিটরদের রোগীর বিছানায় বসতে নেই। তা ছাড়া আপনার পায়ে সব সময়ে রাজ্যের ময়লা থাকে, কোনো সুস্থ মানুষও যদি আপনাকে বিছানায় বসতে দেয়, পরে পস্তাতে হয়। কথাটা সত্যি। তায়েবারা গেন্ডারিয়ার বাসায় আমাকে কোনোদিন সরাসরি বিছানায় বসতে দেয়নি। আমি বাসায় গেলে, আগেভাগে আরেকটি চাদর বিছিয়ে দিত। তারপর আমি বসতাম। এভাবে খাটজোড়া ধবধবে সাদা চাদরের অকলঙ্ক শুভ্রতা রক্ষা করা হত।

এই সময়ে হাসপাতালের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল। না চাইতেই একটা সুযোগ আমার হাতে এসে গেল। আমতা আমতা করে বললাম, জায়গাটি তো চেনা হল আরেকদিন নাহয় আসা যাবে। আজ চলি। যতই মৃদুভাবে বলিনা কেন, আমার কথাগুলোতে রাগ ছিল, ঝাঁঝ ছিল। এটুকু না বুঝতে পারার মতো বোকা নিশ্চয়ই তায়েবা নয়। সে শশব্যস্তে বলল, সেকী, কতদিন পরে এলেন, এখখুনি চলে যাবেন ? বসুন, দু চারটা কথাবার্তা বলি। আমি বললাম, শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এখন যাওয়াই উত্তম। তায়েবা শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, সেজন্য আপনাকে

চিন্তা করতে হবে না, আমি মাইতিদাকে বলে সব ম্যানেজ করে নেব। আমি স্পষ্টতই অনুভব করলাম, আমার বুকের ভেতরে ঈর্ষার একটা কুটিল রেখা। জানতে চাইলাম, মাইতিদাটি কে? জবাবে বলল, মাইতিদা হচ্ছে ডা. মাইতি। অসম্ভব ভালো মানুষ কিন্তু বাইরে ভদ্রলোক ভীষণ কড়া। একটু পরেই আসবেন, আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন কী সুন্দর মন। তার কথায় আমি স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলাম। দোহাই তায়েবা উদ্ধার করো। দিদিমণিদের সামনে তুমি আগে একটা সার্কাস দেখিয়ে ফেলেছ। আরো একটা সার্কাস তুমি তোমার মাইতিদার সামনে দেখাবে বলে যদি মনস্থ করে থাক, আমি তাতে রাজি হতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমি চলি। সুন্দর মনের মানুষদের নিয়ে তুমি থাকো। তোমার সুন্দর মনের মানুষদের গুণপনা এই সময়ে গোটা কলকাতা জেনে ফেলেছে।

তায়েবা হঠাৎ সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। আপনি আমার অসুখের সংবাদ নিতে এসেছেন, নাকি যেসব কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে, সেগুলো পাঁচ কাহন করে বলতে এসেছেন। চলে যান, আপনি এখখুনি চলে যান। একখানা লাউড স্পিকার ভাড়া করে আমার লোকদের কথা কলকাতা শহরে ঘটা করে প্রচার করুন। ভাড়ার টাকা আমি দেব। এই আচমকা বিস্ফোরণে আমি দমে গেলাম। টুলটা নেড়ে বিছানার কাছে এসে বসতে বসতে বললাম, তুমি এই মহিলাদের সামনে আমাকে এমনভাবে অপমানটা করলে কেন? কই অপমান করলাম, কোথায় অপমান করলাম? মনটা আপনার অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই যে বললে প্রতি বছরে আমি ফার্স্ট হয়ে আসছি। বারে, অন্যায় কী করেছি। আপনি তো অনেক কাজ করে পড়াশোনা করেন। সব ছেড়েছুড়ে একটুখানি মন লাগালে আপনিও অনায়াসে ফার্স্টটাস্ট কিছু একটা হতেন। আর যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হয় তারা আপনার চাইতে ভালো কিসে? নিজের তারিফ শুনতে কার না ভালো লাগে। মনের উষ্মার ভাবটি কেটে গেল। আমি হাসিমুখে বললাম, আর বিলেত যাওয়ার ব্যাপারটি। আরে দূর দূর ওটা একটা ব্যাপার নাকি, আজকাল কুকুর বেড়ালেরাও হরদম বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে। আপনিও চাইলে অবশ্যই যেতে পারেন। তাছাড়া...। আমি বললাম, তা ছাড়া আর কী। তা ছাড়া আপনি একটা গেঁয়োভূত। একেবারে মাঠ থেকে সদ্য-আসা একটি মিষ্টি কুমড়ো। আমি বললাম, আমি যে মিষ্টি কুমড়ো সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কুকুর বেড়ালও বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে একথা সত্যি। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ টিকিট করে ওসব দেশে যেতে হয়। আপনি সব কথার কুষ্ঠিনামা বের করতে চান। চাল বোঝেন চাল? ঐ মেয়েরা প্রতিদিন কথায় কথায় আমার সঙ্গে চাল মারে। আজ নাহয় আমিও একটা চাল মারলাম। আপনি এটুকুও বোঝেন না? তুমি তো পরিচয় করিয়ে দিলে, তোমার দিদি, তোমার সই, তোমার বান্ধবী— এখন বলছ সব চালবাজ। আমার দিদি, আমার সই, আমার বান্ধবী ঠিক আছে, কিন্তু চাল মারতে অসুবিধেটা কোথায়? আপনি মেয়েদের সম্পর্কে জানেন কচু। সে বুড়ো আঙুলটি উঠিয়ে দেখাল।

শুনুন দানিয়েল ভাই, তায়েবা ঝলমল করে উঠল। সেদিন হাসপাতালে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। এখানকার ধনী ঘরের এক মহিলা সেদিন বিউটি পারলারে গিয়ে ছাতার মতো এক মস্ত খোঁপা তৈরি করিয়ে আনে। বাড়ি আসার পরে কী হল জানেন, মহিলার মনে হল তার মগজের ভেতর কিছু একটা নড়ছে, লাফ দিচ্ছে। এ রকম একটা আজগুবি অসুখের কথা কেউ কখনো শোনেনি। সকলের খুব দুশ্চিন্তা। অনেক ডাক্তার দেখানো হল। কেউ বিশেষ কিছু করতে পারল না। মহিলাকে নাকি স্যার নীলরতন হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। সেখানে ডাক্তারেরা কিছু করতে পারেনি। অবশেষে তাকে একরকম ফেন্ট অবস্থায় এ হাসপাতালে আনা হয়। ডাক্তারেরা স্থির করেন, মহিলার খোঁপাটি খুলে যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখতে হবে মগজের ঘটনাটি কী। সত্যি সত্যি নার্সরা যখন মাথার খোঁপাটি খুলতে লেগে গেল, মহিলা ফেন্ট অবস্থায়ও দু হাত দিয়ে খোঁপা খুলতে বাধা দিচ্ছে। পরে যখন খোপা খোলা হল অমনি এক টিকটিকি বাহাদুর লেজ দুলিয়ে লাফ দিল। খোঁপা বাঁধার কোন ফাঁকে আটকা পড়ে গেছে টের পায়নি। সেই থেকে টিকটিকিটি যতই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, মহিলার মনে হয়েছে, মাথার মগজ খুলি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সত্যি ঘটনা, বুঝলেন মেয়েরা কেমন হয়? আমি বললাম, যতদূর জানি, তুমিও তো একজন মেয়ে, তোমার বিষয়েই বা অন্যরকম হবে কেমন করে। তায়েবা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলল, আপনি এখনো মিষ্টি কুমড়োই থেকে গেছেন। কিছু শিখতে পারেন নি।

এই সময়ে ডান হাতে স্টেথেসকোপ দোলাতে দোলাতে এক ভদ্রলোক কেবিনে প্রবেশ করলেন বয়েস খুব বেশি হবে না। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের কোঠায়। চোখের দৃষ্টি অসম্ভব ধারালো। চেকন করে কাটা একজোড়া শাণিত গোঁফ। ধারালো চিবুক। একহারা গড়নের চেহারাখানা ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে খোলা তলোয়ারের মতো ঝকঝক করছে। সন্ধ্যার এ আলো-আঁধারিতেও আমার দৃষ্টি এড়াল না। আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই যে এদিকে আসুন তো। আমি এগিয়ে গেলে তিনি অনেকটা ধমকের ভঙ্গিতে জিগগেস করলেন, কি-বেল বাজল আওয়াজ শুনতে পাননি? আমি মৃদুস্বরে বললাম, পেয়েছি। পেয়েছেন তো হাসপাতালে বসে আছেন কেন? আপনাদের ঘাড় ধরে বের করে না দিলে শিক্ষা হবে না দেখছি। এই যে মাইতিদা থামুন, থামুন। আমাদের দুজনের মাঝখানে তায়েবা এসে দাঁড়িয়েছে। আপাতত আপনার চোখাচোখা কথাগুলো তুলে টুলে রাখুন। আমি কত বলেকয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য দানিয়েল ভাইকে সেই বিকেল থেকে আটকে রেখেছি। এদিকে আপনি তাঁকে ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছেন। ডা. মাইতি স্মিত হেসে বললেন, এই তোমার দানিয়েল ভাই, যিনি ফার্স্ট ছাড়া কিছুই হন না। মশায় আপনার অসাধারণ কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতে তো পাগল হবার উপক্রম। অধীর আগ্রহে দিন গুনছি, কখন এসে দর্শনটা দেবেন। শুনেছি মশায়ের কলকাতা আগমনও ঘটেছে, তায়েবার অনেক আগে। যাক ভাগ্যে ছিল, তাই দেখা হল। তিনি

আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি ওয়ার্ডে একটা রাউন্ড দিয়ে আসি।

উৎপলা এখনো বাইরে থেকে ফেরেনি। কেবিনে আমরা দুজনা, এই ফাঁকে আমি জিগগেস করলাম, তায়েবা, তোমার শরীর কেমন ? কেমন আছ ? রোগের অবস্থা কী ? তায়েবা মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, ওসব কথা থাকুক। আমার শরীর ভালো, আমি ভালো আছি। আমি বললাম, আগরতলা আসার সময় তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা। তোমরা তো আমার সঙ্গে এলে না। কলকাতা এসে খবর পেলাম, তোমরাও আগরতলা এসে একটা ক্যাম্পে উঠেছ। কলকাতায় নানাজনের কাছ থেকে নানাভাবে তোমার খবর পেয়েছি। একজন বলল, তোমাকে তিনদিন পার্ক সার্কাসের কাছে রাস্তা পার হতে দেখেছে। আরেকজন বলল, তুমি সকাল বিকেল তিনটি করে টিউশনি করছ। শেষ পর্যন্ত নির্মল একদিন এসে জানাল, তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। কোন হাসপাতাল, কী রোগ কিছুই জানাতে পারল না। তোমার ঠিকানা জোগাড় করতে যেয়ে প্রায় একটা খুনখারাবি বাধিয়ে বসেছিলাম। তায়েবা বলল, সে সব কথাও থাকুক। আপনার খবর বলুন, কোথায় আছেন, কখন এসেছেন ? দুবেলা চলছে কেমন করে ? বাড়িঘরের খবর পেয়েছেন ? আপনার মা বোন এবং ভায়ের ছেলেরা কেমন আছে ?

আমার তো বলবার মতো কোনো খবর নেই। তায়েবাকে জানাব কী ? কলকাতা শহরে আমরা কচুরিপানার মতো ভেসে ভেসে দিন কাটাচ্ছি, বিশেষ করে মুসলমান ছেলেরা। আমাদের সঙ্গে মা বোন বা পরিবারের কেউ আসেনি। সে কারণে শরণার্থী শিবিরে আমাদের ঠাঁই হয়নি। আমরাও শিবিরের মানুষদের প্রাণান্তকর কষ্ট দেখে মানে মানে শহরের দিকে ছিটকে পড়েছি এবং কলকাতা শহরে গুলতানি মেরে সময় যাপন করছি। একজন আরেকজনকে ল্যাং মারছি। বাংলাদেশের ফর্সা কাপড়চোপড় পরা অধিকাংশ মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন বেকার জীবনযাপনের ক্লেদ কলকাতার হাওয়া দূষিত করে তুলছে। আমরা সে হাওয়াতে শ্বাস টানছি। সীমান্তে একটা যুদ্ধ হচ্ছে, দেশের ভেতরেও একটা যুদ্ধ চলছে। অবস্থানগত কারণে আমরা সে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু পারি কই ? যুদ্ধে চলে গেলে ভালো হত। দেশের স্বাধীনতার কতটুকু করতে পারতাম জানিনে। তবে বেঁচে থাকবার একটা উদ্দেশ্য চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। আমার যুদ্ধে যাওয়া হয়নি। যুদ্ধকে ভয় করি বলে নয়। আমাদের দেশের যে সকল মানুষের হাতে যুদ্ধের দায়দায়িত্ব, তাঁরা আমাকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠাবার যথেষ্ট উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেননি। আমি তিন তিনবার চেষ্টা করেছি। প্রতিবারই মহাপুরুষদের দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছে। অবশ্য আমাকে বুঝিয়েছেন, আপনি যুদ্ধে যাবেন কেন ? আপনার মতো ক্রিয়েটিভ মানুষের ইউজফুল কতকিছু করবার আছে। যান কলকাতা যান। সেই থেকে কলকাতায় আছি। হাঁটতে বসতে চলতে ফিরতে মনে হয়, আমি শূন্যের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি। এসব কথা তায়েবাকে

জানিয়ে লাভ কী ? কোন বাস্তব পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তাকে এই হাসপাতাল অবধি আসতে হয়েছে সবটা না হলেও অনেকটা আমি জানি। তাকে খুশি করার জন্য বললাম, আমরা বাংলাদেশের বারো-চৌদ্দজন ছেলে বৌবাজারের একটা হোস্টেলে খুব ভালোভাবে আছি। তুমি তো দাড়িঅলা নরেশদাকে চিনতে। এই হোস্টেলে তাঁর তিন ভাই আগে থেকে থাকত। আমাদের অসুবিধে দেখে তারা দুটো আস্তরুম ছেড়ে দিয়েছে। রান্নাবান্না বাজার সবকিছু নিজেরাই করি। আমি এখানকার একটা সাপ্তাহিকে কলাম লিখছি। শিগগির নরেশদা একটা কলেজে চাকরি পেতে যাচ্ছেন। এখানে বাংলাদেশের লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়াদের নিয়ে একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলেছি। আর শুনেছি বাড়িতে সবাই বেঁচেবর্তে আছে। তায়েবা আমার হাতে হাত রেখে বলল, দানিয়েল ভাই আপনি একটা পথ করে নেবেন, একথা আমি নিশ্চিত জানতাম।

এরই মধ্যে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। তায়েবা অবলীলায় বলে দিল, ওই যে মাইতিদা আসছেন। সত্যি সত্যি ডা. মাইতি এসে কেবিনে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, দানিয়েল সাহেব, আমি রসকষহীন মানুষ। রোগী ঠেঙিয়ে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করি। শুনেছি আপনি একজন জিনিয়স, আপনার সঙ্গে কী নিয়ে আলাপ করা যায় ভেবে স্থির করে একদিন জানাব। আজ ভয়ানক ব্যস্ত, ক্ষমা করতে হবে। এখন আমি উঠব।

তায়েবা বিছানা থেকে তড়াক করে নেমে ডা. মাইতির ঝোলানো স্টেথেসকোপটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, মাইতিদা আপনাকে দুমিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দানিয়েল ভাই, কালও কি আপনি হাসপাতালে আসবেন ? আমি মাথা নাড়লাম। তা হলে আমার জন্য অল্প কটা ভাত আর সামান্য ছোট মাছের তরকারি রান্না করে নিয়ে আসবেন। মরিচ দেবেন না, কেবল জিরে আর হলুদ। ছোট্ট মেয়েটির মতো আবদেরে গলায় বলল, মাইতিদা আমাকে আগামীকাল ভাত খেতে না দিলে আপনাদের কথামতো আমি ইনজেকশন দেব না, ক্যাপসুল খাব না, হেন টেস্ট, তেন টেস্ট কিছুই করতে দেব না। ডা. মাইতির হাত ধরে বলল, আপনি হ্যাঁ বলুন, মাইতিদা। ডা. মাইতি বেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন, বেশতো দানিয়েল সাহেব, কালকে ভাত মাছ রান্না করে নিয়ে আসুন। কিন্তু আমি ভাবছি, পুরুষমানুষের হাতের রান্না তোমার মুখে রুচবে কিনা। তায়েবা বলল, রুচবে খুব রুচবে। দানিয়েল ভাই ট্যাংরা মাছ পান কি না দেখবেন। ডা. মাইতি ঘড়ি দেখে বললেন, এবার আমি উঠব। দানিয়েল সাহেব আপনিও কেটে পড়ুন। এমনিতে অনেক কনসেশন দেয়া হয়েছে।

তায়েবার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে পেছন ফিরে একবার হাসপাতাল কমপ্লেক্সটির দিকে তাকালাম। ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকারে বিরাট বাড়িটাকে নিস্তব্ধতার প্রতিমূর্তির মতো দেখাচ্ছে। মৃত্যু এবং জীবনের সহাবস্থান বাড়িটার শরীরে এক পোঁচ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য মাখিয়ে দিয়েছে মনে হল। হাসপাতাল কম্পাউন্ড থেকে

বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডের পথ ধরলাম। পনেরো নম্বর ট্রাম ধরে আমাকে বৌবাজারে নামতে হবে। উল্টোপাল্টা কতরকমের চিন্তা মনের ভেতর ঢেউ তুলছিল। তায়েবার অসুখটা কি খুব সিরিয়স ? তার মা কি দিনাজপুর থেকে কলকাতা আসতে পেরেছে ? ডোরা শেষ পর্যন্ত পিলে-চমকানো এমন একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করল। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটাবার পরেও জাহিদ নামের মাঝবয়েসী মানুষটি কী করে, কোন সাহসে হুলো বেড়ালের মত গোঁফজোড়া বাগিয়ে তায়েবাকে হাসপাতালে দর্শন দিতে আসে আমি তো ভেবে পাইনে। ট্রাম দাঁড়াতে দেখে দৌড়ে চড়তে যাচ্ছি, এমন সময় পেছনে ঘাড়ের কাছে কার করস্পর্শ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি ডা. মাইতি। তিনি বললেন, দানিয়েল সাহেব, একটা কথা বলতে এলাম। মাছ রান্না করার সময় একেবারে লবণ ছোঁয়াবেন না। আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন গেন্ডারিয়ার বাসাতেও তায়েবা কখনো লবণ খেত না। তিনি জানতে চাইলেন, আপনি কতদিন তায়েবাকে চেনেন ? আমি বললাম, তা বছর চারেক তো হবেই। তিনি আমাকে জেরা করার ভঙ্গিতে বললেন, তার কী রোগ আপনি জানেন ? বললাম, জানিনে, মাঝে মাঝে দেখতাম নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। কিছুদিনের জন্য হাসপাতালে যেত। আবার ভালো হয়ে চলে আসত। শুধু এটুকু জানি সে লবণ খেত না আর চা-টা ঠাণ্ডা করে খেত। তিনি বললেন, এর বেশি আপনি কিছু জানেন না ? বললাম, বারে জানব কী করে, মহিলাদের রোগের কি কোনো সীমা সংখ্যা আছে ? তা ছাড়া তায়েবা আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি, আসলে তার অসুখটা কী ? তিনি বললেন, উচিত কাজ করেছে, এসব আপনাকে পোষাবে না। আপনি অন্যরকমের মানুষ। আর শুনুন ভাত তরকারি আনার সময় লুকিয়ে আনবেন। ডা. ভট্টাচার্য জানতে পেলে ওকে হাসপাতালে থাকতে দেবেন না। এটুকু কষ্ট করে মনে রাখবেন। তারপর নিজে নিজে বিড়বিড় করে বললেন, মেয়েটি তো ফুরিয়েই যাচ্ছে। যা খেতে চায় খেয়ে নিক। ডা. মাইতি একটা চাপা নিশ্বাস ছাড়লেন। আমার বুকটা ভয়ে আশঙ্কায় গুড় গুড় করে উঠল। ডা. মাইতি বললেন, আপনার ট্রাম, আমি চলি।

দুই

বৌবাজারের স্টপেজে ট্রাম থামতেই লোড-শেডিং শুরু হয়ে গেল। সেই কলকাতার বিখ্যাত লোড-শেডিং। এটা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে এখনো আমাদের ঠিক গা-সওয়া হয়ে ওঠেনি। অনেক কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দেখি দারোয়ান পাঁড়েজী কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে কম্বলের ওপর দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। বিরাট উদরটা আস্ত একখানি ছোট্ট টিলার মতো নিশ্বাসের সাথে সাথে ওঠানামা করছে। নাক দিয়ে মেঘ ডাকার মতো শব্দ হচ্ছে। সকালবেলা বেরুবার সময় পাঁড়েজীকে টিকিতে একটা লাল জবাফুল গুঁজে কপালে চন্দন মেখে

সুর করে হিন্দিতে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়তে দেখেছি। তাঁর যে এতবড় একটা প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আছে, তখন কল্পনাও করতে পারিনি। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে পাঁড়েজী ধড়মড় করে জেগে হাঁক দিল, কৌন ? আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে চোখ রগড়াতে রগড়াতে একটুখানি হেসে বলল, আমি তো ভাবলাম কৌন। না কৌন। আপনি তো জয়বাংলার বাবু আছেন, যাইয়ে।

দোতলায় পা দিতে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। এ লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনে বচসা ঝগড়া এসবই আমরা নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমার শরীরটা আজ ক্লান্ত। মনটা ততোধিক। ভেবেছিলাম, কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকব। কিছু সময় একা একা থাকা আমার বড় প্রয়োজন। বাইরে কোথাও পার্কে টার্কে বসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসব কি না ভাবাগোনা করছি, এ সময়ে আলো জ্বলে উঠল। সুতরাং ঘরের দিকে পা বাড়ালাম, মেঝের ওপর পাতা আমাদের ঢালাও বিছানার ওপর নরেশদা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিপরীত দিকে দুজন অচেনা তরুণ, দুজনেরই গায়ে মোটা কাপড়ের জামা। একজনের হাতা কনুই অবধি গুটানো। জামার রং বাদামি ধরনের, তবে ঠিক বাদামি নয়। বুঝলাম এরা কোনো ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসে থাকবে। হাত গুটানো তরুণের গায়ের রং হয়তো একসময়ে উজ্জ্বল ফর্সা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। আরেকজন একবারে কুচকুচে কালো। নরেশদা বললেন, এসো দানিয়েলের পরিচয় করিয়ে দিই। ফর্সা তরুণটির দিকে অঙ্গুলি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এর নাম হচ্ছে আজহার, আমার ছাত্র। আর ও হচ্ছে তার বন্ধু হিরন্ময়। দু জনেই জলাঙ্গী ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসেছে। আজ রাত সাড়ে বারোটার সময় ট্রেনিং নেয়ার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে দেরাদুন চলে যাচ্ছে। নরেশদা জিগগেস করলেন, আজহার, তোমরা কিছু খাবে ? না স্যার, হোটেলে খেয়েই তো আপনার কাছে এলাম। নরেশদা বললেন, তারপর খবরটবর বলো, এখানে এসে কী দেখলে আর কী শুনলে ? আজহার বলল, দেখলাম স্যার ঘুরে ঘুরে প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থিয়েটার রোডের সাহেবরা খেয়েদেয়ে তোফা আরামে আছেন। অনেককে তো চেনাই যায় না। চেহারায় চেকনাই লেগেছে। আমাদের ক্যাম্পগুলোর অবস্থা যদি দেখতেন স্যার। কী বলব, খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার তরুণ রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বিষ্টিতে ভিজছে, রোদে পুড়ছে। কারো অসুখবিসুখ হলে কী করুণ অবস্থা দাঁড়ায় নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না স্যার। আমরা কলকাতা এসেছি চারদিন হল। এ সময়ের মধ্যে অনেক কিছু দেখে ফেলেছি। একেকজন লোক ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে এখানে জামাই আদরে দিন কাটাচ্ছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, ফুর্তি করা, কোনোকিছুর অভাব নেই। আরেক দল বাংলাদেশের ব্যাংক থেকে সোনা লুট করে কলকাতা এসে ডেরা পেতেছে। আবার অনেকে এসেছে বিহারিদের পুঁজিপাট্টা হাতিয়ে নিয়ে। আপনি, এই কলকাতা শহরের সবগুলো বার, নাইট ক্লাবে খোঁজ করে দেখুন। দেখতে পাবেন ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশের মানুষ দু হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। এদের

সঙ্গে থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের কোনো যোগাযোগ নেই বলতে পারেন ? কথায় কথায় আজহার ভীষণ রেগে উঠল। আগে আমরা ফিরে আসি, দেখবেন এই সমস্ত হারামজাদাদের কী কঠিন শিক্ষাটা দিই। স্যার আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটা সিগারেট খেতে পারি ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমারই অফার করা উচিত ছিল। কিন্তু মাস্টার ছিলাম তো, সংস্কার কাটতে কাটতেও কাটে না। আজহার একটা সিগারেট ধরাল।

এই ফাঁকে হিরন্ময় মুখ খুলল। স্যার আমি একটা গল্প শুনেছি। তবে গল্পটা খুব ভালো নয়। যদি বেয়াদবি না ধরেন বলতে পারি। বেয়াদবি ধরার কী আছে, বলে যাও। এই যুদ্ধ মান-অপমান, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছু বানের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেসকল মানুষকে দেশে থাকতে শ্রদ্ধা করতাম, কলকাতায় তাদের অনেকের আচরণ দেখে সরল বাংলায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়—তাই হতে হচ্ছে। এখনো তোমরা স্যার ডাকছ তার বদলে শালা বললেও অবাক হবার কিছু ছিল না। অতএব বিনা সঙ্কোচে বলে যেতে পারো তোমার গল্প। ঠিক গল্প নয় স্যার। এখানকার একটা সাপ্তাহিক খবরটা ছেপেছে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী নাকি সোনাগাছিতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। চেনেন তো স্যার সোনাগাছি কী জন্য বিখ্যাত। নরেশদা দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, এই নিরীহ মাস্টার অন্য কিছু বলতে না পারলেও সোনাগাছি কি জন্য বিখ্যাত সেকথা অবশ্যই বলতে পারে। কেননা কলকাতা আসার অনেক আগেই তাকে প্রেমেন মিত্তিরের অনেকগুলো ছোটগল্প পাঠ করতে হয়েছিল। এবার তোমার গল্পটা শুরু করতে পারো। হিরন্ময়ও একটা সিগারেট জ্বালাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, পুলিশ অফিসারের জেরার মুখে ভদ্রলোককে কবুল করতেই হল, তিনি ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী। পুলিশ অফিসার তখন বললেন, তা হলে স্যারের গুডনেমটা বলতে হয়। মন্ত্রী বাহাদুর নিজের নাম প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ টেলিফোন করে ভেরিফাই করে দেখে সে বক্তব্য সঠিক। পুলিশ অফিসারটি দাঁতে জিব কেটে বললেন, স্যার কেন মিছিমিছি সোনাগাছির মতো খারাপ জায়গায় গিয়ে নাহক ঝুট ঝামেলার মধ্যে পড়বেন। আর ভারত সরকারের আতিথেয়তার নিন্দে করবেন। আগেভাগে আমাদের স্মরণ করলেই পারতেন, আমরা আপনাকে ভি. আই. পি.-র উপযুক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিতাম।

নরেশদা বললেন, চারদিকে কতকিছু ঘটছে নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি। তবে একথাও মিথ্যে নয় যে এসব একেবারে অস্বাভাবিক নয়। আমরা তো সবাই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। নিজের প্রাণ ছাড়া আর কিছু যেখানে বাঁচাবার নেই, সেখানে এ-ধরনের বিকৃতিগুলো আসবে, আসতে বাধ্য। চিন্তা করে দেখো জানুয়ারি থেকে পঁচিশে মার্চের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের দিনগুলোর কথা। আর মানুষদের কথা চিন্তা করো। প্রাণপাতালের তাপে জেগে-ওঠা সেই মানুষগুলো। একেকটা ব্যক্তি যেন একেকটা ঝরনা। আর আজ দেখো সেই

মানুষদের অবস্থা। এই তোমরা আসার একটু আগেই আমি বনগাঁ থেকে ফিরলাম। বাংলাদেশের মানুষ কী অবস্থার মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে, নিজের চোখেই তো দেখে এলাম। ওপরের দিকে কিছু মানুষ কী করছে না-করছে সেটা এখন আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। শরণার্থী শিবিরগুলোতে কী অবর্ণনীয় কষ্ট এই বিজুলির আলোজ্বলা কলকাতা শহরে বসে কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতিদিন বেশির ভাগ মারা যাচ্ছে শিশু এবং বৃদ্ধ। সৎকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বনগাঁ থেকে শেয়ালদা প্রতিটি স্টেশনে তুমি দেখতে পাবে বাংলাদেশের মানুষ। খোলা প্ল্যাটফর্মের তলায় কী চমৎকার সংসারই না পেতেছে তারা। পুরুষরা সব বসে আছে নির্বিকার। তাদের চোখের দৃষ্টি মরে গেছে। চিন্তা করবার, ভাবনা করবার, স্বপ্ন দেখবার কিছু নেই। সকলেরই একমাত্র চিন্তা আজকের দিনটি কেমন করে কাটে। তাও কি সকলের কাটে ! মরণ যখন কাউকে করুণা করে পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কারো মনে রেখাপাত পর্যন্ত করে না। মৃতদেহ প্ল্যাটফর্মের পাশে পড়ে থাকে, অথচ দেখতে পাবে পাশের পরিবারটি অ্যালুমিনিয়ামের থালায় মরিচ দিয়ে বাসি ভাত খাচ্ছে। এমন অনুভূতিহীন মানুষের কথা আগে তুমি কল্পনা করতে পেরেছ ? মেয়েগুলোকে দেখো। সকলের পরনে একেকখানি তেনা। চুলে জট বেঁধেছে। পুষ্টির অভাবে সারা শরীর কাঠি হয়ে গেছে। এদের মধ্যে এমনও অনেক আছে, জীবনে রেলগাড়ি দেখেছে কি না সন্দেহ। এখন সাধ মিটিয়ে রেলগাড়ি চলাচলের পথের ধারে তাদের অচল জীবন কাটাচ্ছে। এ অবস্থা কেন হল ? সবাই বলছে একটা সংগ্রাম চলছে। আমিও মেনে নিই। হ্যাঁ সংগ্রাম চলছে। কিন্তু আমার কথা হল সংগ্রাম চলছে অথচ আমি বসে আছি। আমি তো দেশকে কম ভালোবাসিনে। দেশের জন্যে মরতে আমি ভয় পাইনে। কিন্তু লড়াই করে মরে যাওয়ার সুযোগটা নেই কেন ? গলদটা কোথায় জান আজহার, এই মানুষগুলো লড়াইর ময়দানে থাকলে সকলেরই করবার মতো কিছু না কিছু কাজ পাওয়া যেত। দেশ যুদ্ধ করছে, কিন্তু যুদ্ধের ময়দান না দেখেই এদের দেশত্যাগ করতে হয়েছে। সচল জীবন্ত মানুষ এখানে এসে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। সেখানেই দুঃখ। নেতা এবং দল এসব মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করল। কিন্তু তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে ব্যর্থ হল। নেতা গেল পাকিস্তানের কারাগারে। আর আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের মুখে দেশ ছেড়ে চলে এলাম। সেখানেই আফসোস। নানা হতাশা এবং বেদনার মধ্যেও স্বীকার করি একটা যুদ্ধ হচ্ছে। একদিন না একদিন আমাদের মাটি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের চলে যেতেই হবে। কিন্তু আমার তো বাবা এ তক্তপোশের ওপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিঠে বাত ধরে গেল। নরেশদা একনাগাড়ে অনেক্ষণ কথা বলে থামলেন। কিছু মনে করো না বাবা, মাস্টার মানুষ। একবার বলতে আরম্ভ করলে আর থামতে পারিনে।

হিরন্ময় জানতে চাইল, স্যার, বনগাঁ কেন গিয়েছিলেন ? নরেশদা জবাবে বললেন, আমার বুড়ো মা এবং বাবা কয়েকজন আত্মীয়স্বজনসহ আজকে বনগাঁ শরণার্থী শিবিরে

পৌঁছানোর কথা। বনগাঁর আশেপাশে যে-কটা শরণার্থী শিবির আছে, সবগুলোতেই তালাশ করলাম। পরিচিত আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। কিন্তু মা-বাবাকে পাওয়া গেল না। হয়তো এসে পড়বেন দু চার দিনের মধ্যে নইলে...নরেশদা চুপ করে গেলেন। কথাটার অশুভ ইঙ্গিত সকলকেই স্পর্শ করল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। হাতের আধপোড়া সিগারেটটি ছুঁড়ে ফেলে দিল আজহার। স্যার, আপনার এই মানসিক অবস্থায় বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত। আসলে প্রথমেই আপনার মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের সংবাদ নেয়াই উচিত ছিল। আমাদের মুসলমান ছেলেদের বেশির ভাগই একা একা এসেছি কিনা, তাই পরিবারের কথাটা মনে থাকে না। সেজন্য এমনটি ঘটেছে। আশা করছি, অবশ্যই তাঁরা দু-চার দিনের মধ্যে এসে পড়বেন। আপনি চিন্তাভাবনা করবেন না স্যার। আমি দেরাদুনে পৌঁছেই আপনাকে চিঠি দেব। আপনি অবশ্যই জানাবেন, তাঁরা পৌঁছুলেন কি না। আজহার ঘড়ি দেখে প্রায় একরকম লাফিয়ে উঠল। স্যার, এবার আমাদের উঠতে হয়। মেজর হরদয়াল সিংয়ের কাছে হাওড়া স্টেশনে হাজিরা দিতে হবে। তার আগে অনেকগুলো ফর্মালিটি পালন করতে হবে। কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটায় রিপোর্ট করতে হবে। আজহার এবং হিরন্ময় উঠে দাঁড়াল। তাদের পিছুপিছু আমি এবং নরেশদা বিদেয় জানাতে নিচতলার গেট পর্যন্ত এলাম। আজহার নত হয়ে নরেশদার পা ছুঁয়ে সালাম করল। তারপর বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে ফেলল। নরেশদা মমতা মেশানো কণ্ঠে বললেন, ছি বাবা কাঁদতে নেই। আজহার কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বলল, আমার দু ভাই পাকিস্তানের মারিতে আটকা পড়ে আছে। এক বোন এবং ভগ্নীপতি লাহোরে। এতদিন মনেই পড়েনি। আপনার মা-বাবার কথা শুনে তাদের কথা মনে পড়ল। রাস্তার ফুটপাত ধরে দুজন হন হন করে চলে গেল। আমরা দুজন কিছুক্ষণ সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের সকলেরই একেকটা করুণ কাহিনী রয়েছে।

নরেশদা জানতে চাইলেন, দানিয়েল তুমি খেয়েছ ? আমি মাথা নাড়লাম। চলো ওপরে যেয়ে কাজ নেই, একেবারে খেয়েই আসি। বললাম, চলুন। তিনি জিগগেস করলেন, কোথায় যাবে ? আমার অত বেশি খাওয়ার ইচ্ছে নেই, যেখানে হোক চলুন। নরেশদা বললেন, এত দুঃখ, এত মৃত্যু, এসবের যেন শেষ নেই। যাই হোক চলো আজ মাছ-ভাত খাই। আজ আমার একটুখানি নেশা করতে ইচ্ছে করছে। নরেশদা এমনিতে হাসিখুশি ভোজনবিলাসী মানুষ। কিন্তু পয়সার অভাবে তাঁকেও আমাদের সঙ্গে দুবেলা মাদ্রাজি দোকানে দোসা খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। বাঙালি দোকানে সামান্য পরিমাণ মাছ, ডাল এবং ভাত খেতে কম করে হলেও ছয় টাকা লেগে যায় ; সেখানে মাদ্রাজি দোকানে দেড় দুটাকায় চমৎকার আহারপর্ব সমাধা করা যায়।

ভীমনাগের মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে আমরা রাস্তা পার হলাম। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর ছবিটিতে কড়া আলো পড়েছে। স্যার আশুতোষ ভীমনাগের মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন, বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচার করার জন্য ভীমনাগ স্যার আশুতোষের পোর্ট্রেটটা ঝুলিয়েছে। কিন্তু পোর্ট্রেটটি দেখে এরকম ধারণা হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক যে ভীমনাগের মিষ্টির গুণেই স্যার আশুতোষ এত বৃহদায়তন

ভুঁড়ির অধিকারী হতে পেরেছেন। অতএব যাঁরা ভুঁড়ির আয়তন বড় করতে চান, পত্রপাঠ ভীমনাগের দোকানে চলে আসুন।

আমরা দু জন সামান্য একটু ডাইনে হেঁটে বঙ্গলক্ষ্মী হোটেলে ঢুকলাম। খদ্দেরের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। একটা টেবিলের দু পাশে বসলাম। নরেশদা বললেন, চলো আজ মাংস খাওয়া যাক। আমি জিগগেস করলাম, পয়সা আছে ? তিনি টেবিলের ওপর টোকা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ আজ কিছু পয়সা পাওয়া গেছে। এটা তো আশ্চর্য ব্যাপার। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলেন নাকি ? রাস্তায় কি আর টাকা-পয়সা কুড়িয়ে পাওয়া যায় ? মাদারীপুরের এক ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে শ তিনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। আজকে বনগাঁ স্টেশনের কাছে তাঁর সঙ্গে দেখা। অবশ্য তিনি জিপে চড়ে রিফিউজি ক্যাম্পে দর্শন দিতে এসেছিলেন। তাঁর হাতে অনেক টাকা, অনেক প্রতাপ। মাদারীপুর ব্যাংকের লুট করা টাকাও নাকি তাঁর হাত দিয়ে বিলিবণ্টন হয়েছে। ভাবলাম, এই সময়ে পাওনা টাকাটা দাবি না করাই হবে বোকামো। আমি জিপের সামনে দাঁড়াতেই তিনি ঝট করে জিপ থেকে নেমে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কত কী জিগগেস করলেন। কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাইনি। আমাদের দিনকাল খারাপ যাচ্ছে শুনে পকেট থেকে একটি পাঁচশো টাকার নোটের তাড়া অন্য কেউ দেখতে না পায় মতো বের করে, সেখান থেকে একখানি নোট আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি তো বিপদেই পড়ে গেলাম। খুচরো কোথায় পাই ! তাই বললাম, আপনি বরং তিনশোই দিন। আমার তো খুচরো করার কোনো উপায় নেই। তিনি বললেন, রাখুন প্রফেসর বাবু, আপনার খুচরো সে পরে দেখা যাবে। জিপে স্টার্ট দিয়ে দলবলসহ বারাসত রিফিউজি ক্যাম্প ভিজিট করতে চলে গেলেন। বেয়ারা এলে তিনি পাঠার মাংস, ভাত ডাল দিতে বললেন।

খেতে খেতে জিগগেস করলাম, মা-বাবার কোনো খোঁজ পেলেন ? খবর তো পাচ্ছি রোজ পথে আছেন, পথে আছেন। কিন্তু কোন পথ সেটা তো ভেবে স্থির করতে পারছিনে। আজই তো এসে যাওয়ার কথা ছিল। গোটা দিন অপেক্ষা করলাম, কিন্তু অপেক্ষাই সার। হঠাৎ করে নরেশদার হিক্কা উঠল। প্রাণপণ সংযমে হিক্কার বেগ দমন করে আবার খেতে লেগে গেলেন। আমি ফের জানতে চাইলাম, কল্যাণীরও কোনো খবর পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, তার একটা খবর আছে বটে। তবে সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না, সে নাকি কীভাবে পশ্চিম দিনাজপুরে তার এক আত্মীয়বাড়ি এসে উঠেছে। ঠিকানা পেয়েছেন ? নরেশদা জবাবে বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম, তবে দুয়েক দিনের মধ্যে নিজে গিয়ে দেখে আসুন অথবা ক্ষিতীশকে পাঠিয়ে দেন। নরেশদা আমাকে ধমক মারলেন। আরে রাখো তোমার পশ্চিম দিনাজপুর। যাওয়া-আসার খরচ কত জান ? এই কল্যাণীর সঙ্গে নরেশদার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তারিখটা ছিল একুশে এপ্রিল। এরই মধ্যে পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্র্যাক ডাউন করে বসল। খরচ যতই হোক, ম্যানেজ করা যাবে। আপনি ঘুরে আসুন। সেকথা এখন রাখো। তোমার খবর বলো। সকাল থেকে কোথায় কোথায় গেলে এবং কী করলে।

গোটা দিনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে একদম ভুলেই ছিলাম। নরেশদার কথায় সমস্ত দিনের ঘটনারাজি একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মতো প্রাণবান হয়ে উঠল। আমি বললাম, সকাল দশটার দিকে তো গেলাম লেনিন সরণিতে। তিনি জানতে চাইলেন, লেনিন সরণিতে কেন ? বললাম, জাহিদুলের কাছে তায়েবার ঠিকানা চাইতে। জাহিদুল তোমাকে তায়েবার ঠিকানা দিলেন ? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন। দিতে কি চায়, শেষ পর্যন্ত দিতে বাধ্য করা হল। কী করে ? তিনি জানতে চাইলেন। জবাবে বললাম, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখি একেবারে সিঁড়ির গোড়ার রুমটিতে জাহিদুল মটকার পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি ফরাশের একপাশে। রিহার্সেল জাতীয় কিছু একটা হয়ে গেছে অথবা হবে। জাহিদুলের সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন মানুষ। একজন বাংলাদেশের। বাকিরা কলকাতার। আপনি তো জানেন, মওকা পেলেই জাহিদুল ন্যাকা ন্যাকা ভাষায় চমৎকার গল্প জমাতে পারে। সেরকম কিছু একটা বোধহয় করছিল। সেখানে আরো তিনজন মহিলার মধ্যে ডোরাকেও দেখলাম। আমাকে দেখেই দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে আরম্ভ করেছে। তার মুখের শিশুর মতো অম্লান সরলতা তেমনি আছে। কোনো দুশ্চিন্তার রেখা, কোনো ভাবান্তর নেই। গেন্ডারিয়ার বাসায় যেমন সেজেগুজে থাকত অবিকল তেমনি। যেন সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, কোথাও কিছু ঘটেনি। জানেন তো ডোরাটা বরাবরই বোকা এবং পরনির্ভরশীল। নিশ্চয়ই এই সময়ের মধ্যে সে জাহিদুলের মধ্যে একটা নির্ভর করার মতো ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। জাহিদুল সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে মেয়েটিকে একেবারে নিকে করে ফেলেছে। জাহিদুলের বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে, তবু তার সৎসাহসের তারিফ করি। বিয়ে না করে অন্যভাবেও মেয়েটিকে সে ব্যবহার করতে পারত। জানেন তো জাহিদুলের আসল বউয়ের সংবাদ ? শশীভূষণ তার মেয়েটির ট্যুইশনি করতনা, জাহিদুলকে একটা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে শশীকে বগলদাবা করে শান্তিনিকেতন চলে গেছে। এক্কেবারে ক্ষুরের মতো ধারালো মহিলা। যেদিকে যায়, ফাঁক করে যায়। তুমি কোন শশীর কথা বলছ ? আমাদের জগন্নাথ হলের ছোট্টমতো সুন্দর ছেলেটি নয়তো ! সে তো অত্যন্ত সুশীল ছেলে, সে কেন যাবে রাশেদা খাতুনের সঙ্গে ? খাতুনেরও তো প্রচুর সুনাম শুনেছি, তিনিও বা এরকম বাজে কাজ করতে যাবেন কেন ? এসব ব্যাপারে নরেশদার মাথাটা আস্তে আস্তে কাজ করে। তাই বিরক্ত না হয়েই বললাম, যুদ্ধস্রোতে ভেসে যায় ধনমান জীবন যৌবন। আমি আর আপনি করলে যা অপকর্ম হয়, মহাপুরুষেরা করলেই সেসব লীলা হয়ে দাঁড়ায়। নরেশদা বললেন, ওসব কথা রাখো, তোমার খবর বলো। আমি বললাম, রাশেদা খাতুন যখন শশীকে ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর পুরে তীর্থযাত্রা করল, ওদিকে জাহিদুল ভেবে দেখল, সে কিছু একটা করে যদি না বসে, তা হলে লোকে তাকে মরদ বলবে না। তাই কোনো কালবিলম্ব না করে ডোরাকে নিকে করে বসল। তাতে তার কোনো বেগই পেতে হয়নি। সে ওদেরই তো অভিভাবক ছিল। সুতরাং 'আপনা উদ্যান ফল, তাতে কিবা বলাবল'।

স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত সংগ্রামে ডোরাকে বলি হতে হয়েছে। আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লেগেছে তায়েবার। সে ছোট বোনটাকে প্রাণের চাইতে ভালোবাসত আর জাহিদুলকে বাবারও অধিক শ্রদ্ধা করত। তায়েবার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মানসিক আশ্রয় ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় ওটাই তার অসুখ গুরুতর হয়ে ওঠার মূল কারণ। নরেশদা কিছুক্ষণের জন্য মুখের ভেতর পুরে দেয়া গ্রাসটা চিবুতে পারলেন না। দুমিনিটের মতো ঝিম মেরে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার ঠিকানা সংগ্রহের বৃত্তান্তটা বলো।

আমি শুরু করলাম। জাহিদুল আমাকে দেখার পর ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। জানেন নরেশদা, ওঁকে এখন বেশ স্লীম দেখায়। ভুঁড়িটাও কোথায় যেন আত্মগোপন করেছে। গোঁফজোড়া এমন কায়দা করে ছেঁটেছেন, কাছে থেকে না দেখলে পাকনা অংশ চোখেই পড়েনা। নরেশদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আবার আজেবাজে কথা বলছ। কী ঘটেছে সেটাই বলো। সুতরাং আরম্ভ করলাম। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। মুখ খুলতেই পারিনি। কী জানি কেউ যদি কিছু মনে করে। শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে বললাম, আপনি কি একটু বাইরে আসবেন? জাহিদুল উঠে এলে আমি তাঁকে সিঁড়ির গোড়ায় ডেকে নিয়ে বললাম, আপনার কাছ থেকে আমি তায়েবার ঠিকানাটি সংগ্রহ করতে এসেছি। জাহিদুল অত্যন্ত উষ্মা এবং ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, আমি কি পকেটে পকেটে তায়েবার ঠিকানা বয়ে বেড়াই নাকি? আমি তাঁর চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানালাম, আপনার কাছে আমি তায়েবার ঠিকানা নিতে এসেছি এবং আপনি জানেন তার ঠিকানা। ভালোয় ভালোয় যদি না দেন চিৎকার করব, চেঁচামেচি করব। একেবারে বিফল হলে অন্য কিছু করব। আমি প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে লম্বা চ্যাপ্টা জিনিসটির অস্তিত্ব তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। ধমকের সুরে আমাকে বলল, এক মিনিট দাঁড়াও। আমি তো ভয়ে অস্থির। এই বুঝি পুলিশের কাছে টেলিফোন করে বলবেন, পাকিস্তানি গুপ্তচর পকেটে ছুরি নিয়ে বাংলাদেশের একজন সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করতে এসেছে। কিন্তু তিনি ওসব কিছুই করলেন না, সিঁড়ি থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে ভেতরের কাগজটা বের করে নিলেন এবং সেটা দেয়ালে ঠেকিয়ে তায়েবার হাসপাতালের নাম, ওয়ার্ড এবং বেডনম্বর লিখে আমাকে দিলেন। আমার কেমন অনুভূতি হয়েছিল? দেশ থেকে আসার পর এই প্রথম একটা কাজের মতো কাজ করলাম। করুণার ওপর বাঁচতে বাঁচতে নিজের অস্তিত্বের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমরা যখন নিচে নামলাম, তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কলকাতা শহরের যন্ত্রযানের চলাচল একেবারে কমে এসেছে। তথাপি একথা বলা যাবে না কলকাতা শহর বিশ্রাম নিচ্ছে। নোংরা ঘেয়ো রাস্তা, মান্ধাতা আমলের পাতা ট্রামলাইন, উন্মুক্ত ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষজনের গাদাগাদি ঠেসাঠেসি ভিড় দেখলে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে এই নগরী বিশ্রাম কাকে বলে জানে না, শুধু যন্ত্রণায় কঁকায়। আচমকা ছুটেচলা নৈশ ট্যাক্সিগুলোর আওয়াজ শুনলে একথাই মনে হয়।

ডানদিকের উঁচু বিল্ডিংটার ফাঁকে একখানি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। রাস্তার গর্তের জমা পানিতে চাঁদের ছায়া পড়েছে। আহা তা হলে কলকাতা শহরেও চাঁদ ওঠে। নরেশদা পানের দোকান থেকে পান এবং সিগারেট কিনলেন। পকেটে পয়সা থাকলে দুনিয়ার ভালো জিনিস যত আছে কিনতে তাঁর জুড়ি নেই। আমার হাতে একটা তবক দেয়া পানের খিলি তুলে দিয়ে বললেন, নাও খাও। কাল আবার পয়সা নাও থাকতে পারে। তারপর নিচু সুরে আবৃত্তি করলেন, নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও। হোস্টেলের গেটে এসে দেখলাম দারোয়ান গেটে তালাচাবি লাগাচ্ছে। সেই আগের দারোয়ানটিই। বলল, বাবুজি আওর একটু হোলে গেট বন্ধ হোয়ে যেত। তখন তো খুব অসুবিধে হোয়ে যেত। আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওপরে এলাম। আজ হোস্টেল একেবারে ফাঁকা। আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের যে ছেলেরা থাকে, সবাই বারাসত রিফিউজি ক্যাম্পে নাটক করতে গেছে। নরেশদার ভাই দুজনও বাংলাদেশের ছেলেদের সঙ্গে গেছে। অঢেল জায়গা, ইচ্ছে করলে আমরা দুজন দু রুমে কাটাতে পারি। অন্যদিন যে প্রাইভেসির অভাবে অন্তরে অন্তরে গুমরাতে থাকি আজ সেই প্রাইভেসিটাই বড় রকমের একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল। আমরা দুজন পরস্পরকে এত ভালোভাবে চিনি যে হাঁ করলে একে অপরের আলজিভ পর্যন্ত দেখে ফেলি।

নরেশদা বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ে পুরোনো কথার খেই ধরে জিগগেস করলেন, তায়েবাকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে? জবাব দিলাম, পি. জি.-তে। তা তুমি দেখতে গিয়েছিলে? গিয়েছিলাম, দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। দেখে তো ভালোই মনে হল, সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। আগের মতোই আছে, জেদি, বেপরোয়া। কিন্তু ডাক্তার যা বললেন, তাতে মনে হল অসুখটা খুব একটা সাংঘাতিক। আমার কেমন জানি ভয় হচ্ছে। নরেশদা জিগগেস করলেন, ডাক্তার কী রোগ বললেন? উল্টো ডাক্তারই আমাকে জিগগেস করলেন, তায়েবার কী রোগ হয়েছে আমি জানি নাকি? বলেছি, আমি কেমন করে বলব। তায়েবা কখনো তার রোগের কথা আমাকে বলেছে নাকি! এটা তার প্রাইভেট ব্যাপার। নরেশদা বললেন, আমি তো কোনো কারণ খুঁজে পাইনে কেন তোমার কাছে তায়েবার রোগের বিষয়ে জানতে চাইবেন। আমি বললাম, রহস্যটহস্য কিছু নেই। তা হলে গোটা ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি।

তায়েবা বলেছে, আগামীকাল যদি হাসপাতালে যাই তার জন্য কিছু ভাত এবং ছোট মাছ মরিচ না দিয়ে শুধু জিরে আর হলুদ দিয়ে যেন রান্না করে নিয়ে যাই। তাকে নাকি এক মাস থেকে ভাতই খেতে দেয়া হয়নি। আমি ভাত রেঁধে নিয়ে গেলে সেটা সে খাবে। এ ব্যাপারে ডা. মাইতির কাছে আবদার ধরেছিল। ডা. মাইতি এক শর্তে রাজি হয়েছেন। ডা. ভট্টাচার্যি যেন জানতে না পারেন। তিনি জানতে পারলে তায়েবাকে নাকি হাসপাতালে থাকতে দেবেন না। তিনি ট্রাম স্টপেজের গোড়ায় এসে একথা আমাকে জানিয়েছেন। আরো বলেছেন, রান্না করার সময় কিছুতেই যেন লবণ না দিই। পরে অবশ্য তাঁকে আপনমনে বিড়বিড় করতে শুনেছি, মেয়েটা তো শেষই

হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যা খেতে চায় খেয়ে নিক না। এই শেষের কথাটি শুনে আমার ভয় ধরে গেছে। তায়েবার যদি ভয়ানক কিছু ঘটে, সে যদি আর না বাঁচে।

নরেশদা সিগারেট ধরিয়ে আরেকটা ধমক দিলেন। কীসব আবোল-তাবোল বকছ। বাঁচবে না কেন, চুপ করো। মরণ কি খেলা নাকি ! পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এতদূর যখন আসতে পেরেছে, দেখবে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। হয়তো একটু সময় নেবে। এই ভাত-মাছ রান্নার ব্যাপারটি নিয়ে কিছু ভেবেছ কি ? না এখনো ভেবে ঠিক করতে পারিনি। আপনি বনগাঁ থেকে ফেরার পর আমি এলাম। সারাক্ষণ হাসপাতালেই তো কাটিয়ে এলাম। সত্যিই রান্না করাটাও দেখছি একটা অসম্ভব ব্যাপার। আচ্ছা নরেশদা একটা কাজ করলে হয় না, আমার বান্ধবী অর্চনা আছে না ! গোলপার্কের কাছে যার বাসা। সে বাসায় তো আপনিও গিয়েছেন। তাকে গিয়ে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বলব, ভাবছি কাল সকালে তার বাসায় যাব। অবশ্যই অর্চনা কোনো একটা উপায় বের করবে। নরেশদা বললেন, তিনি তো সকালবেলা কলেজে যান। দেখা করবে কেমন করে। আর কলেজ থেকে যদি সোজা বান্ধবীর বাসা বা অন্য কোথাও চলে যান, তখন কি করবে ? একবারে ফাঁকার উপর লাফ দেয়া যায় নাকি ? আমার বোধোদয় হল। সত্যিই তো এরকম ঘটতে পারে। আমি মাথা চুলকে বললাম, আরো একটি ভালো আইডিয়া এসেছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে কাকাবাবু মুজফফর আহমদের কাছে যাব। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁর কাছে সব খুলেটুলে বললে, একটা উপায় অবশ্যই বের করে দেবেন। তোমার মাথায় যতসব উদ্ভট জিনিস জট পাকিয়ে রয়েছে। নিজে বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারেন না, তাঁর কাছে যাবে ভাত আর ছোটমাছের আবদার করতে। তোমার বয়েস বাড়ছে না কমছে। আমি তো কোনো পথ দেখছিনে। কী করব আপনি না হয় বলুন।

একটু অপেক্ষা করো। হোস্টেলের রান্নাঘরে গিয়ে নরেশদা কয়েকবার চিত্ত চিত্ত করে ডাকলেন। চিত্ত জবাব দিল, যাই বাবু, অত চিৎকার করবেন না। রাত বাজে বারোটা, এখনো রান্নাঘর ধোয়া শেষ করতে পারিনি। নরেশদা বললেন, বাবা কোনো কাজ নয়, এই তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই। রান্নাঘর থেকে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় চিত্ত আমাদের রুমে এসে বলল, আজ্ঞে বাবু বলেন। নরেশদা বললেন, বাবা কাল তিনটের মধ্যে একপোয়া সরু চাল এবং কিছু ছোট মাছ, মরিচ না দিয়ে শুধু হলুদ জিরে দিয়ে রান্না করে দিতে পারবে ? একটা রোগীর জন্য। তুমি না পারলে অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখব। তা বাবু হয়তো পারা যাবে। কিন্তু বাজারটা আমি করব না আপনারা করবেন ? সেটাও বাবা তোমাকে করতে হবে। ট্যাংরা মাছ পাওয়া যায় কিনা দেখবে। এই নাও, নরেশদা আস্ত একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট চিত্তের হাতে তুলে দিলেন। চিত্তের মুখমণ্ডলে একটা প্রফুল্লতার ছোঁয়া দেখা গেল।

নরেশদা বললেন, ঘুমোবে ? বললাম, ঘুম যে আসতে চাইছে না। চোখ বন্ধ করে থাকো, একসময় আসবে। তিনি বাতি নিভিয়ে মশারি টাঙিয়ে নিজে ঘুমিয়ে

পড়লেন। একটু পরে নাক ডাকতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু আমি চোখের পাতা জোড়া লাগাতে পারছিলাম না। কোথায় একটা মস্তবড় গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তায়েবা, ডোরা, জাহিদুল, আমি, নরেশদা—আমাদের সকলেরই জীবন অন্যরকম ছিল এবং অন্যরকম হতে পারত। মাঝখানে একটা যুদ্ধ এসে সবকিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেল। যতই চিন্তা করতে চেষ্টা করিনে কেন কোনো একটা সূত্রের মধ্যে বাঁধতে পারিনে। সবকিছুই এলোমেলো ছাড়াছাড়া হয়ে যায়। এই দু আড়াই মাস সময়, এরই মধ্যে কীরকম হয়ে গেল আমাদের জীবন। সাতই মার্চের শেখ মুজিবের সে প্রকাণ্ড জনসভার কথা মনে পড়ল। লক্ষ লক্ষ মানুষ, কী তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা! চোখে কী দীপ্তি! কণ্ঠস্বরে কী প্রত্যয়! আন্দোলনের সে উত্তাল উত্তুঙ্গ জোয়ার, সব এখন এই কলকাতায় রাতে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। অথচ এখনো দু আড়াই মাস পার হয়নি! সে পঁচিশে মার্চের রাতটি, আহা সেই চৈত্ররজনী! সেই বাংলাদেশের চৈত্রমাসের তারাজ্বলা, চাঁদজ্বলা আকাশ। বাংলাদেশের জনগণের বর্ধিত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আরো প্রসারিত, আরো উদার-হওয়া আকাশ। মানুষের ঘ্রাণশক্তি কী তীক্ষ্ণ! কিছু একটা ঘটবে সকলের মনের ভেতর একটি খবর রটে গেছে। দলে দলে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আপনাআপনি তৈরি হয়ে উঠছে ব্যারিকেড। জনগণের সৃজনীশক্তির সে কী প্রকাশ। রাত এগারোটা না বাজতেই রাস্তায় নামল ট্যাঙ্ক। কামান, বন্দুক, মেশিনগানের শব্দে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। ভারী ট্যাঙ্কের ঘড়-ঘড় ঘটাং ঘটাং শব্দে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো সরে যাচ্ছে ব্যারিকেডের বাধা। সেই চৈত্ররজনীর চাঁদের আলোতে আমি নিজের চোখে দেখেছি আমাদের রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্যের ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কের ওপর দাঁড়ানো দু জন সৈন্যের বাদামি উর্দির কথা আমি ভুলতে পারছিনে। ভুলতে পারছিনে তাদের ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল, আর কটমটে চোখের দীপ্তি।

তারপর কী ঘটল? তারপর? একটা ঘটনার পাশে আরেকটা ঘটনা সাজিয়ে সঙ্গতি রক্ষা করে চিন্তা করতে পারিনে। আগামীকাল কী ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আঁচটুকুও করতে পারিনে। তায়েবা যদি মারা যায়, কী করব জানিনে। আমার মা, বোন, ভাইয়ের ছেলেরা বেঁচে আছে কি না জানিনে। যেদিক থেকেই চিন্তা করিনে কেন, একটা বিরাট 'না'-এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সব ব্যাপারে এতগুলো না নিয়ে মানুষ বাঁচে কেমন করে? সাবধানে উঠে বাতি না জ্বালিয়ে কুঁজো থেকে এক গ্লাস পানি গড়িয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নিলাম। একটা ট্যাক্সি ঘটাং ঘটাং করে শিয়ালদার দিকে ছুটে গেল। আমি সন্তর্পণে দরোজা খুলে ব্যালকনিতে চলে এলাম। কলকাতায় একসঙ্গে আকাশ দেখা যায় না। ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে থাকা নক্ষত্ররাজি, এদের কি আমি আগে কখনো দেখিনি? ছায়াপথে ফুটে থাকা অজস্র তারকারাজির মধ্যে আমার প্রিয় এবং পরিচিত তারকারাজি কোথায়? চোখের দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।

তিন

পরের দিন আমার ঘুম ভাঙ্গল দেরিতে। ঘড়িতে দেখি বেলা সাড়ে-দশটা বাজে। আমাদের ছেলেরা বারাসত থেকে ফিরে এসেছে। তাদের চীৎকার কোলাহলই বলতে গেলে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছে। নইলে আমি আরো ঘুমোতে পারতাম। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সিগারেটের প্যাকেটে দেখি একটাও সিগারেট নেই। মাসুমকে বললাম, দে তো একটা সিগারেট। সে নীরবে প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। একটা টান দিতেই আমার চোখের দৃষ্টি সতেজ হয়ে উঠল। মাসুমকে জিগগেস করলাম, কখন এলে, অন্যেরা কোথায়, কেমন নাটক করলে ? আমার মনে হল সে কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। বোঝা গেল নরেশদার সঙ্গে কথা বলে বিশেষ যুত করতে পারেনি। কারণ তিনি বরাবর ঠাণ্ডা মানুষ। হঠাৎ করে কোনো ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করতে পারেন না। মাসুম চাঙা হয়ে বলল, দানিয়েল ভাই আপনি থাকলে দেখতেন কী ট্রিমেন্ডাস সাকসেস হয়েছে। আমরা ক্যারেকটরের মুখ দিয়ে 'এহিয়া ইন্দিরা এক হ্যায়' এ শ্লোগান পর্যন্ত দিয়েছি। দর্শক শ্রোতারা কী পরিমাণ হাততালি দিয়েছে সে আমি প্রকাশ করতে পারব না। আমি জানতে চাইলাম, অন্যান্যরা কোথায় ? মাসুম জানাল ক্ষিতীশ আর অতীশ টিফিন করে কলেজে চলে গেছে। বিপ্লব গেছে তার বোন শিখা আর দীপাকে মামার বাসায় রেখে আসতে। সালামটা তো পেটুক। একসঙ্গে টিফিন করার পরও ফের খাবারের লোভে একজন সি. পি. এম. কর্মীর সঙ্গে তার বাসায় গেছে। সঙ্গে জহিরকেও নিয়ে গেছে। আমি বললাম, ওরা ফিরে এসেছে, একথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেন আপনি ওকথা বলছেন ? সকলে একসঙ্গে এসেছি, সবাই দেখেছে। বললাম, আমার কেমন জানি সন্দেহ হচ্ছে বারাসতের লোকেরা সবাইকে একসঙ্গে খুন করে মাটির নিচে পুঁতে রেখে দিয়েছে। কেন, খুন করবে কেন, আমরা কী অপরাধ করেছি ? আমি জবাব দিলাম, যদি খুন না করে থাকে এবং তোমরা একসঙ্গে নিরাপদে ফিরে এসে থাক, তা হলে ধরে নিতে হবে, সেখানকার লোকেরা তোমাদের পাগলটাগল ঠাউরে নিয়েছিল। সেজন্য কোনোকিছু করা অনাবশ্যক বিবেচনা করেছে। মাসুম বলল, অত সোজা নয় খুন করা। আমরা তো রিফিউজি ক্যাম্পের ভেতরে নাটক করিনি। কে না জানে সেখানে কংগ্রেসের রাজত্ব। আমরা নাটক করেছি ক্যাম্প থেকে একটু দূরে। সি. পি. আই. (এম)-এর তৈরি করা স্টেজে। অথচ রিফিউজি ক্যাম্পের সমস্ত লোক নাটক দেখতে এসেছে। নাটক যখন চরম মুহূর্তটির দিকে এগুচ্ছিল, একজন সি. পি. এম. কর্মী পরমর্শ দিলেন, দাদা এই জায়গায় একটু প্রম্পট করে দিন 'এহিয়া ইন্দিরা এক হ্যায়।' তাই দিলাম। কথাটা যখন চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হল, সে কী তুমুল করতালি আর গোটা মাঠভর্তি মানুষের মধ্যে কি তীব্র উত্তেজনা ! জানেন তো বারাসত হল সি. পি. আই. (এম)-এর সবচে মজবুত ঘাঁটি। কংগ্রেসের মাস্তানরা

এসে কোনো উৎপাত সৃষ্টির চেষ্টা যদি করত, তা হলে একটাও জান নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত না। উত্তেজনার তোড়ে পানির জগটা মুখে নিয়ে ঢকঢক করে অনেকখানি পানি খেয়ে ফেলল। এরই মধ্যে মাসুমের উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে কলকাতার লোকের মতো টানটোন লক্ষ করা যাচ্ছে। গালের বাঁ দিকটা মুছে নিয়ে সে বলতে আরম্ভ করল, এহিয়া ইন্দিরার মধ্যে কি কোনো বেশকম আছে। এহিয়ার সৈন্যরা সরাসরি খুন করছে। শ্রীমতি বাংলাদেশ ইস্যুটাকে নিয়ে লেজে খেলাচ্ছেন। এতে তাঁরই লাভ। বিরোধী দলগুলোকে কাবু করার এমন সুযোগ তিনি জীবনে কি আর কোনোদিন পাবেন ? নকশালদের তৎপরতা এখন কোথায় ? এখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বোমা ফাটে না কেন ? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার জনগণের যে জাগ্রত সহানুভূতি, ইন্দিরাজি সেটাকেই নিজের এবং দলের আখের গুছাবার কাজে লাগাচ্ছেন। এতকাল সি. পি. এম. বলত শাসক কংগ্রেস বাংলাদেশের মানুষকে ধাপ্পা দিচ্ছে। তাদের দেশে ফেরত পাঠাবার কোনো বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করবে না। এখন সেকথা সবাই বলছে। এই তো সেদিন যুগান্তরের মতো কংগ্রেসসমর্থক পত্রিকায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ সাংবাদিকও লিখতে বাধ্য হয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা তুঙ্গে উঠেছে। আর ওদিকে শ্রীমতি ইউরোপ, আমেরিকায় 'বাবু' ধরে বেড়াচ্ছেন। মাসুমের কলকাতায় এসে অনেক উন্নতি হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল জিভটি অত্যন্ত ধারালো এবং পরিষ্কার হয়েছে। এখন যে-কোনো সভাসমিতিতে দাঁড় করিয়ে দিলে ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা লেকচার ঝাড়তে পারে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তোমার এই মূল্যবান বক্তৃতার বাকি অংশ না হয় আরেকদিন শোনা যাবে। আজকে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। এখনো দাঁত মাজিনি। মুখ ধুইনি। কিছু মুখেও তো দিতে হবে। খালিপেটে কি আর লেকচার ভালো লাগে ? স্পষ্টতই মাসুম বিরক্ত হল। তার জ্বলন্ত উৎসাহে বাধা পড়েছে। আপনি যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন, ভেতরে ভেতরে একটি পেটি বুর্জোয়া। আমি বললাম, তোমার এই শ্রেণী বিশ্লেষণের কাজটিও আরেকদিন করতে হবে। আপাতত নরেশদা কোথায় আছেন, সংবাদটা জানিয়ে আমাকে বাধিত করো। কী জানি এখন কোথায় আছেন। কিছুক্ষণ আগে তো দেখলাম রাঁধুনি চিত্তের সঙ্গে ঘুটুর ঘুটুর করে কীসব কথাবার্তা বলছেন। দানিয়েল ভাই জানেন, এই নরেশদা লোকটার ওপর আমার ভয়ানক রাগ হয়। আপনার সঙ্গে তবু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যায়, নরেশদা গাছের মতো মানুষ। কোনো ব্যাপারেই কোনো রি-অ্যাকশন নেই।

আমি গামছাটা কাঁধে দুলিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেলাম। চাপাকলের গোড়ায় দেখি কোনো ভিড় নেই। দুটোমাত্র চাপাকল। একশো দেড়শোজন ছাত্রের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। গোসলের সময়টিতেও একটা তীব্র কম্পিটিশন লেগে যায়। প্রথম প্রথম এখানে গোসল করতে আসতে ভীষণ অপ্রস্তুত

বোধ করতাম। কারণ, হোস্টেলের ছাত্রদের অনেকেরই আসল নিবাস পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ। কারো কারো মা, ভাই, আত্মীয়, স্বজন এখনো বাংলাদেশে রয়ে গেছে। তবে একথা সত্যি যে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশের অত্যাচারে এদের দেশ ছাড়তে হয়েছে। অনেকের গায়ে টোকা দিলেই গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল, ঝিনাইদহ এসকল এলাকার গন্ধ পাওয়া যাবে। জীবন্ত ছাগল থেকে চামড়া তুলে নিলে যে অবস্থা হয়, এদের দশাও অনেকটা সেরকম। কলকাতা শহরে থাকে বটে, কিন্তু মনের ভেতরে ঢেউ খেলছে পূর্ববাংলার দীঘল বাঁকের নদী, আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, হাট-ঘাট ক্ষেত, ফসল, গরু-বাছুর। আমি গোসল করতে গেলেই নিজেরা বলাবলি করত, কীভাবে একজনের বোনকে মুসলমান চেয়ারম্যানের ছেলে অপমান করেছে। অন্যজন বলত পাশের গাঁয়ের মুসলমানেরা এক রাতের মধ্যে ক্ষেতের সব ফসল কেটে নিয়ে গেছে। ছোটখাটো একটি ছেলে তো প্রায় প্রতিদিন উর্দু পড়াবার মৌলভীকে নিয়ে নিত্যনতুন কৌতুক রচনা করত। ভাবতাম, আমাকে নেহায়েত কষ্ট দেওয়ার জন্যই এরা এসব বলাবলি করছে। অথচ মনে মনে প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। প্রায় প্রতিটি ঘটনাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উঃ সংখ্যালঘু হওয়ার কী যন্ত্রণা ! তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হত সুলতান মাহমুদ, আলাউদ্দিন খিলজী থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত, যত অত্যাচার হিন্দুদের ওপর হয়েছে তার জন্য যেন আমিই অপরাধী। মাঝে মাঝে ভাবতাম, বার্মা কি আফগানিস্তান কোথাও চলে যাওয়া যায় না। এখন অবশ্য আমার নিজের মধ্যেই একটা পরিবর্তন এসেছে। যেখানেই পৃথিবীর দুর্বলের ওপর-অত্যাচার হয়, মনে হয়, আমি নিজেও তার জন্য অল্পবিস্তর দায়ী। কেন এসব অনুভূতি হয় বলতে পারব না। এখন আমাকে সবাই সমাদর করে। আমি অসুস্থ মানুষ বলে কেউ কেউ আমাকে বালতিতে পানি ভরতি করে দিয়ে যায়। সম্যক পরিচয়ের অভাবই হচ্ছে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষের মূল।

আমি গোসল সেরে এসে দেখি, নরেশদা কাপড়-জামা পরে একমাত্র কাঠের চেয়ারখানার ওপরে ব্যালকনির দিকে মুখ করে বসে রয়েছেন। ঘরে আমার পূর্ব-পরিচিত জয়সিংহ ব্যানার্জী তাঁর যজমানের মেয়েটিকে নিয়ে মুখ নিচু করে বসে আছেন। এই জয়সিংহ ব্যানার্জীর সঙ্গে বাংলাবাজারে আমার পরিচয়। একটা ছোট বইয়ের দোকান চালাত। ব্রাহ্মণ জানতাম। কিন্তু যজমানি পেশাটাও একই সঙ্গে করছে, জানতে পারলাম কলকাতা এসে। প্রিন্সেপ স্ট্রিটে দেখা, সঙ্গে একটি মেয়ে। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যজমান-কন্যা। নরেশদা বোধ হয় জয়সিংহ ব্যানার্জী মানুষটিকে ঠিক পছন্দ করতে পারেননি। এই অপছন্দের কারণ, জিগগেস করতে যেয়েও করতে পারিনি। কতজনের কত কারণ থাকে। ওদের আজকে যে আসার কথা দিয়েছিলাম, সেকথা মনেই ছিল না। আমার পায়ের শব্দে নরেশদা পেছন ফিরে তাকালেন। এত দেরি করলে যে ! আমি বললাম, দেরি আর কোথায় করলাম। ঘুম থেকে উঠতেই দেরি হয়ে গেল। তার ওপর মাসুমের আস্ত একখানি

লেকচার হজম করতে হল। টিফিন করতে যাবে না? সেকী, আপনি সকাল থেকে কিছু না খেয়েই বসে আছেন? তিনি বললেন, তুমি কী মনে কর? মনে করাকরি নিয়ে কাজ নেই। চলুন।

জয়সিংহ ব্যানার্জীকে বললাম, আপনারা একটু অপেক্ষা করুণ, এই আমরা কিছু খেয়েই চলে আসব। নরেশদা বললেন, উনারাও সঙ্গে চলুন। আমাকে তো রুম বন্ধ করে যেতে হবে। আর তো কেউ নেই। পাহারা দেবে কে? আমি যাব আমার কাজে, তোমাকেও বোধ হয় বেরোতে হবে। অতএব কাপড়চোপড় পরে একেবারে তৈরি হয়ে নেয়াই উত্তম। মনে আছে তো তিনটের সময় তোমাকে কোথায় যেতে হবে? আমার শরীরে একটা প্রদাহ দৃষ্টি হল। বললাম, চলুন, চলুন, রাস্তার ওপাশের ছোট্ট অবাঙালি দোকানটিতে যেয়ে পুরি তরকারি খেয়ে নিলাম। জয়সিংহ ব্যানার্জী এবং তাঁর যজমান কন্যা কিছুতেই খেতে রাজি হলেন না। তাঁরা বসে বসে আমাদের খাওয়া দেখলেন।

ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই দেখছি আকাশে বড় বড় মেঘ দৌড়াদৌড়ি করছে। তখনো মাটির ভাঁড়ের চা শেষ করিনি। ঘন কালো মেঘে মেঘে কলকাতার আকাশ ছেয়ে গেছে। একটু পরেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে এল। দেখতে দেখতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের আর বেরুবার কোনো উপায় রইল না। নরেশদা বললেন, এর পরে তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, এদের নিয়ে প্রিন্সেপ স্ট্রিটে সোহরাব সাহেবের কাছে যাব। তিনি যদি একটি স্লিপ ইস্যু করে দেন, তাহলে এঁরা কলকাতা শহরে থেকেই রেশন ওঠাতে পারবেন। তিনি জবাব দিলেন না। পাজামা অনেক দূর অবধি গুটিয়ে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই—তোমরা একটু বসো আমি ছাতাটি নিয়ে আসি বলে বেরিয়ে গেলেন। গিয়ে আবার তিন চার মিনিটের মধ্যে ছাতাসহ ফিরে এলেন। জিগগেস করলাম, এত প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে আপনি কোথায় চললেন? তিনি বললেন, শেয়ালদা। ওমা শেয়ালদা কেন? মধ্যমগ্রামে গিয়ে প্রণব আর সুব্রত-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। আমার হাতে চাবি দিয়ে বললেন, ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। চিত্তের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। দেখবে তক্তপোষের নিচে দুটো বাটি আর টেবিলের ওপর একটি ব্যাগ। ওসব ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে যাবে। আস্ত ব্যাগটাই তায়েবার কাছে রেখে আসবে। আর ধরো এই ত্রিশটা টাকা রইল। তিনি হাঁটু অবধি পাজামা গুটিয়ে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মধ্যমগ্রামের সুব্রতবাবু নরেশদাকে স্কুলে একটা চাকরি দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেই ভরসায় এই বৃষ্টি বাদল মাথায় করে তিনি মধ্যমগ্রাম যাচ্ছেন। আমাদের বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিন এবং অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। ভেতরে ভেতরে কী তীব্র চাপ অনুভব করলেই না নরেশদার মতন আরামপ্রিয় স্থবির মানুষ শেয়ালদার রেলগাড়িতে এই ঝড়-জল তুচ্ছ করে ভিড় ঠেলাঠেলি উপেক্ষা করে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত ছুটে যেতে পারেন। বাইরে যতই নির্বিকার হোন না কেন, ভেতরে ভেতরে মানুষটা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছেন।

নরেশদা চলে যেতেই আমরা তিনজন অপেক্ষাকৃত হালকা বোধ করলাম। তাঁর উপস্থিতির দরুন জয়সিংহ ব্যানার্জী স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। আমরা টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। বাইরে বিষ্টি পড়ছে বলে তো আর দোকানে বসে থাকা যায় না। দোকানের মালিকের আড়চোখে চাওয়ার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরো তিন ভাঁড় চা চেয়ে নিলাম। একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খাচ্ছিলাম। আমাদের ভাবখানা এই, বিষ্টিথামা অবধি এই ভাঁড় দিয়েই চালিয়ে যাব। পঁচিশ পয়সা দামের চায়ের ভাঁড় তো আর সমুদ্র নয়। একসময়ে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বিষ্টি থামল না। দোকানি এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলল, বাবুজি এবার উঠতে হোবে। আমার দোসরা কাস্টমারকে জায়গা দিতে হোবে। আমি বললাম, এই বিষ্টির মধ্যে আমি যাব কেমন করে। দোকানি মোক্ষম জবাব দিল, বাবু বিষ্টি তো আমি মন্তর পড়ে নামায়নি। আপনারা বোলছেন যাব কেমন করে, ওই দেখুন। মাথা বাড়িয়ে দেখলাম শত শত মানুষ এই প্রবল বিষ্টির মধ্যেও এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। ওদিক থেকে এদিকে আসছে। মেয়েদের শাড়ি ব্লাউজ পেটিকোট ভিজে শপ শপ করছে। ট্রাক বাস দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের নিরন্তর পথ চলার কোনো বিরাম নেই।

অগত্যা আমাদেরও উঠতে হল। কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ির রোয়াকে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। তারপর আর কিছুদূর গিয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বাঁকে ডা. বিধান রায়ের বাড়ির কাছে চলে এলাম। কিন্তু বর্ষণের বেগ আমাদের থামতে দিচ্ছিলো না। আমরা আরেকটা চালার নিচে দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার ছল করে আরেকটু আশ্রয় চুরি করলাম। চা খেতে খেতেই বিষ্টির বেগ একটু ধরে এল। এই সুযোগেই আমরা প্রিন্সেপ স্ট্রিটের অফিসটিতে চলে এলাম। ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। ঠেলাঠেলি, কনুই মারামারি করছে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু কেউ কাউকে পথ দিচ্ছে না। সকলেই অসহায়। সকলেই একটুখানি আশ্রয় চায়। অফিস বিল্ডিংয়ের পাশের খালি জায়গাটিতে প্রতি রাতে হাজার হাজার বাংলাদেশের তরুণ ঘুমোয়। একখানি চাদর বিছিয়ে লুঙ্গিটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে কেউ কেউ। যার তাও নেই, কাঁকর বিছানো মাটিকেই শয্যা হিসেবে মেনে নিয়ে রাত গুজরান করে। এদের মধ্যে ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান তরুণ যেমন আছে, আছে ধাড়ি নিষ্কর্মার দল। চোর ছ্যাঁচড় এমনকি কিছু কিছু সমকামী থাকাও বিচিত্র নয়। অন্যান্য দিন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। গোটা সংখ্যাটা একসঙ্গে দেখা যেত না। আজ বাসাভাঙা কাকের মতো সবাই অফিস বিল্ডিংটিতে একটুখানি ঠাঁই করে নিতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। যেদিকেই তাকাই না কেন শুধু মাথা, কালো কালো মাথা। ওপরে ওঠা প্রথমে মনে হয়েছিল অসম্ভব। ভিড়ের মধ্যে একটি আঙুল চালাবার মতোও খালি জায়গা নেই। কেমন করে যাব, একটি মেয়ে বয়সে যুবতী তার গায়ের কাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে আঁটসাঁট হয়ে লেগে গেছে, এই অবস্থায় এতগুলো মানুষ তাকে দেখছে, দেখে আমি নিজেই ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেলাম। এরই মধ্যে দেখি মানুষ ওপরে উঠছে এবং ওপর থেকে নিচে নামছে।

আমরা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপরে উঠে এলাম। কী করে ওপরে এলাম, সেটা ঠিক ব্যক্ত করা যাবে না। যে কষ্টকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়, তার সঙ্গে এই ওপরে ওঠার কিঞ্চিৎ তুলনা করা চলে। অফিসের খোপ খোপ কাউন্টারগুলোতে আজ আর কোনো কাজ চলছে না। সর্বত্র মানুষ গিসগিস করছে। এখানে সেখানে মানুষ ঝাঁক ঝাঁক মৌচাকের মতো জমাট বেঁধে আছে। জয়সিংহ ব্যানার্জীকে বললাম, এত কষ্ট করে আসাটা বৃথা হয়ে গেল। এই ভিড় ঠেলাঠেলির মধ্যে আমি সোহরাব সাহেবকে খুঁজব কোথায়? এই সময়ে দেখা গেল তিনতলার চিলেকোঠার দরোজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে এবং ইশারা করে ডাকছে। কাকে না কাকে ডাকছে। প্রথমে বিশেষ আমল দিইনি। সিঁড়িতেও মানুষ, তিল ধারণের স্থান নেই। লোকজন এই জলঅচল ভিড়ের মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, এই যে, আপনাকে ওপরে ডাকা হচ্ছে। ওপরে গিয়ে দেখলাম, সোহরাব সাহেব পাজামা হাঁটুর ওপর তুলে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে চারমিনার টানছেন আর শেখ মুজিবের মুণ্ডুপাত করছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আজ বঙ্গবন্ধু শব্দটি তিনি উচ্চারণ করলেন না। আরেকজন ছাত্রনেতা নীরবে বসে বসে সোহরাব সাহেবের কথামৃত শ্রবণ করছে। ছাত্রনেতাটিরও হয়তো জরুরি কোনো ঠেকা আছে। অথবা হতে পারে সোহরাব সাহেবের খুব রিলায়েবল লোক। নইলে নির্বিবাদে এমন বিরূপ মুজিবচর্চা এই প্রিন্সেপ স্ট্রিটের অফিসে কেমন করে সম্ভব। আমি বললাম, চুটিয়ে তো নেতার সমালোচনা করা হচ্ছে। যদি আমি চীৎকার করে জনগণকে জানিয়ে দিই তখন বুঝবেন ঠেলাটা। তখখুনি আমার দৃষ্টি সোহরাব সাহেবের হাঁটুর দিকে ধাবিত হল। যতটুকু পাজামা গুটিয়েছেন, দেখা গেল কালো কালো লোমগুলো সোজা দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে লোমের বন। ঘরে একজন মহিলা আছে দেখেও তিনি পাজামাটা ঠিক করে নিলেন না। বসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না স্বল্পপরিসর কক্ষটিতে। তাই দাঁড়িয়ে রইলাম। সোহরাব সাহেব বললেন, নেতাকে বকব না তো কাকে বকব। নেতার ডাকেই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। আজকে আসার সময় দেখলাম, বাচ্চাটার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। যে ঘরটিতে থাকি পানি উঠেছে। আর কত কষ্ট করব। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেললেই হয়। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। আমি বললাম, আপনি যদি একথা বলেন, তা হলে গোটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা দাঁড়াবে কিসের ওপর।

সোহরাব সাহেব বললেন, সাধে কি আর এরকম কথা মুখ দিয়ে আসে। কতদিকে কতকাণ্ড ঘটছে সে-সবের হিসেব রাখেন? আমি বললাম, কোনো হিসেবই রাখিনে সোহরাব সাহেব। কী করে রাখব। সোহরাব সাহেব আমার হাতে একটা লিফলেট দিয়ে বললেন, আপনি হার্মলেস মানুষ, তাই বিশ্বাস করে পড়তে দিচ্ছি। লিফলেটটি আগরতলা থেকে বেরিয়েছে। সংক্ষেপে তার মর্মবস্তু এ রকম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে ধরা পড়বার আগে এক

ঘরোয়া সভা ডেকেছিলেন। তাতে তিনি যদি পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন, কী কী করতে হবে সে-সকল বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওই সভায় একজন নাকি শেখ সাহেবের কাছে সাহস করে জিগগেস করছিল, বঙ্গবন্ধু, আপনার অবর্তমানে আমরা কার নেতৃত্ব মেনে চলব? শেখ সাহেব আঙুল তুলে শেখ মনিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এর নেতৃত্ব মেনে চলবে। লিফলেটটা ফেরত দিলে তিনি পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে একটা জেন্ট সাইজের পকেট রুমালের মতো পত্রিকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই দাগ দেয়া অংশটুকু পাঠ করুন। তারপর বিশুদ্ধ বাঙাল উচ্চারণে বললেন, নেতাকে কি আর সাধে গাইল্যাই। পত্রিকাটিও পড়ে দেখলাম। সংক্ষেপে সারকথা এই, আগরতলাতে নেতৃত্বের দাবিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের দল একরকম সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিল। তার প্রতিবাদে আগরতলার জনসাধারণ প্রকাশ্য সভা করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে আগরতলার মাটিতে বাংলাদেশের মানুষদের এই মারামারি হানাহানি তারা বরদাস্ত করবে না। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করতে চায় নিজেদের দেশে গিয়ে করুক। কাগজটা ফেরত দিয়ে সোহরাব সাহেব আমাকে জিগগেস করলেন, ভালো লেখেনি? আমি মাথা নাড়লাম। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে বাত ধরে গেছে। সুতরাং অধিক কথা না বাড়িয়ে বলে ফেললাম, সোহরাব সাহেব আপনার কাছে এদের জন্য একটা রেশনকার্ড ইস্যুর স্লিপ নিতে এসেছিলাম। আমি জয়সিংহ ব্যনার্জী এবং তার যজমানের মেয়ে সবিতাকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আরে সাহেব আপনি আমায় মুসকিলে ফেললেন। এই ভিড় হট্টগোলের সময় আমি কাগজ কোথায় পাই, কী করে কলম জোগার করি। আমি পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে বললাম, এই নিন, আপনি লিখে দিন। তিনি খসখস করে গতবাঁধা ইংরেজিতে লিখে দিলেন, প্লিজ ইস্যু রেশন কার্ড ফর মি. সো অ্যান্ড সো...ইত্যাদি, ইত্যাদি। কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাঁদিকের কাউন্টারে যে লোক বসে তাকে দেখালে একটা স্লিপ দিয়ে দেবেন। ওরা চলে গেল। আমরা আরো কিছুক্ষণ গল্পগাছা করলাম। এরই মধ্যে বিষ্টি ধরে এসেছে। তবে মেঘ কাটেনি। ঘড়িতে দেখলাম একটা বাজে। আমাকে উঠতে হল। দোতলায় নেমে দেখি আবদ্ধ মানবমণ্ডলীর মধ্যে চলাচলের একটা সাড়া পড়ে গেছে। একটানা অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকার পর মানুষদের মধ্যে একটা চলমানতার সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে ভিড় অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। নিচে নেমে এলাম। রাস্তায় পানি নামতে অনেক সময় লাগবে। তাও যদি আবার বিষ্টি না হয়। এখন আমি কী করব চিন্তা করছি। এখন সময় পিস্তলের আওয়াজের মতো একটা তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এই যে দাদা আপনারে একটা কথা জিগাইবার লাইগ্যা ডাক্তার রায়ের বাড়ি থেইক্যা ফলো করছি। আমি তাকিয়ে দেখলাম, লোকটার গাত্রবর্ণ ধানসেদ্ধ হাঁড়ির তলার মতো কৃষ্ণবর্ণ। মুখে দাঁড়িগোঁফ গজিয়েছে। পরনে একখানি ময়লা হাঁটুধুতি। গায়ের জামাটিও ময়লা। একেবারে আদর্শ জয়বাংলার মানুষ।

কিছুক্ষণ তাকিয়েও কোনো হদিশ করতে পারলাম না, কে হতে পারে। লোকটি বলল, আমারে আপনে চিনতে পারতাছেন না দাদা, আমি বাংলাবাজারের রামু। ওহ্ রামু তুমি কেমন আছ? দাদা ভগবান রাখছে। তোমার মা বাবা সবাই ভালো? দাদা মা বাবার কথা আর জিগাইবেন না। সব কটারে দেশের মাটিতে রাইখ্যা আইছি। রামু হুহু করে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রতিটি হিন্দু পরিবারেরই বলতে গেলে এরকম একেকটা করুণ ভয়ঙ্কর কাহিনী আছে। এসব কথা শুনতে বিশেষ ভালো লাগে না। কারণ আমি তো ভুক্তভোগী নই। তথাপি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই রামু আমাকে ছেড়ে দিয়ে সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে সরাসরি জানতে চাইলো, দাদা জয়সিংহ ঠাকুরের লগে আপনার এত পিরিত কিয়ের। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে মনে রামুকে ধন্যবাদ দিলাম। একটা পীড়াদায়ক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রামু। বললাম, রামু পিরিত-টিরিত কিছু নয়। জয়সিংহ তাঁর যজমানের মেয়েকে নিয়ে খুব অসুবিধেয় পড়েছেন। আমাকে ধরেছেন একটা রেশন কার্ডের স্লিপ করিয়ে দেবার জন্য। তা করিয়ে দিলাম। মেয়েটির নাকি আর কোনো অভিভাবক নেই। তাই তাকে পোষার দায়িত্বও জয়সিংহের ঘাড়ে এসে পড়েছে। অন্যায় কিছু করেছি রামু? রামু এবারে রাগে ফেটে পড়ল। শালা বদমাইশ বাউন, মা আর বুন দুইডা ক্যাম্পে কাঁইদ্যা কাঁইদ্যা চোখ ফুলাইয়া ফেলাইছে। আর হারামজাদা মাইয়াডারে কইলকাতা টাউনে আইন্যা মজা মারবার লাগছে। আর ওই মাগীডাও একটা খানকি। বুঝলেন দাদা এই খবরটা আপনেরে জানান উচিত মনে কইর‍্যা পাছু ধরছিলাম। তারপর উত্তরের কোনো পরোয়া না করে রামু হাঁটুধুতিটা আরো ওপরে তুলে রাস্তায় পানির মধ্যে পা চালিয়ে হন হন করে চলে গেল। হঠাৎ করে আমার খুব রাগ হচ্ছিল। কাউকে খুন করে ফেলার ইচ্ছে জাগছিল। করার মতো কিছু না পেয়ে রেগে দাঁতে অধর চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে থুতনির কাছে তরল পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করে, আঙুল দিয়ে দেখি রক্ত। আমার অধর কেটে গিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

চার

হোস্টেলে পৌঁছুতে বেলা দুটো বেজে গেল। ক্ষিতীশ কলেজ থেকে ফিরেছে। বলল, দাদা মেজদা নাকি চিত্তকে কীসব রান্নাবান্না করার ফরমায়েশ দিয়ে গেছে। চিত্ত বারেবারে খুঁজছে। আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি। নইলে নিজেই কবে খেয়ে নিতাম। ব্যাপার জানেন নাকি কিছু? বললাম, হ্যাঁ ক্ষিতীশ একজন রোগীর জন্য কিছু খাবার রান্না করে নিতে হবে হাসপাতালে। যদি এরই মধ্যে রান্না হয়ে গিয়ে থাকে তুমি একটু কষ্ট করে ভাত আর মাছ আলাদা আলাদাভাবে এই বাটিটার মধ্যে

ভরে দিতে বলো। তক্তপোষের তলা থেকে আমি ছোট্ট বাটিটা বের করে ক্ষিতীশের হাতে দিলাম। অল্পক্ষণ পর ক্ষিতীশ ভাত-তরকারিভর্তি বাটিটা নিয়ে এলে আমি পেট-মোটা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে আস্ত বাটিটা ব্যাগের পেটের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলাম। ক্ষিতীশ জিগগেস করল, দাদা কি এখনই বেরুবেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ ক্ষিতীশ আমাকে এখখুনিই বেরুতে হচ্ছে। কতদূর যাবেন ? পি. জি. হাসপাতাল। ক্ষিতীশ বলল, শহরে কোনো ট্রামবাস চলছে না, রাস্তায় এককোমর জল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, যে-কোনো সময়ে বিষ্টি নামতে পারে। ব্যালকনির দিকে দরোজা জানালা খুলে দিল। কালো মেঘ কলকাতার আকাশের চার কোণ ছেয়ে একেবারে নিচে নেমে এসেছে। ট্রাম বাস ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতেটানা রিকশাগুলো ডিঙি নৌকোর মতো চলাফেরা করছে। বাস্তবিকই পথে বেরুবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তথাপি মানুষ চলাচল করছে। মহিলারা মাথায় ছাতা মেলে ধরছে বটে কিন্তু অনেকেরই পরনের শাড়ি কোমর অবধি ভিজে গেছে। আমি বললাম, যেতেই হবে আমাকে। তুমি বরং একটা উপকার করো। নিচের কোনো দোকান থেকে সস্তায় একটা জয়বাংলা বর্ষাতি কিনে এনে দাও। বিশটি টাকা বের করে তার হাতে তুলে দিলাম। সে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নিচে চলে গেল।

ইত্যবসরে আমি একটা পুরোনো প্যান্ট পরে হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিলাম। দেশ থেকে এক জোড়া জুতো এনেছিলাম। কলকাতায় আসার পর বিশেষ পরা হয়নি। সেটা পরে নিলাম। স্যান্ডেল জোড়ার যে অবস্থা হয়েছে আশঙ্কা করছিলাম পানির সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবে না। ক্ষিতীশ বর্ষাতি কিনে এনে দিলে, পরে নিয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে নামতেই আবার ঝম ঝম করে বিষ্টি নামল। বর্ষণের বেগ এত প্রবল, পাঁচহাত দূরের জিনিসও ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাচ্ছে। ফুটপাত দিয়ে চলতে গিয়ে পরপর দু জন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেললাম। রাস্তা পানিতে ফুলে ফেঁপে একটা ছোটখাটো বাঁকা নদীর মতো দেখাচ্ছে। এই কোমরপানির মধ্যে চলতে গিয়ে আমার মনে হল শরীরে মনে যেন আমি কিছুটা কাঁচা হয়ে উঠেছি। এই ধারাজল আমার শরণার্থী জীবনের সমস্ত কালিমা ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য একটা সুড়সুড়ি অনুভব করছিলাম। আমি যেন আবার সেই ছোট্ট শিশুটি হয়ে গেছি। মনে পড়ে গেল বাড়ির পাশের খালটিতে কী আনন্দেই না সাঁতার কাটতাম। ছাঁৎ করে মনে পড়ে গেল। একবার ঝড়বিষ্টির মধ্যে ভিজে চুপসে তায়েবাদের গেন্ডারিয়ার বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। তায়েবা দরোজা খুলে আমাকে দেখে রবীন্দ্রনাথের সে-গানটির দুটো কলি কী আবেগেই না গেয়ে উঠেছিল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরানসখা বন্ধু হে আমার।' সেদিন আর আজ। আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছি। প্রতি পদক্ষেপে অতীত, আমার আর তায়েবার অতীত, মনের মধ্যে ঢেউ দিয়ে জেগে উঠছে।

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় উনিশশো আটষট্টি সালে। সেদিনটার কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। মৃত্যুর মুহূর্তেও ভুলতে পারব না। আগস্ট মাসে একটা

দিনে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। আমি গিয়েছিলাম বাংলাবাজারের প্রকাশক পাড়ায়। নানা কারণে মনটা বিগড়ে গিয়েছিল। সুনির্মলদা আমাকে বললেন, চলো একটা জায়গায় ঘুরে আসি। হেঁটে হেঁটে গেন্ডারিয়ার লোহারপুল পেরিয়ে বুড়িগঙ্গার পারের একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির সামনে এসে সুনির্মলদা বললেন, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি দেখি ভেতরে কেউ আছে কিনা। তিনি এগিয়ে গিয়ে দরোজায় কড়া নাড়তে লাগলেন। দরোজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেল। সুনির্মলদা ভেতরে ঢুকলেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাকলেন, এসো দানিয়েল। আমিও ভেতরে প্রবেশ করলাম। সুনির্মলদা বললেন, দেখো তায়েবা কাকে ধরে নিয়ে এসেছি। সাদা শাড়ি পরিহিতা উজ্জ্বল শ্যামল রঙের মহিলাটি আমাকে ঘাড়টা একটুখানি দুলিয়ে সালাম করল। সুনির্মলদা তক্তপোষের সাদা ধবধবে চাদরের ওপর পা উঠিয়ে বসলেন। মহিলাটি বললেন, আপনিও পা উঠিয়ে বসুন। ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললাম, আমার পায়ে অনেক ময়লা। আপনার আস্ত চাদরটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বরঞ্চ আমাকে একটা অন্যরকম আসন দিন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি আপনি পাটা ধুয়েই বসুন। আমি পানি এনে দিচ্ছি। এক বদনা পানি এনে দিলে, আমি পা দুটো রগড়ে রগড়ে পরিষ্কার করে বিছানার ওপর বসেছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন আমি একটা পাটভাঙা সাদা পাঞ্জাবি পরেছিলাম। কী একখানা লাল মলাটের বই সারাক্ষণ বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলাম। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবির বুকের অংশে মলাটের লাল রংটা গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। মহিলাটি আমার পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল, ওমা আপনার পাঞ্জাবিতে এমন খুনখারাবির মতো রং দিয়েছে কে? আমি ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কেউ দেয়নি। কখন বইয়ের মলাটের রংটা পাঞ্জাবিতে লেগে গেছে খেয়াল করিনি। লক্ষণ সুবিধের নয় বলে মহিলাটি সুন্দর সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসল। ফুলদানিতে একটি সুন্দর রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তার হাসিটি রজনীগন্ধার মতো সুন্দর স্নিগ্ধ। ঘাড়টাও রজনীগন্ধার মতো ঈষৎ নোয়ানো।

আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম ঘরে বিশেষ আসবাবপত্তর নেই। তক্তপোশের ওপর হারমোনিয়াম, তবলা এবং তানপুরা। পাশে পড়ার টেবিল। সামনে একখানি চেয়ার। শেলফে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পাঠ্যবই। একেবারে ওপরের তাকে সেই চমৎকার চারকোণা ফুলদানিটি, যার ওপর শোভা পাচ্ছে সদ্যচ্ছিন্ন রজনীগন্ধার গুচ্ছ। মনে মনে অনুমান করে নিলাম, এ বাড়িতে গান-বাজনার চল আছে। এ বাড়ির কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এই ঘরজোড়া তক্তপোশটিতে নিশ্চয়ই একের অধিক মানুষ অথবা মানুষী ঘুমোয়।

সুনির্মলদা বললেন, দানিয়েলের সঙ্গে এখনো পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। দানিয়েল, এ হল আমাদের বোন তায়েবা। আর ও হচ্ছে দানিয়েল, অনেক গুণ, কালে কালে পরিচয় পাবে। তবে সর্বপ্রধান গুণটির কথা বলে রাখি, ভীষণ বদরাগী। নাকের ওপর দিয়ে মাছি উড়ে যাওয়ার উপায় নেই, দু টুকরো হয়ে যায়। তায়েবা সায় দিয়ে বলল, বারে যাবে না, যা খাড়া এবং ছুঁচোলো নাক। মহিলা

আমার তারিফ করল কি নিন্দে করল সঠিক বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে আরো দু জন মহিলা এসে ঘরে ঢুকল। মুখের আদলটি তায়েবারই মতো। তবে একজনের রং একেবারে ধবধবে ফর্সা। তার পরনে শাড়ি। আরেকজন অত ফর্সা নয়, কিছুটা মাজা, তার পরনে সালোয়ার কামিজ। তায়েবা পরিচয় করিয়ে দিল। সালোয়ার পরিহিতাকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে আমার ইমিডিয়েট ছোট বোন। নাম দোলা। বি. এ. পরীক্ষা দেবে। খেলাধুলার দিকে ওর ভীষণ ঝোঁক। আর ও হচ্ছে তার ছোটোটি নাম ডোরা। গানবাজনা করে। সুনির্মলদা আপনারা কথাবার্তা বলুন, কিছু খাবার দেয়া যায় কি না দেখি।

সেদিন গেন্ডারিয়ার বাসা থেকে ফিরে আসার সময় দেখি আকাশে একখানা চাঁদ জ্বলছে। আমি পাঞ্জাবির বুকের লালিয়ে যাওয়া অংশটি বারবার স্পর্শ করে দেখছিলাম। এ কি সত্যি সত্যি বইয়ের মলাটের রং, নাকি হৃদয়ের রং রক্ত মাংস চামড়া ভেদ করে পাঞ্জাবিতে এসে লেগেছে। আমার মনে হয়েছিল, ওই দূরের রুপোলি আভার রাত আমার জন্যই এমন অকাতরে কিরণধারা বিলিয়ে দিচ্ছে। কামিনী হাস্নাহেনা আমার ইন্দ্রিয়গ্রামের গভীর পরিতৃপ্তির জন্য এমন হৃদয়জুড়োনো সুবাস ঢালছে। আজ সুনির্মলদার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ। তবু, তবু আমি তাকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দিতে পারব, কেননা তিনি আমাকে বুড়িগঙ্গার পাড়ে তায়েবাদের সে গেন্ডারিয়ার বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে বাঁক ঘুরে রবীন্দ্রসদন অভিমুখী রাস্তাটা ধরতেই পানির প্রতাপ কমে এল। বিষ্টি হচ্ছে, তথাপি রাস্তাঘাটে জল দাঁড়ায়নি। এতক্ষণ কেমন একটা ঝোঁকের মাথায় এতদূর চলে এসেছি। এখন নিজের দিকে তাকাতে একটু চেষ্টা করলাম। প্যান্টে নিশ্চয়ই পচা পানির সঙ্গে কলকাতার যাবতীয় ময়লা এসে মিশেছে। লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় এখন থেকেই চুলকোতে শুরু করেছে। বর্ষাতিটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। সস্তার তিন অবস্থার, এক অবস্থা প্রথম দিনেই প্রত্যক্ষ করা গেল। এখানে সেখানে ছড়ে গেছে। পায়ের নিচের জুতো জোড়ার অবস্থা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছিনে। প্রতি পদক্ষেপেই অনুভব করছি, বিষ্টিতে গলে যাওয়া এঁটেল মাটির মতো সোলটা ফকফকে হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আরেকবার সামনে চরণ বাড়ালেই সোলদুটো আপনা থেকেই পাকা ফলের মতো খসে পড়বে। নিজের ওপর ভয়ানক করুণা হচ্ছিল। সিগারেট খাওয়ার তেষ্টা পেয়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট আর ম্যাচ বের করে দেখি ভিজে একেবারে চুপসে গেছে। দুত্তোর ছাই, রাগ করে সিগারেট ম্যাচ দুটোই ড্রেনের মধ্যে ছুড়ে দিলাম।

হাসপাতালের গেট খুলতে এখনো প্রায় আধঘণ্টা বাকি। এ সময়টা আমি কি করি। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। ধারেকাছে কোনো রেস্টুরেন্টও নেই যে বসে সময়টা পার করে দেয়া যায়। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দারোয়ানের কাছে যেয়ে বললাম, ডা. মাইতির সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে দারোয়ানের বুঝি দয়া হল। সে ঘটাং করে লোহার গেটের পাল্লা দুটো আলাদা করল। আমি ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

তায়েবার কেবিনে ঢুকে দেখি, সে শুয়ে আছে। পাশের বেডের উৎপলা আজও হাজির নেই। তায়েবা কি ঘুমিয়ে পড়েছে, নাকি এমনিতে চোখ বন্ধ করে আছে। মস্তবড় ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। আয়াটায়া কিংবা নার্স জাতীয় কাউকে খোঁজ করার জন্য করিডোরের দিকে গেলাম। আমার সিক্ত জুতো থেকে ফ্যাঁস ফ্যাঁস হাঁসের ডাকের মতো এক ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর প্যান্ট থেকে পানি পড়ে ধোয়া মোছা তকতকে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখে হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করার অপরাধে যদি ঘাড় ধরে বের করে দেয়, আমার বলার কিছুই থাকবে না। একসময় তায়েবা চোখ মেলে জিগগেস করল, কে ? আমি তার সামনে যেয়ে দাঁড়ালে খুব গভীর গলায় পরম সন্তোষের সঙ্গে বলল, ও দানিয়েল ভাই, আপনি এসেছেন তা হলে। আমি সেই পেটমোটা ব্যাগটা তার হাতে গছিয়ে দিয়ে বললাম, এর মধ্যে ভাত, মাছ রান্না করা আছে। সে ব্যাগটা স্টিলের মিটসেফের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। খুশিতে তার চোখজোড়া চিকচিক করে উঠল। দানিয়েল ভাই বসুন, টুলটা দেখিয়ে দিল তারপর আমার আপাদমস্তক ভালো করে তাকাতেই শক লাগার মতো চমক খেয়ে বিছানার ওপরে ওঠে বসল। একী অবস্থা হয়েছে আপনার দানিয়েল ভাই, সব দেখি ভিজে একেবারে চুপসে গেছে। আমি বললাম, বা রে ভিজবে না, রাস্তায় এককোমর পানি ভেঙেই তো আসতে হল। তায়েবা জানতে চাইল, এ বিষ্টির মধ্যে সব পথটাই কি আপনি হেঁটে এসেছেন ? আমি বললাম, উপায় কী ? ট্রাক বাস কিছুইতো চলে না। তাছাড়া ট্যাকসিতে চড়া সে তো ভাগ্যের ব্যাপার। সহসা তার মুখে কোনো কথা জোগাল না। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে একটি বড়সর তোয়ালে আমার হাতে দিয়ে বলল, আপাতত, গায়ের ওই কিম্ভূতকিমাকার জন্তুটা এবং পায়ের জুতোজোড়া খুলে গা মাথা ভালো করে মুছে নিন। আমি দেখি কী করা যায়। সে গোবিন্দের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে একেবারে করিডোরের শেষ মাথায় চলে গেল। গায়ের বর্ষাতিটা খোলার পর ফিতে খুলে জুতাজোড়া বের করার জন্য যেই একটু মৃদু চাপ দিয়েছি অমনি সোলদুটো আপসে জুতো থেকে আলাদা হয়ে গেল। আমার ভয়ানক আফসোস হচ্ছিল। এই এক জোড়া জুতো অনেকদিন থেকে বুকের পাঁজরের মতো কলকাতা শহরের জলকাদা বিষ্টির অত্যাচার থেকে রক্ষা করে আসছি। আজ তার পরমায়ু শেষ হয়ে গেল। গা মোছার কথা ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে খসেপড়া সোল দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই সময়ের মধ্যে গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তায়েবা ফিরে এল। সে গোবিন্দকে কী একটা ব্যাপারে অনুরোধ করছে। আর গোবিন্দ বারে বারে মাথা নেড়ে বলছে, না দিদিমণি সে আমাকে দিয়ে হবে না, দেখছেন না কেমন করে বিষ্টি পড়ছে। দোকানপাট সব বন্ধ। তাদের কথা ভালো করে কানে আসছিল না। আমি জুতো-জোড়ার কথাই চিন্তা করছিলাম। তায়েবা গোবিন্দের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী একটা বলতেই তাকে অনেকটা নিমরাজি ধরনের মনে হল। বলল, টাকা আর

ছাতার ব্যবস্থা করে দিন। আমার খুব ভয় লাগছিল, পাছে তায়েবা আমাকে কোনো পয়সা টাকা দিতে বলে, আসলে আমার কাছে বর্তমানে বিশ-বাইশ টাকার অধিক নেই এবং টাকাটা খরচ করারও ইচ্ছে নেই। পঞ্চাশ নয়া পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাবার জন্য দৈনিক চার-ছয় মাইল পথ অবলীলায় হেঁটে চলাফেরা করছি ইদানীং। আমার জুতোর খসেপড়া সোল দুখানি তায়েবার দৃষ্টি এড়াল না। জিগগেস করল, কী হল আপনার জুতোয় ? আমি বললাম, কলকাতায় পানির সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে এইমাত্র জুতো লীলা সাঙ্গ করল। সে বালিশের তলা থেকে একটা পার্স বের করে আপনমনে টাকা গুনতে গুনতে উচ্চারণ করল, ও তাহলে এই ব্যাপার। কেবিনের বাইরে গিয়ে গোবিন্দের সঙ্গে নিচু গলায় আবার কীসব আলাপ করল। ভেতরে ঢুকে আমাকে বলল, আপনার সেই জন্তুটা একটু দিন গোবিন্দ একটু বাইরে থেকে আসবে। গোবিন্দের হাতে নিয়ে বর্ষাতিটা দিল। গোবিন্দ হাঁটা দিয়েছে, এমন সময় ডাক দিয়ে বলল, গোবিন্দদা এক মিনিট দাঁড়াও। আমার কাছে এসে জানতে চাইল আপনার তো সিগারেট নেই। আমি বললাম, না। কী সিগারেট যেন আপনি খান। চারমিনার। এই ছাইভস্ম কেন যে টানেন ! সে দরোজার কাছে গিয়ে বলল। গোবিন্দদা ওখান থেকে পয়সা দিয়ে এক প্যাকেট চারমিনার আর একটা ম্যাচ আনবে। তারপর তায়েবা বাথরুমে যেয়ে পা দুটো পরিষ্কার করে এসে কোনো রকমে নিজেকে বিছানার ওপর ছুড়ে দিল। স্যান্ডেল না পরে সে বেরিয়ে গিয়েছিল, এটা সে নিজেই খেয়াল করেনি। এই হাঁটাহাঁটি ডাকাডাকিতে নিশ্চয়ই তার অনেক কষ্ট হয়েছে। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। আসলে তায়েবা সে আগের তায়েবা নেই। একটুকুতেই হাঁফিয়ে ওঠে। এখন সে বিছানায় পড়ে আছে শীতের নিস্তরঙ্গ নদীর মতো। চুপচাপ শান্ত স্থির। আমার কেমন জানি লাগছিল। খুব ম্লান কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, দানিয়েল ভাই জানেন, জীবনে আপনি খুব বড় হবেন। তার গলার আওয়াজটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল। কণ্ঠস্বরে চমকে গেলাম। তবুও রসিকতা করে বললাম, বড় তো আর কম হইনি, এখন বুড়ো হয়ে মরে যাওয়াটাই শুধু বাকি। আপনি সব সময় কথার উল্টা অর্থ করেন। থাক, আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। এমনিতেও আমার বিশেষ ভালো লাগছে না। সে হাঁ করে নিশ্বাস নিতে লাগল। আমি জানতে চাইলাম, তায়েবা আজ তোমার শরীরটা কি খুব খারাপ ? না না অত খারাপ নয়। দেখছেন না কী নোংরা বিষ্টি। তাছাড়া আমাকে আজ আবার ইনজেকশন দিয়েছে। যেদিন ইনজেকশন দেয় খুবই কষ্ট হয়। অনেকক্ষণ ধরে দিতে হয় তো। আমি বললাম, ঠিক আছে, কথা না বলে চুপ করে থাক। সারাদিন তো চুপ করেই আছি। একবার মাত্র মাইতিদা এসেছিলেন সেই ইনজেকশন দেয়ার সময়। তার পর থেকেই তো একা বসে আছি। কথা বলব কার সঙ্গে। উৎপলার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে সময় কাটাতাম। কাল শেষ রাত থেকে তার অসুখটা বেড়েছে। তাই তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে গেছে। আজ সকালে আমাদের ওয়ার্ডের পঁয়তাল্লিশ নম্বরের হাসিখুশি ভদ্র মহিলাটি মারা গেছেন। আমার

কী যে খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আমিও মারা যাব। প্রতিদিন এখানে কেউ না কেউ মরছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ছুটে পালিয়ে যাই কোথাও। আমি বললাম, কোথায় যেতে চাও তায়েবা। সে জবাব দিল, জানিনে। হঠাৎ তায়েবা আমার ডান হাতখানা ধরে বলল, আচ্ছা দানিয়েল ভাই, আপনার মনে আছে একবার ঝড় বিষ্টিতে ভিজে সপসপে অবস্থায় আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন আমি বললাম, কী আশ্চর্য তায়েবা, আসার সময় পথে সে-কথাটি আমারও মনে পড়েছে। সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার চেষ্টা করে বলল, বুঝলেন দানিয়েল ভাই, আপনার সঙ্গে আমার মনের গোপন চিন্তার একটা মিল রয়েছে। তায়েবা গুন গুন অস্ফুট স্বরে সে গানের কলি দুটো গাইতে থাকল। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরানসখা বন্ধু হে আমার।'

জানেন দানিয়েল ভাই, গেন্ডারিয়ার বাড়ির জন্য আমার মনটা কেমন আনচান করছে। গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি আমাদের পোষা ময়নাটি মরে গেছে। পাশের কাঠ ব্যবসায়ীর বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। সেই অবধি মনটা হুহু করছে। এরকম বিষ্টির সময় বুড়িগঙ্গা কেমন ফেঁপে ফুলে অস্থির হয়ে ওঠে। পানির সে কেমন সুন্দর চিৎকার। তিন বোন পাশাপাশি একসঙ্গে ঘুমোতাম। দিনাজপুর থেকে মা আর বড় ভাইয়া এসে থাকত। ছোট ভাইটি সারাক্ষণ পাড়ায় ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে বেড়াত। এখন জানিনে কেমন আছে। একটা যুদ্ধ লাগল আর সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। এখানে আমি পড়ে আছি। দোলা গেছে তার গ্রুপের মেয়েদের সঙ্গে ট্রেনিং নিতে সেই ব্যারাকপুর না কোথায় মা দিনাজপুরে। বড় ভাইয়া কোথায় খবর নেই। ইচ্ছে করেই তায়েবা ডোরার নাম মুখে আনল না। পাছে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বরাবর দেখে আসছি। তায়েবার কাছে গোটা পৃথিবী একদিকে আর ডোরা একদিকে। রেডিও কিংবা টি.ভি.-তে ডোরার রবীন্দ্রসঙ্গীতের যেদিন প্রোগ্রাম থাকত, সে রিকশা ভাড়া খরচ করে চেনাজানা সবাইকে বলে আসত আজকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রামটা শুনবেন, আমার বোন ডোরা গান গাইবে। আর ডোরাও ছিল তায়েবার অন্ত প্রাণ। অত বড় ডাগর মেয়েটি, তবু তায়েবাকে জড়িয়ে ধরে না ঘুমোলে ঘুম আসত না। তায়েবা কাছে না বসলে খাওয়া হত না। মাঝে মাঝে ডোরার পেটে কী একটা ব্যথা উঠত। তখন তায়েবাকে সবকিছু বাদ দিয়ে ডোরার বিছানার পাশে হাজির থাকতে হত। আজ তায়েবার এই অবস্থায় ডোরা কী করে প্রায়-বুড়ো একজন মানুষের সঙ্গে দিল্লি হিল্লি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারিনে। তায়েবা দু-চোখ বন্ধ করে আছে। আমি একরকম নিশ্চিত যে, সে ডোরার কথাই চিন্তা করছে।

গলা খাঁকারির শব্দে পেছন ফিরে তাকালাম। গোবিন্দ বাইরে থেকে ফিরে এসেছে। তার হাতে একটা প্যাকেট। ডাক দিল, এই যে দিদিমণি, নিন আপনার জিনিসপত্তর। এর মধ্যে সব আছে আর ওই নিন পাঁচ টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা ফেরত এসেছে। তায়েবা বলল, অনেকতো কষ্ট করলে গোবিন্দদা, এই টাকাটা

তুমিই রাখো। গোবিন্দের ভাঙাচোরা মুখমণ্ডলে খুশির একটা চাপা ঢেউ খেলে গেল। তায়েবা তার বিছানার ওপর প্যাকেটটা উপুর করল। ভেতরের জিনিসপত্তর সব বেরিয়ে এসেছে। একটা ধুতি, মাঝামাঝি দামের একজোড়া বাটার স্যান্ডেল, সিগারেট, ম্যাচ আর তার নিত্য ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিস। আমার দিকে তাকিয়ে তায়েবা কড়া হুকুমের সুরেই বলল, দানিয়েল ভাই, তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢোকেন। পরনের ওই প্যান্ট খুলে ফেলে এই সাবানটা দিয়ে যেখানে যেখানে রাস্তার পানি লেগেছে ভালো করে রগড়ে ধুয়ে ফেলুন। এ পানির স্পর্শ বড় সাংঘাতিক। স্কিন ডিজিজ-টিজিজ হয়ে যেতে পারে। তারপর এই স্যান্ডেল জোড়া পরবেন। দয়া করে আপনার জুতোজোড়া ওই দিকের ডাস্টবিনে ফেলে আসুন। ওটা তো আর কোনো কাজে আসবে না। আমি বললাম, তায়েবা আমি যে ধুতি পরতে জানিনে। এবার তায়েবা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আপনি এখনো ক্ষেতের কুমড়োই রয়ে গেছেন। কিছুই শেখেননি। অত আঠারো রকমের প্যাঁচগোচের দরকার কী ? আপনি দু-ভাঁজ দিয়ে সোজা লুঙ্গির মতো করেই পরবেন, যান, যান বাথরুমে ঢোকেন, অত কথা শুনতে চাইনে। এদিকে ভিজিটিং আওয়ারের সময় ঘনিয়ে এল।

আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। আমি ধুতিখানা লুঙ্গির মতো করে পরে বাইরে এসে জিগগেস করলাম, এখন ভেজা প্যান্টটা নিয়ে কী করি। তায়েবা বলল, কোনার দিকে চিপে টিপে রাখুন, যাওয়ার সময় ব্যাগের ভেতর পুরে নিয়ে যাবেন। তারপর আমাকে আবার বাথরুমে প্রবেশ করতে হল। শরীর ঘষে-মেজে লুঙ্গীর মতো করে ধুতিপরা অবস্থায় আমাকে দেখে তায়েবা মুখ টিপে হাসল। আয়নার সামনে গিয়ে দেখে আসুন, আপনাকে এখন ফ্রেশ দেখাচ্ছে। আপনার এমন একটা কুৎসিত স্বভাব, সব সময় চেহারাখানা এমন কুৎসিত করে রাখেন, মনে হয় সাত পাঁচ জনে ধরে কিলিয়েছে। তাকিয়ে দেখলে ঘেন্না করতে ইচ্ছে হয়। তায়েবা একথা কম করে হলেও একশোবার বলেছে। কিন্তু আমার চেহারার কোনো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। আমি বললাম, তায়েবা আমি বোধহয় মানুষটাই কুৎসিত। আমার ভেতরে কোনো সৌন্দর্য নেই, বাইরে ফুটিয়ে তুলবো কেমন করে ? তায়েবা আমার কথার পিঠে বলল, তাই বলে কি চব্বিশ ঘণ্টা এমন গোমড়া মুখ করে থাকতে হবে, তারও কি কোনো কারণ আছে ? সব মানুষেরই একধরনের না একধরনের দুঃখ আছে, তাই বলে দিনরাত একটা নোটিশ নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে নাকি ? এই যে আমাকে এই অবস্থায় দেখছেন, আমার কি দুঃখের অন্ত আছে, কিন্তু বেশ তো আছি। যাক এ পর্যন্ত বলে তায়েবা হাঁফাতে থাকল।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে একজন সিরিয়স রোগীর সঙ্গে কথা বলছি। আসলে আমি কথা কাটাকাটি করছি বুড়িগঙ্গার পাড়ের তায়েবার সঙ্গে। সে তায়েবা আর এ তায়েবা এক নয়, একথা বার বার ভুলে যাই। গেন্ডারিয়ার বাসায় ভাই-বোন পরিবেষ্টিত তায়েবার যে রূপ, তার সঙ্গে বর্তমান তায়েবার আর কী কোনো তুলনা করা যেতে পারে ? বড়জোড় বর্তমান তায়েবা গেন্ডারিয়ার তায়েবার একটা দূরবর্তী

ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। গেন্ডারিয়ার বাড়িতে তায়েবাকে যে দেখেনি কখনো তার আসল রূপ ধরতে পারবে না। খাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, রাঁধছে, বাড়ছে বোনদের তত্ত্ব-তালাশ করছে, কলেজে পাঠাচ্ছে, নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, সর্বত্র একটা ঘূর্ণির বেগ জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কখনো খলখল হাসিতে অপরূপা লাস্যময়ী, কখনো দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ছে। একে ধমক দিচ্ছে, তাকে শাসাচ্ছে, সদাচঞ্চল, সদাপ্রাণবন্ত। আবার কখনো চুপচাপ গম্ভীর। তখন তাকে মনে হয়, সম্পূর্ণ ধরাছোঁয়ার বাইরে, অত্যন্ত দূরের মানবী। কোনো পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দেয়ার জন্য যেন তার জন্ম হয়নি। কোনো শাসন বারণ মানে না। দুর্বার গতিস্রোতে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক জায়গায় আটকে রাখে কার সাধ্য। চেষ্টা যে করিনি তা নয়। প্রতিবারই প্রচণ্ড আঘাত করে সে নিজের গতিবেগে ছুটে গেছে। আবার যখন তাকে ছেড়ে আসতে চেষ্টা করেছি, সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে কাছে টেনে নিয়েছে। যখন সে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আকাশের তারকারাজি কিংবা বুড়িগঙ্গাতে ভাসমান নৌকোর রাঙা রাঙা পালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত, তখন তাকে তারকার মতো সুদূর এবং রহস্যময় নদীতে চলমান রাঙাপালের একটা প্রতীক মনে হত। যেন কারো কোনো বন্ধনে ধরা দেয়ার জন্য সে পৃথিবীতে আসেনি। তায়েবার অনেক ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমি এসেছি। কতদিন, কতরাত্রি তার সঙ্গে আমার একত্রে কেটেছে। এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে অনেক বিশ্রী ইঙ্গিত করেছে। তায়েবার নিজের লোকেরাও কম হাঙ্গামা হুজ্জত করেনি। এমনকি, তার অভিভাবকদের মনেও ধারণা জন্মানো বিচিত্র নয় যে আমি তাকে গুণ করেছি।

আমি কিন্তু তায়েবাকে কখনো আমার, এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তার সঙ্গে সম্পর্কের ধরনটা কী, অনেক চিন্তা করেও নির্ণয় করতে পারিনি। হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছে সে। চোখ দুটো সম্পূর্ণ বোজা। নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নাকের দুপাশটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার ডান হাতটা আমার মুঠোর মধ্যে। এই যে গভীর স্পর্শ লাভ করছি তাতে আমার প্রাণের তন্ত্রীগুলো সোনার বীণার মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। এই স্পর্শ দিয়ে যদি পারতাম তার সমস্ত রোগ-বালাই আমার আপন শরীরে শুষে নিতাম। তার জন্য আমার সবকিছু এমন অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার এই যে সহজ সরল ইচ্ছে—ওটাকে কি প্রেম বলা যায় ? যদি তাই হয় আমি তা হলে তায়েবার প্রেমে পড়েছি। দানিয়েল ভাই, কথা বলল তায়েবা। তার চোখ দুটো এখনো বোজা। কণ্ঠস্বরটা খুবই ক্ষীণ, যেন স্বপ্নের ভেতর তার চেতনা ভাষা পেতে চেষ্টা করছে। আমি তার দুটো হাতই টেনে নিলাম। দানিয়েল ভাই, আবার ডাকল তায়েবা। এবার তার কণ্ঠস্বরটি অধিকতর স্পষ্ট। আমি বললাম, তায়েবা বলো। সে চোখ দুটো খুলল, শাড়ির খুঁটে মুছে নিল। তারপর ধীরে, অতি ধীরে উচ্চারণ করল, দানিয়েল ভাই, এবার যদি বেঁচে যাই, তা হলে নিজের জন্য বাঁচার চেষ্টা করব। আমার বুকটা কেঁপে গেল। বললাম, এমন করে কথা বলছ কেন ? দানিয়েল ভাই, আমার অসুখটি এত সোজা নয়। আপনি ঠিক বুঝবেন না, মৃত্যু আমার প্রাণের

দিকে তাক করে আছে। এক সময় বোঁটাসুদ্ধ আস্ত হৃদপিণ্ডটি ছিঁড়ে নেবেই। বললাম, ছি ছি তায়েবা, কি সব আবোল-তাবোল প্রলাপ বকছ। দানিয়েল ভাই, এই মুহূর্তটিতে এই কথাটিই আমার কাছে সবচাইতে সত্য মনে হচ্ছে। সারা জীবন আমি আলেয়ার পেছনে ছুটেই কাটিয়ে গেলাম। মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সুখে দুঃখে হোক একটা অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমি তো হাওয়ার ওপরে ভাসছি। তারা হয়তো সুখ পাবে জীবনে, নয়তো দুঃখ পাবে, তবু সকলে নিজের নিজের জীবনটি যাপন করবে। কিন্তু আমার কী হবে, আমি কী করলাম ? আমি যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। প্রতিটি মানুষ একটা জীবন নিয়েই জন্মায়। সে জীবনটাই সবাইকে কাটাতে হয়। কিন্তু জীবনযাপনের হিসেবে যদি ফাঁকি থাকে তা হলে জীবন ক্ষমা করে না। ডাক্তারেরা যা-ই বলুন, আমি তো জানি আমার অসুখের মূল কারণটা কী ? এক সময় আমার জেদ এবং অভিমান দুইই ছিল। মনে করতাম আমি অনেক কিছু ধারণ করতে পারি। এখন চোখের জলে আমার সে অভিমান ঘুচেছে। দশ পনেরো বছর থেকে তো বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছি। এখন সেই বাংলাদেশ যুদ্ধ করছে। কিন্তু আমি কোথায় ? আমার সবকিছু তো চোখের সামনেই ছত্রখান হয়ে গেল। আমার মা কোথায়, ভাই-বোনেরা কোথায়, এখানে আমি একেবারে নিতান্ত একাকী আপন রক্তের বিষে একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। তার দুচোখের কোনায় দুফোটা পানি দেখা দিল। আমি রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। তায়েবা বলল, জানেন দানিয়েল ভাই—আগে আমি কোনাকানচি হিসেব করে চিন্তা করতে ঘৃণা করতাম। এখন নানারকম চিন্তা আমার মাথায় ভর করে। মানুষ মরলে কোথায় যায়, মাঝে মাঝে সে চিন্তাও আমার মনে উদয় হয়। উৎপলা বলছে মানুষ মরলে তার আত্মা পাখি হয়ে যায়। আবার আরতিদি বলেন, এক জন্মে মানুষের শেষ নয়। তাকে বার বার জন্মাতে হয়। এসব বিশ্বাস করিনে, তবে শুনতে ভালোই লাগে। ধরুন কোনো কারণে আরো একবার যদি আমি জন্মগ্রহণ করি, তাহলে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে হয়েই জন্মাব। পরম নিষ্ঠাসহকারে নিজের জীবনটাই যাপন করব। ঢোলা জামা পরা আঁতেলদের বড় বড় কথায়, একটুও কান দেব না। আমি পেটুকের মতো বাঁচব। খাব, পরব, সংসার করব—আমার ছেলেপুলে হবে, সংসার হবে, স্বামী থাকবে। সেই সংসারের গণ্ডির মধ্যেই আমি নিজেকে আটকে রাখব। কখনো বাইরে পা বাড়াব না।

তায়েবার এ সমস্ত কথা আমার ভালো লাগছিল না। বরাবরই জেনে এসেছি, সে বড় শক্ত মেয়ে। কখনো তাকে এরকম দেখিনি। এ কোন তায়েবার সঙ্গে কথা বলছি ? জোর দিয়ে বলতে চাইলাম, তায়েবা এখনো সামনে তোমার ঢের জীবন পড়ে আছে, যেভাবে ইচ্ছে কাটাতে পারবে। কিন্তু আমার নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর বিদ্রূপের মতো শোনাল। তায়েবা বলল, না দানিয়েল ভাই আপনাকে নিয়ে

আর পারা গেল না। আপনি দেখতে মিনমিনে হলে কী হবে বড়বেশি একরোখা এবং গোঁয়ার। নিজে যা সত্য মনে করেন, সকলের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। সে জন্যই ভয় হয়, আমার মতো আপনার কপালেও অনেক দুঃখ আছে। আমার শরীরের খবর আমার চাইতে কি আপনি বেশি জানেন ? আমি জানতে চাইলাম—আচ্ছা তায়েবা, তোমার অসুখটা কী ? তায়েবা এবার ফোঁস করে উঠল। কখনো জানতে চেয়েছেন আমার অসুখটা কী ? আর অসুখের ধরন জেনে লাভ নেই, অসুখ অসুখই। তবু একটা ডাক্তারি নাম তো আছে। সেটা আমাকে বিরক্ত না করে ডা. মাইতির কাছে জিগগেস করুন না কেন। বললাম, ডা. মাইতির কাছে গতকাল আমি জানতে চেয়েছিলাম, তোমার কী অসুখ। উল্টো তিনি আমাকেই প্রশ্ন করলেন, আমি জানি নাকি তোমার কী অসুখ। সেটা আপনি ডা. মাইতির সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। বিরক্ত হয়ে তায়েবা বিছানার উপর শরীরটা ছেড়ে দিল।

ডা. মাইতি আবার কী করল হে ? হাতে স্টেথেসকোপ দোলাতে দোলাতে ডা. মাইতি কেবিনে প্রবেশ করলেন। দানিয়েল সাহেব হাতখানা একটু বাড়িয়ে দিন, হ্যান্ডশেক করি। এই ঘোরতর বিষ্টির মধ্যে চলে আসতে পেরেছেন। বা সোজা মানুষ তো নয়। বোঝা গেল চরিত্রের মধ্যে স্টার্লিং কোয়ালিটি আছে। হ্যান্ডশেকের পর বললাম, আপনার রোগীর কি অনিষ্ট করলাম ? নিশ্চয়ই, তা হলে ধরে নিচ্ছি আপনি গতকালের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। আমি হাসলাম। তারপর তায়েবার দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, গিলেছ না এখনো বাকি আছে। মাইতিদা ভাতের কথা তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। এতক্ষণ দানিয়েল ভাইতে আমাতে ঝগড়া চলছিল। ডা. মাইতি বললেন, ঝগড়ার বিষয়বস্তু কী আগে বলো। তায়েবা বলল, মাইতিদা আপনি যেন কেমন, ঝগড়া করতে আবার বিষয়বস্তুর দরকার হয় নাকি। যে ঝগড়ার বিষয়বস্তু নেই, তা আমি শুনব না। ওসব কথা এখন রাখো। ওয়ার্ডে ডা. ভট্টাচার্যির পা দেয়ার আগে তোমার বায়না করে আনা ওই ভাত-মাছ তাড়াতাড়ি গিলে ফেলো। উনি এসে পড়লে একটা অনর্থ বাধাবেন। হঠাৎ আমার পরিধেয় বস্ত্র দেখে ডা. মাইতির চোখজোড়া কৌতুকে ঝিকমিকিয়ে উঠল। বাহ্ ! দানিয়েল সাহেব দেখছি আপনার উন্নতি ঘটে গেছে। আমি একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম, আমি সেই বৌবাজার থেকে এক-কোমর পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছি তো। তিনি জিগগেস করলেন, এই ঘোলাজলের সবটুকু পথ কি আপনি নিজের পায়ে হেঁটে এসেছেন ? আমি মাথা দোলালাম। এখানে এসে দেখি প্যান্টটা ময়লায় ভরে গেছে, আর পা থেকে জুতো নামাতেই সোলদুটো খসে পড়ল। তায়েবা টাকা দিয়ে হাসপাতালের গোবিন্দকে পাঠিয়ে এই ধুতি আর স্যান্ডেলজোড়া কিনে এনেছে। তা হলে দিদিমণির দানদক্ষিণে করারও অভ্যেস আছে। বাহ্ ! বেশ বেশ। তাঁর কথাতে কেমন জানি লজ্জা পাচ্ছিলাম। এই লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই বলে বসলাম, ধুতি প্যাঁচগোচ দিয়ে পরতে জানিনে। তাই দু-ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো করে পরেছি। ঠিক

আছে বেশ করেছেন, আজ হাসপাতাল থেকে যাওয়ার পথে আমার বাসা হয়ে যাবেন, আপনাকে ধুতি পরা শিখিয়ে দেব। এ সুযোগে আপনার সঙ্গে একটু গপ্পো-টপ্পোও করা যাবে। এ্যাঁ কী বলেন। বললাম, আমি তো আপানার কোয়ার্টার চিনিনে, কী করে যাব। আরে মশায়, অত উতলা হচ্ছেন কেন, একটু ধৈর্য ধরুন প্রথমে আমি চিনিয়ে দেব। তারপর তো আপনি যাবেন। ওই যে হাসপাতালের গেট। তার অপজিটে লাল দালানগুলো দেখছেন তার একটার দোতালাতে আমি থাকি। নাম্বারটা মনে রাখবেন একুশের বি। এদিকে ওদিকে না তাকিয়ে সোজা দোতলায় উঠে বেল টিপবেন। আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব। কী চিনতে পারবেন তো ? আমি বললাম, মনে হচ্ছে পারব। মনে হচ্ছে কেন ? আপনাকে পারতেই হবে। এটুকুও যদি না পারেন, কর্পোরেশনের লোকজনদের লিখব, যেন আপনাকে শহর থেকে বের করে দেয়।

ডা. মাইতি তায়েবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি খেতে আরম্ভ করো। আমি ওই দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। ডা. ভট্টাচার্যি যদি এসে পড়েন, আমি হাততালি দেব। তুমি অমনি সব লুকিয়ে ফেলে বাথরুমে ঢুকে পড়বে। একেবারে হাতমুখ ধুয়েই তাঁর সামনে আসবে। দানিয়েল সাহেব যান, জলটল দিয়ে সাহায্য করুন। আমি একটা প্লেট ধুয়ে এনে দিলে তায়েবা মিটসেফ থেকে ব্যাগটা বের করল, তারপর বাটিটা টেনে নিল। ভাতগুলো প্লেটে নিয়ে অন্য বাটিটা থেকে কিছুটা মাছের তরকারি ঢেলে নিল। তার মুখে একটা খুশিখুশি ভাব। জানেন দানিয়েল ভাই, কতদিন পরে আজ মাছ-ভাত মুখে দিচ্ছি। বললাম, গতকাল বলেছিলে এক মাস। হ্যাঁ সেরকম হবে। একগ্রাস ভাত মুখে তুলে নিল। তারপর আরেক গ্রাস। অমনি করে আরো কটা গ্রাস মুখে দিয়ে সে প্লেটের ওপর হাতখানা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আমি বললাম, চুপ করে অমন হাত ঠেকিয়ে আছ, খাচ্ছো না কেন ? না খাব না, এ খাবার কি মানুষে খায় ? কী রকম বিচ্ছিরি রান্না, মুখটা তেতো হয়ে গেল। আহ্ মাইতিদা। ডাক্তার কেবিনের ভেতরে ঢুকলেন, কী হল তায়েবা, ভাত খেতে চাইছিলে খাও। খেতে যে পারছিনে, সব তেতো লাগে যে। তার আমি কী করব। তেল মশলা ছাড়া শুধু হলুদ জিরের রান্না আপনি খেতে পারবেন, দানিয়েল ভাই। মাছগুলো লবণ মরিচ দিয়ে ভাজা করে আনতে পারলেন না। আপনি কিছুই বোঝেন না। আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, কাল মাছ ভেজে এনে দেবো। হ্যাঁ তাই দেবেন। তায়েবা হাত ধুয়ে ফেলল। ডা. মাইতি বললেন, আপনার ভাত-মাছ বিজনেস এখানেই শেষ। তার পরেও এসকল জিনিস এ কেবিনে যদি আবার আসে, তা হলে আপনার হাসপাতালে আসাটাই বন্ধ করতে হয়। তায়েবা চুপচাপ রইল। আমার ধারণা ডা. মাইতির ব্যবস্থাটি মেনে নিয়েছে। ডা. মাইতি আমাকে বললেন, এক কাজ করুন, এই ভাত মাছ যা আছে সব বাটির ভেতর ভরে ওধারের ডাস্টবিনটায় ফেলে দিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি। আমি বাক্য ব্যয় না করে তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। বাটি প্লেট সব ধুয়ে নেয়ার পর ডা. মাইতি বললেন, এবার আমি

চলি দানিয়েল সাহেব, মনে থাকে যেন সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার সময়। আমি বললাম, থাকবে। উনি চলে গেলেন।

আমি তায়েবাকে জানালাম, ডা. মাইতি সাতটা সাড়ে সাতটার সময় আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে যেতে বলেছেন। যাব ? অবশ্যই যাবেন। তিনি আর দীপেনদা আমার জন্য যা করেছেন দেশের মানুষ আত্মীয়স্বজন তার এক ছটাক, এক কাচ্চাও করেনি। আমি জানতে চাইলাম, দীপেন্দ্রনাথ লোকটি কে ? তায়েবা বলল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই তো আমাকে চেষ্টা তদবির করে এ হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। আপনি চিনবেন কেমন করে। আর আপনারা সব নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আমি মারা গেলাম, বেঁচে রইলাম, তাতে কার কী এসে যায়। আমি জবাব দিলাম না। তায়েবার অনেক রাগ, অনেক অভিমান। তাকে ঘাটিয়ে লাভ নেই। অনাবশ্যক রাগারাগি করে অসুখটা বাড়িয়ে তুলবে। এখন তো প্রায় ছ'টা বাজে। তোমার ডাক্তার আসার সময় হয়েছে। আজ আমি আসি। আবার আসবেন। আমি বললাম, আসব। প্যান্ট আর বাটিসহ ব্যাগটা নিয়ে যাই। প্যান্ট নিয়ে এখন আর কাজ নেই নতুন একটা বাসায় যাচ্ছেন। আমি গোবিন্দদাকে দিয়ে কাল লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেব। এক কাজ করুন। ব্যাগ বাটি এসবও রেখে যান বরং কাল এসে নিয়ে যাবেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখলাম মাত্র সোয়া ছ'টা। ডা. মাইতির কোয়ার্টারে সাত থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে যে-কোনো সময়ে গেলে চলবে। আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। সেই আড়াইটার সময় বেরিয়ে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। তারপর এতক্ষণ সময় কাটালাম। পেটে কিছু পড়েনি। সারাটা সময় একরকম ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলেই ছিলাম। একটা খাবার দোকান তালাশ করতে লাগলাম। এদিকে দোকানপাটের সংখ্যা তেমন ঘন নয়। তাই বাঁক ঘুরে ভবানীপুর রোডে চলে এলাম। একটা সুবিধেজনক খাবার ঘরের সন্ধান করতে হাজরা রোডের দিকে ধাওয়া করলাম। যে দোকানেই যাই, প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে আমার কেমন জানি প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত আমি পথ হাঁটছি। অবশ্য বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না। অনেক আগেই বিষ্টি ধরে গেছে। এদিকটাতে রাস্তাঘাটের অবস্থা একেবারে খটখটে শুকনো। কলকাতার টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা জ্বলছে। দু পাশের দোকানপাটে ধুমধাম কেনাবেচা চলছে। ঢ্যাকর ঢ্যাকর করে ট্রাম ছুটছে। বাস, লরি, ট্রাক, কার এসব যন্ত্রযানের বাঁশি অনাদ্যন্ত রবে বেজে যাচ্ছে। মানুষের স্রোত তো আছেই। তারা যেন অনাদিকাল থেকেই শহর কলকাতার ফুটপাতের ওপর দিয়ে উজান ভাটি দুই পথে ক্রমাগত প্রবাহিত হচ্ছে। মোড়ের একটা স্যান্ডউইচের দোকানে গিয়ে দু খানা প্যাটিস আর ঢক ঢক করে পানি খেয়ে নিয়ে ডা. মাইতির কোয়ার্টারের উদ্দেশে হাঁটতে লাগলাম। কোনদিকে যাচ্ছি খেয়াল নেই। শুধু পা দুটো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা আসার পর থেকে আমার পা দুটোর চোখ ফুটে গেছে।

সাতটার ওপরে বোধ করি কয়েক মিনিট হবে। আমি ডা. মাইতির কোয়ার্টারে এসে বেল টিপলাম। একটি ছোকরা চাকর দরোজা খুলে দিয়ে জানতে চাইল, 'কাকে চান।' আমি জানতে চাইলাম ডা. মাইতি আছেন? আছেন, আপনি ভেতরে বসুন। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে একটা বেতের সোফায় বসে সিগারেট জ্বালালাম। বসবার ঘরের আসবাবপত্তরের তেমন বাহুল্য নেই। কয়েকখানি বেতের সোফা এবং মধ্যখানে একটি বেতের টেবিল। টেবিলের ওপর পাতা চাদরটি খুবই সুন্দর এবং একই ধরনের চাদর খাটের ওপরও পাতা দেখলাম। ওপাশে পুরোনো একটি ক্যাম্পখাট দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে। দেয়ালে একজোড়া বুড়োবুড়ির ছবি টাঙানো। চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, ডা. মাইতির মা বাবা। তা ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় আকারের ছবি। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ওষুধ কোম্পানির দুটো ক্যালেন্ডার উত্তর-দক্ষিণের দুটি দেয়ালে পরস্পরের দিকে মুখ করে ঝুলছে। এ ছাড়া এনলার্জ করা একটি গ্রুপ ফটো আছে। গাউন পরা একদল যুবকের ছবি। একটুখানি চিন্তা করলেই মনে পড়ে যাবে মেডিক্যাল কলেজের সার্টিফিকেট গ্রহণ করার সময় এই ছবিখানি ওঠানো হয়েছিল। একেবারে কোনার দিকে হাতঅলা একটি চেয়ার এবং সামনে একটি টেবিল।

ডা. মাইতি জিগগেস করলেন, চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? আমি বললাম, না। তিনি ডাক দিলেন, অনাথ। আবার সে ছেলেটি এসে দাঁড়ালে বললেন, চা দাও। আর শোনো এই বাবু আমাদের সঙ্গে খাবেন এবং রাত্তিরে থাকবেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কৌতুকমিশ্রিত স্বরে বললেন, দেখলেন তো কেমন বাড়িতে এনে গ্রেপ্তার করে ফেললাম। সহসা আমার মুখে কোনো উত্তর জোগাল না। তিনি ফের জিগগেস করলেন, আপনার কি তেমন জরুরি কাজ আছে। আজ রাত্তিরে এখানে থাকলে কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে কি? জবাব দিলাম, না তেমন কোনো কাজ নেই। আপনার কি আজ রাতটা আমার সঙ্গে গল্প করে কাটাতে আপত্তি আছে? বা রে আপত্তি থাকবে কেন, এখন আমাদের যে অবস্থা, কে আবার আমার খবর নেবে। দানিয়েল সাহেব এভাবে কথা বলবেন না। মনে রাখবেন, আপনারা একটি মুক্তিসংগ্রাম করছেন। আমি ডাক্তারমানুষ অধিক খোঁজখবর রাখতে পারিনে। তায়েবাকে দেখতে হাসপাতালে যে সব ছেলে আসে, তাদের অনেকের মধ্যেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং অদম্য মনোবল লক্ষ করেছি। আপনাদের গোটা জাতি যে ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। মানুষের সব চাইতে মহত্তম সম্পদ তার চরিত্র, সে বস্তু আপনার দেশের অনেক যুবকের মধ্যে আমি বিকশিত অবস্থায় দেখেছি। কোনো কোনো সময়ে আপনাদের প্রতি এমন একটা আকর্ষণ অনুভব করি, ভুলে যাই যে, আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। আমি কখনো বাংলাদেশে যাব না। পুরুষানুক্রমে আমরা পশ্চিমবাংলার অধিবাসী। পদ্মার সে পাড়ের মানুষের সঙ্গে

আমাদের সম্পর্ক কখনো ছিল না। কিন্তু আপনার দেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে আমার নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন অনুভব করছি। একদিনে কিন্তু সে পরিবর্তন আসেনি। ক্রমাগত মনে হচ্ছে আমি নিজেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটা অংশ। এখন আমার ভারতীয়সত্তা এবং বাঙালিসত্তা পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন বাঙালি বলে ভাবতে আমার খুব অহঙ্কার হয়। আপনার দেশ যুদ্ধে না নামলে আমার এ উপলব্ধি জন্মাত কি না সন্দেহ। কথাগুলো লিটারেল অর্থে ধরে নেবেন না, এটা জাস্ট একটা ফিলিংয়ের ব্যাপার।

আমি বললাম, বাংলা এবং বাঙালিত্বের প্রতি পশ্চিমবাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের অতুলনীয় সহানুভূতি এবং জাগ্রত মমত্ববোধ আছে বলেই এখনো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শিরদাঁড়া উঁচু করে থাকতে পেরেছে। পশ্চিমবাংলার বদলে যদি গুজরাট কিংবা পাঞ্জাবে বাংলাদেশের জনগণকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হত, ভারত সরকার যত সাহায্যই করুক না কেন, আমাদের সংগ্রামের অবস্থা এখন যা তার চাইতে অনেক খারাপ হত। পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রাণের আবেগ, উত্তাপ এবং ভালোবাসা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে প্রাণবন্ত এবং সজীব রেখেছে। ছেলেটা চা দিয়ে গেল। আপনার কাপে ক-চামচ চিনি এবং কতটুকু দুধ দেব বলুন। বললাম, দুধ আমি খাইনে ! দু কি আড়াই চামচ চিনি দেবেন। হো হো করে হেসে উঠলেন ডা. মাইতি। একটা বিষয়ে দেখছি আপনার সঙ্গে আমার চমৎকার মিল আছে। আমিও চায়ের সঙ্গে দুধ খাইনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আমি মূর্খ মানুষ। প্রোফেশনের বাইরে গেলেই নাচার হয়ে পড়ি। আপনার মতো একজন স্কলার মানুষের সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব, মশায় সাবজেক্ট খুঁজে পাচ্ছিনে। আবার সেই হো হো হাসি। আমি বললাম, আপনিও তা হলে তায়েবার কথা বিশ্বাস করে আছেন। এস.এস.সি থেকে এম. এ. পর্যন্ত সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছি। এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই কিন্তু। জীবনে কোনো পরীক্ষায় কখনো বিশের মধ্যে থাকার ভাগ্যও আমার হয়নি। তায়েবা যাদেরকে চেনে জানে, একটুখানি খাতির করে তাদের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলে, এটাই তার স্বভাব। আমার ব্যাপারে এই পক্ষপাতটুকু এতদূর মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে আমার নিজের কান পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল। এ নিয়ে তার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। ডা. মাইতি বললেন, আপনার ব্যাপারে তার একটা লাগামছাড়া উচ্ছ্বাস এরই মধ্যে আমি লক্ষ করেছি। আপনাকে স্কলার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, আপনি বিষ্টিতে কাপড় জামা ভিজিয়ে এলে বাজার থেকে লোক পাঠিয়ে নতুন কাপড়-জামা কিনে আনে। এগুলো কি একজন রোগীর পক্ষে বাড়াবাড়ি নয় ? আসলে আপনাদের সম্পর্কটা কীরকম। আপনি যদি জবাব না দেন আমি অবাক হব না।

বললাম, ডা. মাইতি জবাব দেব না কেন ? লোকে তো বন্ধুজনের কাছেই প্রাণের গভীর কথা প্রকাশ করে। আপনাকে আমি একজন বন্ধুই মনে করি। তায়েবার সঙ্গে

আমার সম্পর্কের ধরনটা কী, নিজেও আমি ভালো করে নির্ণয় করতে পারিনি। আমার ধারণা সে আমাকে করুণা করে। এই যুদ্ধটা না বাধলে, বিশেষ করে বলতে গেলে এই অসুখটা না হলে তার সঙ্গে আমার দেখা হত কি না সন্দেহ। সে তার পার্টির কাজকর্ম নিয়ে থাকত। আমি আমার কাজ করতাম। তিনি ফের জানতে চাইলেন, আপনাদের মধ্যে একটা হৃদয়গত সম্পর্ক আছে এবং সেটা গভীর, একথা কি আপনি অস্বীকার করবেন? ডা. মাইতি, ও বিষয়টা নিয়ে আমি নিজেও অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু কোনো কূলকিনারা পাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছে, না কিছুই নেই। সকালবেলার শিশিরলাগা মাকড়সার জাল যেমন বেলা বাড়লে অদৃশ্য হয়ে যায়, এও অনেকটা সেরকম। সে তার পার্টি ছাড়তে পারবে না। কেননা তার অস্তিত্বের সবটাই তার পার্টির মধ্যে প্রোথিত। আর আমার চরিত্র এমন, কোনো বিশেষ পার্টির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো মোটেই উপযুক্ত নয়। এতসব গোঁজামিলের মধ্যে হৃদয়গত একটা সম্পর্ক কেমন করে টিকে থাকতে পারে, আমার তো বোধগম্য নয় ডা. মাইতি। ডাক্তার হাততালি দিয়ে উঠলেন, এই খানেই তো মজা। মানুষ ভয়ানক জটিল যন্ত্র। তার হৃদয় ততোধিক জটিল। অত সহজে কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। আচ্ছা দানিয়েল সাহেব, আপনি কি রাজনীতি করেন? বললাম, মানুষ সব সময়ে তো একটা না একটা রাজনীতি করে আসছে। আমি তা এড়াব কেমন করে? কিন্তু আমি কোনো পার্টির মেম্বার নই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ যদি আমার যথাসর্বস্ব দাবি করে, না দিয়ে কি পারব? আমি সহজ মানুষ, অত ঘোর-প্যাঁচ বুঝিনে।

ডা. মাইতি টেবিলে একটা টোকা দিয়ে বললেন, এমনিতে আমি সিগারেট খাইনে। কিন্তু আপনার কথা শুনে একটা সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে। একটা চারমিনার জ্বালিয়ে টান দিয়ে খকখক করে কেশে ফেললেন। মশায়, বললেন তো খুব সহজ মানুষ। আসলে আপনি জটিল এবং দুর্বোধ্য মানুষ। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। হয়তো তাই, সব মানুষই একটা না একটা দিকে দুর্বোধ্য, আমরা খেয়াল করিনে। আরে মশায় ওসব গভীর কথা এখন তুলে রাখুন। আপনাকে একটা সিম্পল প্রশ্ন জিগগেস করি, ইচ্ছে করলে আপনি জবাব নাও দিতে পারেন। আমি বললাম, নিশ্চয়ই জবাব দেব, বলুন আপনার প্রশ্নটা। ডা. মাইতি স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, তায়েবার সঙ্গে পরিচয়ের পর অন্য কোনো নারীকে কি আপনি ভালোবেসেছেন? আমি বললাম, না তা হয়নি। কেন বলুন তো। হয়তো পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি বলেই। অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা কখনো আপনার মনে এসেছে? না, তাও আসেনি। আচ্ছা মেনে নিলাম, অন্য কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ার কথা চিন্তা করতে পারেননি। অন্তত বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে কখনো সিরিয়স হতে চেষ্টা করেছেন কি? আমি বকলাম, তাও করিনি। আত্মীয়স্বজন বার বার চাপ দিয়েছে বটে, কিন্তু আমি, বারবার এড়িয়ে গেছি। ধরে নিন, এটা এক ধরনের আলসেমি। আপনি একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক মানুষ। আপনার কোনো খারাপ অসুখ-টসুখ নেই তো? কিছু মনে

করবেন না। আমি একজন ডাক্তার। ডাক্তারের মতো প্রশ্ন করছি। আমি বললাম, শরীরের ভেতরের ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে তো স্থির নিশ্চিত হয়ে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই। এমনিতে তো কোনো রোগ-টোগ আছে বলে মনে হয় না।

ডা. মাইতি বললেন, এবার আমার কথা বলি। দয়া করে একটু শুনবেন কি ? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আপনি বলুন। তা হলে শুনুন, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ। তায়েবার প্রতি আপনার মনের অবচেতনে গভীর ভালোবাসা রয়েছে বলে অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসা বা বিয়ে করার কথা আপনি চিন্তাও করতে পারেননি। তার দিক থেকে হোক, আপনার দিক থেকে হোক বাস্তব অসুবিধে ছিল অনেক, যেগুলো ডিঙোবার কথা ভারতেও পারেননি। আমি বললাম, নদীতে বাঁধ দেয়ার কথা বলা যায়, কেননা নদীতে বাঁধ দেয়া সম্ভব। কিন্তু সমুদ্রবন্ধন করার কথা কেউ বলে না, কেননা তা অসম্ভব। আমার আর তায়েবার ব্যাপারটিও অনেকটা তাই।

ডা. মাইতি বললেন, তায়েবা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে প্রায় এক মাস হয়। আপনি তো মাত্র গতকাল থেকেই দর্শন দিচ্ছেন। এই এক মাসে তার সম্পর্কে ডাক্তার হিসেবে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ধরে বসলেন, বাংলাদেশের একজন রোগীকে ভর্তি করতেই হবে। ডা. ভট্টাচার্যি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। কারণ, হাসপাতালে খালি বেড ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধেই তিনি রাজি হলেন। মেয়েটাকে প্রথম থেকেই দেখে আমার কেমন জানি অন্যরকম মনে হয়েছিল। একমাস খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু এ সময়ের মধ্যে তাকে নানাভাবে জানার সুযোগ আমার হয়েছে। সত্যি বলতে কি এরকম স্বার্থবোধবর্জিত মেয়ে জীবনে আমি একটিও দেখিনি। আমি বললাম, আমিও দেখিনি। এ ব্যাপারেও দেখছি আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের কোনো গরমিল নেই। সে যাক, শুনুন। তায়েবাকে দেখতে হাসপাতালে নানারকমের মানুষ আসে। তার যত কমপ্লেনই থাকুক, সকলের সঙ্গে যথাসম্ভব প্রাণখোলা কথাবার্তা বলে, হাসি-ঠাট্টা করে। কখনো কারো কাছ থেকে কিছু দাবি করতে দেখিনি। দেখলাম, একমাত্র আপনার কাছেই তার দাবি। আপনাকেই ভাত-মাছ রান্না করে আনতে বলল। আপনার কথা প্রায় প্রতিদিন আমাকে বলেছে। তবু আপনি যখন এলেন, দেখলাম আপনার সঙ্গেই ঝগড়া করছে। যদি আমি ধরে নেই যে তায়েবা আপনাকে ভালোবাসে তাহলে কি আমি অন্যায় করব ? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তারপর হাসতে চেষ্টা করলাম। হয়তো, হবেও বা। ধন্যবাদ, ফুল চন্দন পড়ুক আপনার মুখে ডা. মাইতি। আপনি মশায় চমৎকার কথা বলতে জানেন। কথার মারপ্যাঁচে ফসকে যাবেন তেমন সুযোগ আপনাকে দিচ্ছিনে। আপনি কি ভেবেছেন শুধুশুধুই আপনাকে বাড়িতে ডেকে এনেছি ? আপনার সঙ্গে আমার মস্ত দরকার। যাক ডা. মাইতি, আপনি আমার নিজের মূল্যটা আমার কাছে অনেকগুণে বাড়িয়ে দিলেন। এই কলকাতা আসা অবধি কেউ আমাকে বলেনি, আমার সঙ্গে কারো দরকার আছে। নিজের দরকারেই সকলের কাছে সকাল-সন্ধে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা

বলুন আপনার দরকারটা কী ? শুনে হৃদয় ঠাণ্ডা করি। মশায় অত রাগ কেন ? শুনবেন, শুনবেন অত তাড়াহুড়ো কিসের ? আগে রাতের খাবারটা খান। এখন তো সবে নটা বাজে। তারপর ডাক দিলেন, অনাথ। সে ছেলেটি এসে দাঁড়াল। খাবার হয়েছে রে ? বাবু ডালটা এখনো নামানো হয়নি। যা তাড়াতাড়ি কর।

আমি জিগগেস করলাম, ডা. মাইতি আপনি কোয়ার্টারে একাই থাকেন ? একা মানুষ, একাই তো থাকব। আপনি বিয়ে করেননি না মশায়, সে ফাঁদে আজও পা দেইনি। আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন ? ভালোবাসা-টাসা আমাকে দিয়ে পোষাবে না। হঠাৎ করে কাউকে বিয়ে করেই বসব। এখনো করেননি কেন ? প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ হল, এখনো সবগুলো বোনের বিয়ে দেয়া হয়নি। মশায়, আপনি আর কোনোকিছু জিগগেস করবেন না। আপনাকে আমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য নেমন্তন্ন করে এনেছি। আপনি যদি আমার কথা শুনতে চান, ডাকবেন, যেয়ে সব কথা বলে আসব। আমি বললাম, ডা. মাইতি আমাদের থাকার কোনো স্থির ঠিকানা নেই। কোথায় আপনাকে ডাকব ? তিনি বললেন, যখন আপনার দেশ স্বাধীন হবে, তখন ডাকবেন। আমার যত কথা সব জানিয়ে আসব, আর আপনার দেশটাও দেখে আসব। আচ্ছা, বাই দ্যা বাই, তায়েবার ভাই বোন মা—উনারা কোথায় আছেন বলতে পারেন ? আমি বললাম, তার ইমিডিয়েট একটা ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল, সেটি ছাড়া আর মোটামুটি সকলের সংবাদ পেয়েছি। তায়েবার ছোট ভাইটি ঢাকায়। বড় ভাই দিনাজপুরে ছিলেন শুনেছি। সেখান থেকে শুনেছি সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। আর ওরা তো তিন বোন কলকাতায় এসেছে। এক বোন ব্যারাকপুর না কোথায় দেশের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ট্রেনিং নিচ্ছে। একেবারে ছোট্টটি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেছে। কী নাম বলুন তো দানিয়েল সাহেব, আই থিঙ্ক আই নো হার। আমি বললাম, ডোরা। ডোরা তো একজন বুড়োমতো ভদ্রলোককে নিয়ে মাঝে মাঝে হাসপাতালে তায়েবাকে দেখতে আসে। হঠাৎ করে আমি মেজাজ সংযত রাখতে পারলাম না। তাহলে ডোরাসহ ভদ্রলোক এখনো তায়েবার কাছে আসতে সাহস করেন ? একটুখানি চোখলজ্জাও নেই। আরে মশায়, আপনি ক্ষেপে গেলেন যে ! আগে কী ব্যাপার বলবেন তো। আমি বললাম, ওই যে বয়স্ক ভদ্রলোক দেখেছেন তিনি ডোরাকে বিয়ে করে ফেলেছেন। ঢাকাতে ওই ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন তায়েবাদের অভিভাবক। মহিলা শশীকান্ত নামে তাঁর মেয়ের এক গৃহশিক্ষককে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ললিতকলার চর্চা করতে গেছেন। আর এদিকে ইনি পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ডোরাকে বিয়ে করে বসে আছেন। আমার বিশ্বাস তায়েবার অসুখ বেড়ে যাওয়ার এটাই একমাত্র কারণ। তা ছাড়া আমি আরো শুনেছি, শুধু মুখের অন্ন জোটাবার জন্যে তায়েবাকে অসুস্থ শরীর নিয়ে দিনে তিনটে করে ট্যুইশনি করতে হয়েছে। এই মানুষেরা সে সময় কোথায় ছিলেন ? তায়েবার কী অসুখ আমি সঠিক বলতে পারব না, তবে একথা সঠিক বলতে পারি অমানুষিক পরিশ্রম না করলে এবং ডোরা এই কাণ্ডটি না ঘটালে তার আজ এ অবস্থা হত না।

এই লোকগুলোর নিষ্ঠুরতার কথা যখন ভাবি মাথায় খুন চেপে যায়। অথচ এরাই ঢাকাতে আমাদের কাছে আদর্শের কথা প্রচার করত। আপনি অনেক আনকোরা তরুণের মধ্যে জীবনের মহত্তম সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে উঠতে দেখেছেন, একথা যেমন সত্যি, তেমনি পাশাপাশি একথাও সত্যি যে যুদ্ধের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের খোলস ফেটে খানখান হয়ে পড়ছে এবং আমরা এতকালের ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ছাগলদের চেহারা আপন স্বরূপে দেখতে পাচ্ছি। শরণার্থী শিবিরগুলোতে আমাদের মানুষদের দুর্দশার সীমা নেই। ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে আমাদের তরুণ ছেলেরা হাজার রকমের অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের ভেতরের কথা নাহয় বাদই দিলাম। এখানে কলকাতায় সাদা কাপড়চোপড় পরা ভদ্রলোকদের মধ্যে স্খলন, পতন যত রকমের নৈতিক অধঃপতন আছে, তার সবগুলোর প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এখানে যত্রতত্র শুনতে পাচ্ছি, বুড়ো, আধবুড়ো মানুষেরা যত্রতত্র বিয়ে করে বেড়াচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা আমাদের জানা আছে। মাঝে মাঝে এই ভদ্রলোকদের, তার তুলনায় কম নিষ্ঠুর মনে হয় না। আমি নিশ্চিত বলতে পারি. তায়েবার সঙ্গে এরা কসাইয়ের মতো ব্যবহার করেছে। আমি জানি সে আমাকে কোনোদিন সেসব কথা জানতে দেবে না। এমনকি হাজার অনুরোধ করলেও না। আর আমিও জিগগেস করব না। তবে একথা সত্যি যে তায়েবা যদি মারা যায়, সেজন্য এরাই দায়ী। কিন্তু দুনিয়ার কোনো আদালতে সে মামলার বিচার হবে না।

ডা. মাইতি চাপা নিশ্বাস ফেললেন। আপনার অনুমান অনেকটা সত্যি। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং টেনশনই তার অসুখটার বাড়াবাড়ির কারণ। যাকগে যা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে তার ওপর তো আপনার কোনো হাত নেই। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে তায়েবাকে নিয়ে। তার জন্য আপনি কী করতে পারেন ? আমি বললাম, মাইতিদা নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কীরকম অসহায়। আজ রাতে যেখানে ঘুমোই, কাল রাতে সেখানে যেতে পারিনে। এখানে স্রোতের শ্যাওলার মতো আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। পঞ্চাশ পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাবার জন্যে ছয় সাত মাইল পথ হাঁটতে আমাদের বাধে না। আজ যদি চোখের সামনে তায়েবা মারাও যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য অবলোকন করা ছাড়া আমার করবার কী থাকবে ? তবে একটা দুঃখ থেকে যাবে। তায়েবা আপন চোখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারবে না। স্বাধীনতা-অন্ত প্রাণ ছিল তায়েবার। আলাপে আলোচনায় কথাবার্তায় দেখে থাকবেন, তার মনটি কী রকম কম্পাসের কাঁটার মতো স্বাধীনতার দিকে ঝুঁকে থাকে। ঊনিশশো উনসত্তুরের আয়ুববিরোধী আন্দোলনে তায়েবা নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল। আমার ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি সেটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সে দেখে যেতে পারবে না, এটাই আমার বুকে চিরদিনের জন্যে একটা আফসোসের বিষয় হয়ে থাকবে। আমি মিনতি করে জানতে চাইলাম, আচ্ছা মাইতিদা আপনি কি দয়া করে জানাবেন, তায়েবার অসুখটা কী ধরনের ? খুব কী সিরিয়াস ? তিনি বললেন, আমি তো

ভেবেছিলাম আপনি শক্ত মানুষ। এখন দেখছি মেয়েমানুষের চাইতে দুর্বল। আগে থেকে কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছেন। আচ্ছা ধরুন, তায়েবা মারা গেল। তখন আপনি কী করবেন ? আত্মহত্যা করবেন ? আমি জবাব দিলাম, তা করব না, কারণ সে বড় হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে কী করবেন ? বসে বসে কাঁদবেন ? আমি বললাম, তাও বোধ হয় সম্ভব হবে না। এইখানে এই কলকাতা শহরে বসে বসে কাঁদার অবকাশ কোথায় ? বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাঁদবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে। অনেকেই তাদের প্রিয়জন হারিয়েছে। আমিও না হয় তাদের একজন হয়ে যাব। আপনি তাহলে কিছুই করতে যাচ্ছেন না ? ডা. মাইতি ফের জানতে চাইলেন। আমি বললাম, কী করব, কী করতে পারি ? আপনার দিন কাটবে কেমন করে ? আমি বললাম, দিন তো একভাবে না একভাবে কেটে যাবে, শুধু মাঝে মাঝে বুকের এক পাশটা খালি মনে হবে। মশায় এতক্ষণে আপনি একটা কথার মতো কথা বলেছেন। অনিবার্যকে মেনে নিতেই হবে। এই কথাটা বলার জন্য আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে। এখন তায়েবার রোগ সম্বন্ধে আপনি জিগগেস করতে পারেন, আমি জবাব দিতে প্রস্তুত। আমি বললাম, বলুন। ডাক্তার ভাবলেশহীন কণ্ঠে জানালেন লিউক্যামিয়া। জিগগেস করলাম, ওটা কী ধরনের রোগ। তিনি বললেন, ক্যান্সারের একটা ভ্যারাইটি। জিগগেস করলাম, খুব কি কঠিন ব্যাধি। হ্যাঁ খুবই কঠিন। আমি বললাম, অন্তত যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তায়েবা বেঁচে থাকবে তো ? সে কথা আমি বলতে পারব না। আমি একজন জুনিয়র ডাক্তার। ডা. ভট্টাচর্যি তার টেস্টের রিপোর্ট বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছেন। জানেন তো সেখানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের একটা ওয়েল ইকুইপড্ সেন্টার আছে। সেখান থেকে অ্যাডভাইজ না আসা পর্যন্ত আমাদের বলার কিছু নেই। দিন একটা চারমিনার। আপনার সঙ্গে থাকলে আমাকেও চেইন স্মোকার হয়ে উঠতে হবে দেখছি। চলুন, খাবার দিয়েছে। কথায় কথায় অনেক রাত করে ফেললাম। আমি নীরবে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ডা. মাইতির কোয়ার্টারে আমার চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসেনি। সারারাত বিছানায় হাসফাঁস করেছি। কেমন জানি লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমার সামনে একটা দেয়াল আচানক মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার খুব গরম বোধ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মশারির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে টেবিলে রাখা বোতল থেকে ঢেলে ঢকঢক করে পানি খাচ্ছিলাম। আর একটার পর একটা সিগারেট টানছিলাম। দূরের রাস্তায় ধাবমান গাড়ির আওয়াজে আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল। কোথাও যেন কেউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

শেষরাতের দিকে একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। সেই ঘোরেই স্বপ্ন দেখলাম। আমার আব্বা এসেছেন। স্কুলহোস্টেলে থাকার সময়ে আমি যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে খেতাম, সে বাড়ির সামনে পথ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে শান্তিপুরের চিকন পাড়ের ধুতি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় ঝোলানো মক্কা শরিফ থেকে আনা ফুলকাটা চাদর। আর মাথায় কালো, থোবাযুক্ত চকচকে লাল সুলতানি

টুপি। আমি জিগগেস করলাম, আব্বা এত সুন্দর কাপড়চোপড় পরে আপনি কোথায় চলেছেন ? আমার প্রশ্নে তিনি খুবই অবাক হয়ে গেলেন। ব্যাটা তুমি জান না বুঝি, আজ তোমার বিয়ে। আমিও অবাক হলাম। কারণ আমি সত্যি সত্যি জানিনে। বাবা বললেন, কখনো কখনো এমন কাণ্ড ঘটে যায়। আমি বললাম, আব্বাজান আমার ঈদের চাপকান কই। অন্তত একখানা শাল এ উপলক্ষে আপনি তো আমাকে দেবেন। আব্বা সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ব্যাটা সাদা ধুতি পরো। আমি বিয়ের সময় সাদা ধুতি পরেই বিয়ে করেছিলাম। তোমার বড় ভাইকেও ধুতি পরিয়ে বিয়ে দিয়েছি। তিনি আমার হাতে একখানা ধুতি সমর্পণ করলেন। আমি বললাম, আব্বা আমি যে ধুতি পরতে জানিনে। ব্যাটা বেহুদা বকো না। পরিয়ে দেয়ার মানুষের কি অভাব ! যাও তাঞ্জামে ওঠো। আমি বললাম, এ শুভদিনে আপনি অন্তত একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করবেন না ? আব্বা বললেন, ব্যাটা মুরুব্বিদের সঙ্গে বেয়াদবি করা তোমার মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি। যাও তাঞ্জামে ওঠো। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোথাও তাঁকে দেখলাম না। তারপর দেখলাম চারজন মানুষ আমাকেই একটা খাটিয়ায় করে আমাদের গ্রামের পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাউকে আমি চিনিনে। লোকগুলো আমার খাটিয়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সুর করে বলছে, বলো মোমিন আল্লা বলো। তাদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রাস্তার লোকেরাও বলছে, আল্লা বলো। আমি মনে মনে বললাম এ কেমনধারা বিয়ে গো ! বাজি পোড়ে না, বাজনা বাজে না। অমনি পায়ের দিকে বহনকারী দুজন লোক কথা কয়ে উঠল। এই লাশটা পাথরের মতো ভারী। একে অমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। মাথার দিকের বাহক দুজন বলল, না না চলো। আর তো অল্প পথ। তোমরা যাও আমরা পারব না। তারা কাঁধ থেকে কাত করে আমাকে রাস্তার ওপর ঢেলে দিল। আমি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। তন্দ্রা টুটে গেল। হাঁটুতে প্রচণ্ড চোট লেগেছে। চোখ মেলে চাইলাম, আমি ফ্লোরের ওপর শুয়ে আছি আর শরীরে সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়েছি। কাচের জানালার শার্সি ভেদ করে শিশু-সূর্যের দুতিনটে রেখা ঘরের ভেতরে জ্বলছে। খুব পিপাসা বোধ করছিলাম। আবার খাটে ওঠার কোনো প্রবৃত্তি হল না। তিন চার মিনিট তেমনি পড়ে রইলাম। চোখ বন্ধ করে তন্দ্রার মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে মনে মনে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

ডা. মাইতি আমার কাঁধ নাড়া দিয়ে বললেন, একী দানিয়েল সাহেব আপনি নিচে কেন ? আমি আস্তে আস্তে বললাম, স্বপ্নের ঘোরে খাট থেকে পড়ে গিয়েছি। বাঃ চমৎকার ! আপনার মনে এখনো স্বপ্ন আসে। সুতরাং দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। আশা করি দাড়ি কাটতে এবং স্নান করতে অমত করবেন না। আমি মৃদুস্বরে বললাম, না। তিনি বললেন, বাথরুমে শেভিং রেজার, সাবান ইত্যাদি দেয়া আছে। যান তাড়াতাড়ি যান, এখখুনি খাবার দেয়া হবে। বাথরুমে যেয়ে গালে সাবান ঘষতে ঘষতে দেখি থুতনির কাছে আট দশটা পাকা দাড়ি উঁকি দিচ্ছে। দু কানের

গোড়ায়ও অনেকগুলো বাঁকাচোরা রুপোলি রেখা। চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আহা আমার যৌবন শেষ হতে চলেছে। আমি বুড়োত্বের দিকে এগুচ্ছি। এতদিন চোখে পড়েনি কেন। এক মাসের মধ্যেই কি ম্যাজিকটা ঘটে গেল।

ডা. মাইতির সঙ্গে খাবার টেবিলে গেলাম। চুপচাপ লুচি, হালুয়া, ডিম এবং চা খেয়ে গেলাম। আমার কথাবার্তা বলার কোনো প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তিনিও বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর চোখে চোখ পড়ে যায়। মনে হল তিনি যেন কী একটা গভীর বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। ডা. মাইতির সঙ্গে আমার একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই এক রাতের মধ্যে তাতে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। আমার মনের এ রকম একটা অবস্থা, যা ঘটুক আমি কেয়ার করিনে। চারপাশের লোকজন এদের আমি চিনিনে, চিনতেও চাইনে। ডা. মাইতি আমাকে জিগগেস করলেন, সকালবেলা তায়েবাকে একবার দেখে যাবেন কি ? আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, চলুন। কোনো ব্যাপারে আর আমার উৎসাহ নেই। গতরাতে তায়েবা যদি ঘুমের মধ্যে মরেও গিয়ে থাকে, আমি যদি হাসপাতালে যেয়ে তার মরা শরীর দেখি, তবু কেঁদে বুক ভাসাব না। আমি কী করব, আমার করার কী আছে।

সে যাক, ডা. মাইতির পেছন পেছন আমি তায়েবার ওয়ার্ডে প্রবেশ করলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম। এই সাতসকালে জাহিদুল এবং ডোরা তায়েবার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য সময় হলে বোধ করি আমি নিজের মধ্যে হলেও প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে উঠতাম। আজকে সেরকম কোনো অনুভূতিই হল না। বরঞ্চ মনে হল, ওরা আসবে একথা আমার মনের অবচেতনে জানা ছিল। আমিও চুপচাপ তায়েবার মাথার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। এখনো মুখ ধোয়নি। ফ্যানের বাতাসে মাথার চুল উড়াউড়ি করছে। তার চোখেমুখে বেদনামথিত স্নিগ্ধ প্রশান্তির দীপ্তি। আমাকে দেখামাত্রই তার মুখে কথা ফুটল। এই যে দানিয়েল ভাই, আসুন। আপনি কি কাল মাইতিদার কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন ? নইলে এত সকালে আসব কেমন করে ? আমি মাথা নাড়লাম, তাই। নীরবে জাহিদুলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

জাহিদুলের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। তায়েবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই একটা জিনিস আমি লক্ষ করে আসছি। আমার প্রতি তাঁর এক ধরনের মজ্জাগত ক্রোধ রয়েছে। আমাকে আর তায়েবাকে পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখলে ভ্রূকুটি জোড়া মেলে ধরতেন। তিনি আমাদের পরিচয় আর মেলামেশা কখনো সহজভাবে নিতে পারেননি। এমনকি একাধিকবার মন্তব্য করেছেন, আমি ভীষণ নারীলোলুপ মানুষ। নানা গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁকে ভড়ংসর্বস্ব একটা ফাঁকা মানুষ জ্ঞান করে আসছি। আর সুযোগ পেলে কখনো ছেড়ে কথা বলিনি। আজকে তিনিও মৃদু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা

জানালেন। সবকিছুর এমন পরিবর্তন ঘটল কী করে ? সকলেই কি তায়েবার ভাবী পরিণতি সম্পর্কে জেনে গেছে ?

জাহিদুল সামনের দিকে ঝুঁকে একটা ব্যাটারিচালিত টেপরেকর্ডার বাজিয়ে তায়েবাকে কীসব গান শোনাচ্ছিলেন। আমার আচমকা উপস্থিতিতে সেটা অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। তায়েবা বলল, রিউইন্ড করে আবার প্রথম থেকে বাজান জাহিদ ভাই। দানিয়েল ভাইও শুনুক। আমাকে বলল, দানিয়েল ভাই শুনুন, ডোরা দিল্লিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি একক প্রোগ্রাম করেছে। গান বাজতে থাকল। দেয়ালে হেলান দিয়ে তায়েবা চোখ বন্ধ করে রইল। বাংলাদেশে থাকার সময়ে ডোরা রেডিও, টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গাইতো। যখন গান বাজত তখনো এমনি করে তায়েবা বিদ্যুৎ-বাহিত স্বরতরঙ্গের মধ্যে নিজের সমস্ত চেতনা বিলীন করে দিত। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।' ডোরার কণ্ঠ অত্যন্ত সুরেলা। তাতে যেন বিষাদের একটুখানি ছোঁয়া আছে। এই ছোঁয়াটুকুর স্পর্শেই সঙ্গীতের সুদূরের আহ্বানটি যেন প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। ডোরা জাহিদুলের কাছে গান শিখেছে। তাঁর সম্পর্কে যার যতই নালিশ থাকুক, কিন্তু একটি কথা সত্য, যাকে গান শেখান প্রাণমন দিয়ে শেখান। আবার বেজে উঠল 'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি, আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।' এমনি করে একঘণ্টার প্রোগ্রাম ক্যাসেটপ্লেয়ারে বাজতে থাকল। সবগুলো গান যেন তায়েবার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নির্বাচন করা হয়েছে। তা হলে ডোরাও কি জেনে গেছে অন্তিম পরিণতিতে তায়েবার কী ঘটতে যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটুখানি খুঁতখুঁতোনি অনুভব করছিলাম। তায়েবার সেই প্রিয় গান দুটো ডোরা বাদ দিয়েছে কেন ? 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' এবং 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।' সকলে সবদিক দিয়ে তায়েবাকে যেন অন্তিম যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে তুলছে। ডোরা যে পার্ক সার্কাসের বাসায় তায়েবাকে সংজ্ঞাহীন রেখে দিল্লিতে জাহিদুলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, তাও বোধকরি এ জমজমাট নাটকের শেষ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেই করা হয়েছিল।

ক্যাসেট শেষ হলে তায়েবা চোখ খুলল। তার ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। ডোরার গানের শেষে এমনি গর্বের হাসি তার চোখেমুখে খেলে যেতে পূর্বে আমি অনেকবার দেখেছি। তায়েবা খুব ক্ষীণ কণ্ঠে জিগগেস করল, লোকে কেমনভাবে নিয়েছে তোর গান ডুরি। বলাবাহুল্য তায়েবা ডোরাকে ডুরি নামেই ডাকে। এবার ডোরা মুখ খুলল। সে এক আজব ব্যাপার বাপ্পা। নানা জায়গা থেকে গান করার এত অফার আসতে লাগল যে গোটা মাসেই শেষ করা যেত না। ডোরা তায়েবাকে বাপ্পা বলেই ডাকে। কী কারণে বড়বোনকে বাপ্পা বলে সম্বোধন করে তার ইতিকথা আমি বলতে পারব না। তায়েবা বলল, কয়েকটা অনুষ্ঠান করে এলেই পারতিস। এত তাড়াতাড়ি কেন চলে এলি। দিল্লি কত বড় শহর, কত জ্ঞানীগুণীর ভিড়

সেখানে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি। ডোরা দু-হাতে তায়েবার গলা জড়িয়ে ধরল। বাপ্পা তোমার শরীরের ওই অবস্থায়, সে হু হু করে কেঁদে ফেলল। তায়েবা গভীর আগ্রহে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। আমার অসুখ তো লেগেই আছে, কিন্তু তোর সুযোগ তো আর প্রতিদিন আসবে না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জানেন দানিয়েল ভাই, কালকে আপনার যাওয়ার পর থেকে আমি সারারাত বমি করেছি। একবার তো বাথরুমে পা পিছলে পড়েই গিয়েছিলাম। ভাগ্য ভালো আয়াটা ছিল। নইলে সারারাত পড়ে থাকতে হত। তায়েবার কথা শুনে ডোরা আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। জাহিদুলের সে পুরোনো ভ্রূকুটি জোড়া জেগে উঠল। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, তার অর্থ করলে এ রকম দাঁড়ায় যে জানতাম, তুমি এলেই একটা অঘটন ঘটবে। তিনি তায়বাকে জিগগেস করলেন, কী হয়েছিল, বমি হয়েছিল কেন, কখন পড়ে গিয়েছিলে, কই কিছু তো বলনি। কিছু কুপথ্য মুখে দিয়েছিলে কি ? তায়েবা বলল, না না সেসব কিছুই না। সন্ধের পর থেকে আপনাআপনি বমি হতে শুরু করল। একসময় পা পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, আমার মনে হল, এ নাটকে যা ঘটবে সব দেখে যেতে হবে। পালন করার কোনো ভূমিকা থাকবে না। এমনকি একটা ফালতুরও নয়। অগত্যা আমি উঠে যেতে উদ্যত হলাম। তায়েবার দিকে তাকিয়ে বললাম, তা হলে এখন আসি। পরে নাহয় একবার আসব। না না দানিয়েল ভাই, যাবেন না। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বরঞ্চ ডোরা তোরা যা, প্রোগ্রাম শেষ হলে যাবার পথে খবর দিয়ে যাস। ডোরা এবং জাহিদুল চলে গেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের ডোরা খুব গুণী। এরই মধ্যে দিল্লিতে প্রোগ্রাম করে এল, আজ মহাজাতি সদনে গান গাইবে। আমার শরীরটা হয়েছে একটা মস্ত বড় বোঝা। নইলে আমিও গান শুনতে যেতাম। অনুষ্ঠানে গাইবার সময় ডোরার গান শুনেছি কতদিন হয়। মা শুনলে কী যে খুশি হবে। দানিয়েল ভাই, আপনি একটু উঠে দাঁড়ান। আপনার কাঁধে ভর দিয়ে আমি একটু বাথরুমে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নেব। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। আজ দশটায় আবার ডা. ভট্টাচার্যি এসে টেস্ট-ফেস্ট কী সব করবেন। আর সহ্য হয় না। আমি তাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। সে ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে মুখে সাবান ঘষল। তারপর মুখ ধুয়ে নিল। চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে চেষ্টা করল। তায়েবা বলল, আমার পা দুটো কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে। আমি বেসিনে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াব। আপনি আমাকে একটা টুল এনে দিবেন। আমি টুলটা এনে দিয়ে বসিয়ে দিলে সে হাঁফাতে লাগল। তার মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দানিয়েল ভাই, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। খাটের বাজুতে দেখবেন একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি আছে। সেখান থেকে খোঁজ করে একটা তাঁতের শাড়ি, পেটিকোট এবং ব্লাউজ এনে দিন না। এখনো বাসি কাপড় পরে রয়েছি। আমার গা কুটকুট করছে। গেন্ডারিয়ার বাসাতেও দেখেছি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ঘর-দোর পরিষ্কার করে গোসল সেরে একটা

ধোয়া কাপড় পরেছে। আমি প্লাস্টিকের ঝুড়ি থেকে খোঁজ করে শাড়ি ব্লাউজ এবং পেটিকোট বের করে তায়েবার হাতে দিলাম। সে বলল, এখন টুলটা টেনে ওই দরোজার কাছে নিয়ে যান, কাপড়-চোপড়গুলো পড়তে হবে। আর আপনি একটু ওপাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাকে বসিয়ে রেখে ওপাশে চলে এসে আমি দরোজা বন্ধ করে দিলাম। তায়েবা কোন কৌশলে এই অল্প পরিসর টুলের ওপর বসে কাপড়-চোপড় পরবে আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

কাপড় পরা শেষ হলে তায়েবা আমাকে ডাকল। আমি দরোজা খুললাম। কাপড়-চোপড় পরেছে বটে, কিন্তু আঁচলটাকে সামলাতে গিয়ে ভারী অসুবিধে হচ্ছিল। কাঁধ থেকে খসে মেঝেতে পড়ে আঁচলটা ভিজে গেল। তায়েবা বলল, আপনি ভীষণ অপয়া। আমার আঁচলটা ভিজে গেল। আঁচল তুলে নিয়ে সে পানি চিপে বের করে নিল। আরেকবার আপনাকে কষ্ট করতে হবে। আমার শিথানে একটি ক্রিম আছে। চাদর ওঠালেই দেখতে পাবেন। প্লিজ সেটা গিয়ে একটু নিয়ে আসুন না। আমি ক্রিমটাও নিয়ে তার হাতে দিলাম। সে আঙুলের ডগায় ক্রিম তুলে নিয়ে হাতের তালুতে ঘষে ঘষে মুখমণ্ডল এবং ঘাড়ের কাছটিতে লাগাল। তারপর আমার হাতে ফেরত দিল। এখন আপনি আবার আগের মতো দাঁড়ান। আমি দাঁড়ালাম কিন্তু সে পায়ের ওপর ভর করে আর উঠতে পারল না। উঃ দানিয়েল ভাই ! আমি বললাম, কী তায়েবা। আমার হাঁটু দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে। শরীরের সমস্ত শক্তি কাপড় পরতেই শেষ হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় রেখে আসুন না। আমি দু-হাত দিয়ে তাকে উঠিয়ে নিলাম। সে একটি হাত আমার ঘাড়ের ওপর রাখল। কাজটি শেষ হতে দুমিনিট সময়ও ব্যয় হয়নি। তায়েবার সঙ্গে আমার পরিচয় চার বছর। কিন্তু এভাবে আত্মসমর্পণ কখনো সে করেনি।

বিছানায় শুয়ে সে কয়েকবার হাঁ করে শ্বাস ফেলল। বুঝলাম তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। বেশ কয়েক মিনিট পর আমাকে জিগগেস করল, দানিয়েল ভাই, আপনি কি ডোরার গান শুনতে যাবেন ? যান তো একখানা টিকিট দিতে পারি। আমি বললাম, না, কারণ যেখানে থাকি সেখানে যেতে হবে। তারপর পত্রিকা অফিসে গিয়ে লেখার কিস্তিটি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, আপনি ডুরির প্রতি এত বিরূপ কেন ? ও কি সংসারের কিছু বোঝে ? ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসেছে, তা এমন সিরিয়াসলি না নিলেও তো পারেন। তার যখন জন্ম হয়েছিল তখন মার ভয়ানক অসুখ ছিল। আমি নিজের হাতেই সেবাযত্ন করে এত ডাগরটি করেছি। একবার তো মরতেই বসেছিল। উহ্ তখন আমার ওপর কী ধকলটাই না গেছে। গায়ে গতরে বেড়েছে বটে। আসলে ওর কি বয়স হয়েছে। আপনি তার দিকে একটু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন না। মানুষের ভুলটাকেই অত বড় করে দেখেন কেন ?

পাঁচ

হাসপাতাল থেকে আমি সবটা পথ পায়ে হেঁটেই বৌবাজারের হোস্টেলে এলাম। ট্রাম বাসে চড়ার ইচ্ছেও মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। মনে হচ্ছে আমি একেবারে কাঙাল বনে গেছি। আমার চিন্তা করার কিছু নেই, আকাঙ্ক্ষা করারও কিছু নেই, ভরসা করার কিছু নেই। তবু হোস্টেলে আসতে পারলাম কেমন করে সে আমি বলতে পারব না। গেটের গোড়ায় এসে দেখি ভুঁরিঅলা দারোয়ানটির বদলে দুবলা-পাতলা দারোয়ানটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসে খৈনি টিপছে। আমাকে দেখতে পেয়ে পান-খাওয়া গ্যাটগ্যাটে দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, বাবু কোটিমে যাইয়ে আজ, হাওয়া বহুত গরম আছে। কোনো উত্তর না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম।

যে রুমে আমরা থাকি, সেখানে মাঝারি রকমের একটা কনফারেন্স বসে গেছে। বাংলাদেশের ছেলেদের অধিকাংশই হাজির আছে। তা ছাড়া আছেন কলকাতার সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পোস্টাফিসে চাকরি করেন। ফর্সাপনা সুন্দর চেহারার সদানন্দ মানুষটি। সব সময়ে পরিষ্কার পাজামা পাঞ্জাবি পরেন এবং দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কেটে থাকেন। অবসর সময়ে কবিতা লেখেন। কিন্তু কলকাতার কাগজগুলো, এমনকি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরাও তাঁর প্রতি এমন নির্দয় যে কবিতা কেউ ছাপতে চান না। বিশ্বেসের দিক দিয়ে তিনি বিপ্লবীও বটে। কী কারণে বলতে পারব না। কোনো বিপ্লবী পার্টির সদস্য হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কথাবার্তা বলে দেখেছি পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী পার্টিগুলোর নীতি আদর্শের প্রতি তাঁর ভীষণ রকম অনাস্থা এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি সুমন্তবাবুর ভয়ানক রাগ। কথায় কথায় তিনি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। অবশ্য ইদানীং সুমন্তবাবুর বেশ পুষিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এইসব ভাসমান কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন ঘরহারা লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের সঙ্গে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মার্কামারা সত্যিকার একটি গণবিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে হামেশা আলাপ আলোচনা করে থাকেন। তাঁর ধারণা পশ্চিমবাংলা হেজে মজে গেছে। সমাজকে নিয়ে কিছু যদি করার থাকে, তা বাংলাদেশের ছেলেদের দিয়েই সম্ভব। তত্ত্বের জঙ্গলে ওদের ধ্যানধারণা এখনো পথ হারিয়ে ফেলেনি। বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলেকেই সুমন্তবাবু তার আকাঙ্ক্ষিত গণবিপ্লবের একেক জন সৈনিক হিসেবে দেখেন। এরই মধ্যে উদ্যোগী হয়ে বাংলাদেশের ছেলেদের নিয়ে তিন তিনটে কবিতার সংকলন প্রকাশ করে ফেলেছেন। তিনটিতেই সুমন্তবাবুর তিনটি কবিতা সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে। মানুষটি রসগোল্লার মতো। মনে হয় টিপলেই রস বেরুবে। কী কারণে বলতে পারব না, আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়টা মামুলিপনা অতিক্রম করে হৃদ্যতার স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। আমার পরনে ধুতি দেখে মাসুমই প্রথম ফোড়ন কাটল। দানিয়েল ভাই, বলুন দেখি কলকাতার হাওয়া এখন কার গায়ে লাগছে ? মাসুম কলকাতার মানুষের মতো টানটোন লাগিয়ে ঢাকার বাংলা ভাষাটি বলতে চেষ্টা করছে আজকাল। একবার

সেদিকে ইঙ্গিত করেছিলাম। আজ আমার পরনে ধুতি দেখে মাসুম তার শোধ দিতে চেষ্টা করছে। মাসুমের কথার পিঠে কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। নীরবে নরেশদার পাশে গিয়ে একটা বালিশ টেনে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। নরেশদা জিগগেস করলেন, কী খবর ? আমি বললাম, ভালো নয়। কীরকম বলো দেখি ? এসব শেষ হোক পরে বলব। আমি চোখ দুটো বন্ধ করে রইলাম। মনে হচ্ছিল একটা প্রচণ্ড সংজ্ঞাহীনতা আমাকে এখখুনি গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে পারছিলাম না। এক ভদ্রলোক যিনি আমার সম্পূর্ণ অচেনা, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরভর্তি মানুষের সামনে বলছিলেন। বোধ করি তিনি আগে থেকেই কথা বলছিলেন। আমার আগমনে হঠাৎ করে তাঁর কথায় ছেদ পড়ে থাকবে। বাংলাদেশের ফ্রিডম ওঅরের কথা শুনে লেখাপড়া ছেড়ে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা এসেছি আজ পঁচিশ দিন কিন্তু এখানে এসে কী দেখেছি। দেখেছি থিয়েটার রোডে যারা বসে আছে তাদের অধিকাংশই এ বাঞ্চ অফ রাস্কেলস। খাচ্ছে দাচ্ছে মজা করছে এভাবে নাকি ফ্রিডম ওঅরের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর ডিজ-ইল্যুশনড হয়ে গেছি। মাও সে তুঙও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই লং মার্চের খবর জানেন ?

আপনার মাও সে তুঙ এখন বাংলাদেশের ব্যাপারে কী করছেন, সে খবর রাখেন ? পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে খুন জখম হত্যা ধর্ষণ সবকিছু অবলীলায় চালিয়ে যাচ্ছে। আর আপনার মাও সে তুঙ সে ইয়াহিয়ার জল্লাদ সৈন্যদের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য জাহাজ ভর্তি করে বোমা, কামান, অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে—লং মার্চ তো অতীতের ঘটনা। হালের খবর বলুন। আমার মনে হল, প্রশ্নকারীর কণ্ঠস্বরটি আমার পরিচিত। ওহ্ মনে পড়েছে। গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনের মনকুমার সেন, একবার যিনি এখানে এসেছিলেন। এই ভদ্রলোক, তাঁরই বড় ছেলে। নামটি মনে আসছে না। অমর্ত্য সেন না কী একটা হবে। তাঁর বাড়িতে একবার খেতে গিয়েছিলাম। সকলেই কথা বলছে। কোনো আগামাথা নেই। কোথায় শুরু এবং শেষ কোথায় হচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বাংলাদেশের সালাম এবার মুখ খুলল। মাওলানা ভাসানী মাও সে তুঙ এবং চৌ এন লাইয়ের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, যাতে চীন পাকিস্তানিদের এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে কোনোরকম সহায়তা না করে। আরে থোন ফালাইয়া, আপনার মাওলানা ভাসানীর টেলিগ্রাম দুইখান চৌ এন লাই আর মাও সে তুঙ যতন কইর‍্যা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে থুইয়া রাখছে। মাওলানা এখন ইন্ডিয়া কেন আইছে হেইডা কইবার পারেন ? তাবিজ দেয়ার মৌলবি আপনেরা তারে বিপ্লবী লিডার বানাইছেন। কথাগুলো খুরশিদের। খুরশিদ সম্পর্কে একটু পরিচয় দিতে হয়। সে সব জায়গায় ঘটা করে আওয়ামী লীগের লোক বলে প্রচার করে। জায়গা বুঝে মাঝে মাঝে হাই কম্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, একথা বলতেও পেছপা হয় না। তবে মুসকিল হল, আওয়ামী লীগের লোকেরা তাকে পাত্তা দেয় না। সত্যিকার আওয়ামী লীগের কাছে

ঘেঁষতে না পেরে খুরশিদ আমাদের ডেরায় এসে আওয়ামী লীগ-বিরোধীদের মুণ্ডুপাত করে। ইংল্যান্ড প্রত্যাগত ভদ্রলোক জিগগেস করলেন, বাই দ্যা বাই, ক্যান এনি ওয়ান অব ইউ টেল মি হোয়ার মাওলানা ইজ নাউ। উয়ি হিয়ার দ্যাট হি ওয়াজ আন্ডার অ্যারেস্ট। মাওলানা ভাষানীকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। কে একজন বলল, মাওলানাকে ধরে লাল কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরেকজন বলল, অ্যারেস্ট করা হয়েছে, একথা সত্যি নয়, তবে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি নিজে অবশ্য শুনেছি পয়লা মাওলানাকে বালীগঞ্জের একটা বাড়িতে রাখা হয়েছিল। মাওলানা সন্ধে হলেই সে বাড়ির ছাদের ওপর পায়চারি করতেন। তাঁর লম্বা দাড়ি, পাঞ্জাবি, বেতের টুপি, লুঙ্গি এসব দেখেই আশেপাশের মানুষের সন্দেহ হতে থাকে যে, এ মাওলানা ভাসানী না হয়ে যান না। তা ছাড়া মাওলানার আরেকটা একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য ভারত সরকার তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। আর তা এই সন্ধেবেলা সব সময়ে, আজান দিয়ে ছাদে চাদর বিছিয়ে মাগরেবের নামাজ পড়তেন।

একসময় মাওলানা ভাসানীপ্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। আলোচনা শুরু হল শেখ মুজিবকে নিয়ে। খুরশিদ বলল, থিয়েটার রোডের যে-সকল মাস্তান আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে সবকিছু লুটপাট করে খাচ্ছে, এখানে বঙ্গবন্ধু হাজির থাকলে পেঁদিয়ে তাদের পিঠের ছাল তুলে ফেলতেন। সালাম ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আরে রাখো তোমার বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই ধরা দিয়েছে। পৃথিবীর কোন বিপ্লবী সংগ্রামের নেতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তোমার ওই বঙ্গবন্ধুর মতো শত্রুর কাছে সগৌরবে আত্মসমর্পণ করেছে তার কোনো নজির আছে কি ? শেখ মুজিব সব সময় সুটকেস গুছিয়ে রাখতেন। আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেই জেলে চলে যেতেন। আর আন্দোলন শেষ হয়ে গেলে বিজয়ী বীরের বেশে জেলখানা থেকে বেরিয়ে ক্রেডিটটুকু নিতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে—শেখ পাকিস্তানের জেলে আর আমরা এখানে কলকাতার পথে পথে ভেরেণ্ডা ভেজে চলছি। এই অবস্থাটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তোমার ওই শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ। শেখের মতো এত বড় জাতীয় বেইমান আর দ্বিতীয়টি নেই। খুরশিদ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, খবরদার সালাম ছোট মুখে বড় কথা বলবে না। অন্য লোকের নাম বললে কিছু মনে করতাম না। বঙ্গবন্ধুর নামে কিছু বললে, মুখের বত্রিশটি দাঁতের একটিও আস্ত রাখব না। সালাম এবং খুরশিদ উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পর শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় পৌঁছার উপক্রম করলে সকলে ধরাধরি করে দুজনকে থামিয়ে দিল।

এ ধরনের ঘটনা হামেসাই ঘটে থাকে। এ রকমের একটা বিস্ফোরণের পর আলোচনা আর স্বাভাবিক খাতে এগুচ্ছিল না। ইংল্যান্ড প্রত্যাগত ভদ্রলোক বললেন, সরি আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সুতরাং এখখুনি আমাকে উঠতে হবে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তবাবুও উঠে গেলেন। বোঝা গেল, ইংল্যান্ড প্রত্যাগত

ভদ্রলোকটি সুমন্তবাবুই সংগ্রহ করে এনেছিলেন। আসরের একেকজন করে উঠে যাচ্ছিল। ওমা এমনি করে সবাই উঠে গেলে চলবে কেন ? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখনো তোলাই হয়নি। মাসুমকে কথা বলতে শুনলাম। 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটি মনে হয় সকলের মনে একটু দাগ কাটল। মাসুম খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িঅলা এক ভদ্রলেকের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, নাহিদ ভাই এবার আপনার কাহিনীটা একটু বলুন। তিনি যে দুঃখে পড়েছেন, চেহারাসুরত দেখলেই মনে হয়। উদ্ভ্রান্তের মতো চোখের দৃষ্টি। জামার একটি হাতা গুটোনো, অন্যটি ছেড়ে দেয়া। ভদ্রলোক কথা শুরু করতে গিয়ে একটু একটু করে কাঁপছিলেন। গলার স্বরটিও কাঁপছিল। যাহোক তিনি তাঁর কাহিনীটা বলতে আরম্ভ করলেন। বগুড়া দখল করার পর আমরা দেড়মণ সোনা স্টেট ব্যাংকের স্ট্রং রুমের সেফটি ভল্ট ভেঙে এখানে নিয়ে আসি। আমরা তিনজন সোনাসহ নৌকোতে করে বর্ডারে এসে পৌঁছোই। সেখান থেকে গাড়িতে করে কলকাতা এসে দুটো সুটকেশ কিনে সোনাগুলো ভাগাভাগি করে রাখি। তারপর তিনজন শেয়ালদার কাছে একটা হোটেলে উঠি। একদিন না যেতেই অন্য দুজন হোটেল ছেড়ে সুটকেশ দুটো নিয়ে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল। আমাকে বলেছিল, তিনজন একসঙ্গে গেলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। আমি সরলভাবে তাদের কথা বিশ্বাস করেছি। তারা কোনো সেফ জায়গায় ওঠার পর আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

সেই যে গেল আর কখনো তাদের দেখা আমি পাইনি। নরেশদা বললেন, এই সোনা তো বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি। আপনারা এখানে নিয়ে এলেন কেন ? থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো নালিশ-টালিশ করেননি ? নাহিদ সাহেব বললেন, থিয়েটার রোডে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। কেউ আমার কথা কানেও তুলতে চান না। যে তিনজন আমরা সোনা নিয়ে এসেছিলাম তারমধ্যে একজন এম.পি.-র আপন ছোট ভাই। আরেকজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টের শালা। তারা এখন কোথায় আছে, কী করছে, কিছু জানিনে। অথচ এদিকে শুনতে পাচ্ছি সেই সোনা ইতিমধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। দেখছেন তো এই অবস্থায় আমার কথা কে গ্রাহ্য করে ? তিনি নিজের দীন দশার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সত্যিই তো এরকম একজন মানুষ দেড়মণ সোনা বয়ে নিয়ে এসেছে শুনলে এখন কে বিশ্বাস করবে। ভদ্রলোক বললেন, এখন আমি কী করি বলুন তো, পথেঘাটে বের হওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কলকাতার এবং বাংলাদেশের চেনা অচেনা মানুষ ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি যদি কলকাতা শহর ছেড়ে না যাই, তা হলে আমাকে খুন করা হবে অথবা পাকিস্তানের গুপ্তচর বলে ভারতের পুলিশের কাছে তুলে দেয়া হবে। আমি এখন কী করব বুঝতে পারছিনে। আপনারা কি আমাকে কোথাও আশ্রয় দিতে পারেন ? তাঁর গল্পটি কেউ অবিশ্বাস করল না। কেননা এরকম ঘটনা এই একটি নয়। আকছার ঘটছে। মুখে মুখে অনেক সহানুভূতিও প্রকাশ করা হল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। খুরশিদ

কিন্তু নাহিদ সাহেবকে একটা পাকা আশ্বাস দিয়ে ফেলল। কাল এই সময়ে আপনি এখানে আসবেন। থিয়েটার রোডে নিয়ে গিয়ে তাজুদ্দীন সাহেবকে সবকিছু খুলে বলে বদমায়েশদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করব। আজ বাড়ি চলে যান। নাহিদ সাহেব বললেন, এখানে আমার বাড়ি কোথায় যে যাব। খুরশিদ বলল, যেখানে থাকেন চলে যান। আমার তো থাকার কোনো জায়গা নেই। খুরশিদ বিরক্ত হয়ে বলল, কাল কোথায় ঘুমিয়েছিলেন ? কাল তো গোটা রাত শেয়ালদা স্টেশনে কাটিয়েছি। দূর মশায় আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

আমার চোখ দুটো ঘুমে ঢুলে আসছিলো। এত ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় কী করে যে এতসব কথাবার্তা নীরবে শুনে আসছিলাম, তার কারণ কী ঠিক বলতে পারব না। সবাই চলে গেলে নরেশদা জিগগেস করলেন, গতরাতে কি তোমার ঘুম হয়নি ? আমি বললাম, না। এখন কি ঘুমোবে ? বললাম, হ্যাঁ। কিছু খাবে না। ঘুমজড়ানো অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলাম, খেয়ে এসেছি।

বেলা তিনটের দিকে আমার ঘুম ভাঙল। দেখি রুমে আর কেউ নেই। নরেশদা বসে বসে সুবলচন্দ্র মিত্র এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান দুটো নিয়ে কীসব করছেন। অভিধান পাঠ করা এবং একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে দেখা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। ঢাকায় থাকার সময়ে আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম, বছর তিনেকের মধ্যে তিনি নিজে একখানা অভিধান জন্ম দিতে যাচ্ছেন। জিগগেস করলেন, দানিয়েল গতরাতে কোথায় ছিলে ? আমি বললাম, তায়েবার ডাক্তার মাইতি বাবুর কোয়ার্টারে। তায়েবার রোগ সম্পর্কে ডাক্তার কিছু বললেন ? বললাম, হ্যাঁ লিউক্যামিয়া। ওটা নাকি ক্যান্সারের একটা ভ্যারাইটি। ডা. মাইতি বললেন, এ ধরনের রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই নাকি ? গলার স্বরটা চমকে গেল। তিনি অভিধান দুটো বন্ধ করে গালে হাত রেখে কীসব ভাবলেন। এখন তুমি কোথায় যাবে ? আমি বললাম, গোল পার্কের কাছে অর্চনাদের বাড়ি আছে না সেখানেই যাব। অর্চনা তো চাকরি করে কলেজে। তিনি কি কলেজে যাননি ? এখন গেলে পাবে ? আমি বললাম, আজ অফিসে আসবে না। গিয়ে দেখি পেলেও পেতে পারি। সেকী, খাবে না ? আপনি খেয়েছেন ? হ্যাঁ আমাকে খেতে হয়েছে। রাজারমঠ থেকে দাদা এসেছিলেন। তাঁকেসহ খেয়ে নিয়েছি। মা-বাবার কোনো খবর-টবর পেলেন ? হ্যাঁ মা-বাবা আজ তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন। আমি বললাম, ভালো খবর। তিনি এখন কোথায় ? খবরটা দিয়েই চলে গেছেন আবার, কাপড়চোপড় পরে আমি জিগগেস করলাম, নরেশদা আপনার কাছে টাকা আছে ? বললেন, কত ? এই ধরুন পনেরো বিশ। তিনি আমার হাতে বিশ টাকার একখানি নোট দিলেন। আমি বেরিয়ে আসছি, তিনি ডাক দিলেন, একটু দাঁড়াও তায়েবার হাসপাতালের ওয়ার্ড নম্বর এবং বেড নম্বরটি লিখে দিয়ে যাও। আমি কাগজ নিয়ে লিখে দিলাম।

ছয়

অর্চনার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল। উনিশশো আটষট্টির দিকে অর্চনা একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। ওতে আমার একটি গল্প ছাপা হয়েছিল ; আমি এমন আহামরি লেখক নই। তথাপি কী কারণে বলতে পারব না, লেখাটি অর্চনার মনে ধরেছিল তখন থেকেই সম্পর্ক। অবশ্য চোখের দেখা হয়নি। এখানে আসার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে অর্চনাই ছিল একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি। বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করে তাকে পেতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। বড় আশ্চর্য মেয়ে অর্চনা। এখানকার একটি কলেজে ফিলসফি পড়ায়। একসময় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অধ্যাপক সুশীতল রায়চৌধুরী বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ করে দলের লোকদের হাতে নিহত হওয়ার পর থেকেই অর্চনা নিজেকে আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত নয় কিন্তু অনেকের সঙ্গে ওঠাবসা আছে। ছাত্র পড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে বটে কিন্তু একটা অস্থিরতা সর্বক্ষণ মনের মধ্যে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। তা আমি অনুভব করতে পারি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই খোলামেলা। আমরা পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করি। মাঝে মাঝে আমার অবস্থা যখন খুবই অসহ্য হয়ে ওঠে, কয়েক ঘণ্টা ওদের ওখানে কাটিয়ে মনটাকে ঝরঝরে করে তুলি।

আজও প্রাণের ভেতর থেকে একটা গভীর তাগিদ অনুভব করছিলাম। পা দুটো আপনা থেকেই চলতে আরম্ভ করল। বাসে গড়িয়াহাটা পর্যন্ত এসে বাকি পথটা টানা রিকশায় গেলাম। এ অবস্থায় এটা একটা বিলাসিতা বটে। কিন্তু হাঁটার মতো পায়ে কোনো জোর পাচ্ছিলাম না।

গোল পার্কের বাড়িতে গিয়ে বেল টিপতেই অর্চনা নিজে এসে দরোজা খুলে দিল। আমাকে দেখে তার চোখজোড়া খুশিতে চমচক করে উঠল। জান দানিয়েল আজ ভেবেছিলাম, বৌবাজার গিয়ে তোমাকে খুঁজে বের করব। হোস্টেলটা চিনিনে বটে। তবে ঠিকানা তো ছিলই। খুঁজে বের করতে কতক্ষণ। বাংলাদেশের ছেলেদের একটা সারপ্রাইজ দিতাম। আমি বললাম, যাওনি যখন সে কথা বলে আর লাভ কী ? সে বলল, আমি তো প্ল্যান করেছিলাম যাবই, মাঝখানে বৌদি পাকড়ে ফেলে তার বোনের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখান থেকে এসেই দেখি মা রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন। যেই আমি বাড়িতে পা দিয়েছি, অমনি মা ঘরের মধ্যে বন্দি করে নিজে বেরিয়ে গেলেন। মিশনে অক্ষরানন্দ নামে এক মহারাজ এসেছেন। আর তাঁর মুখের বচন নাকি ভারি মিষ্টি। তা কী আর করা। আমি বেচারি বাড়িতে বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি। অর্চনা নিতান্ত আটপৌরে কথাও সুন্দর করে বলতে জানে। আমি বললাম, অর্চনা এক কাপ চা খাওয়াবে ? ওমা চা তো খাবেই। সে অনুচ্চস্বরে ডাকল, শোভা এই শোভা। কাজের মেয়েটি এলে

বলল, দু-কাপ চা করে নিয়ে আয়। আর দেখো খাবার কিছু আছে কি না। আমি বললাম, অর্চনা শুধু চা, আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অর্চনা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বলল, দানিয়েল নিশ্চয়ই তোমার একটা কিছু হয়েছে। মুখটা ভয়ানক শুকনো দেখাচ্ছে। জবাবে বললাম, কিছু একটা না হলে শুধুশুধু তো আর তোমার কাছে আসিনে। সে বলল, বাপু কথা না বাড়িয়ে সেটা বলে ফেলো না। আমার সে পরিচিতা বান্ধবী যার কথা তোমাকে বলেছি, গত পরশু তার দেখা পেয়েছি। তা হলে তো পেয়েই গেছ, আমাদের এখানে এসেছ কেন ? আচ্ছা যাক, তোমার সে ভদ্রমহিলার গল্প শুনি। আমি বললাম, বলার মতো আর কোনো গল্প নেই। সেকী, দেখা না হতেই ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছ নাকি। আমাকে বুঝি মধ্যস্থতা করতে হবে। আমাকে বলতেই হল, তার মারাত্মক অসুখ। ডাক্তার বলছে ক্যান্সার। ওমা সেকী ! এখন কোথায় আছে। আমি বললাম, পি.জি. হাসপাতালে। তুমি কেমন করে খুঁজে বের করলে। সেকথা থাকুক অর্চনা। খুঁজে বের করে কী লাভটা হল। সে ফোঁস করে উঠল, তোমরা ব্যাটাছেলেরা ভয়ানক নেমকহারাম। সব সময় লাভ খুঁজে বেড়াও। এরই মধ্যে চা এসে গেল। চুমুক দিতে দিতে টুকটাক কথাবার্তা হল। অর্চনা জিগগেস করল, তুমি এখন কী করবে। কী করব সেটাই প্রশ্ন। ওসব হেঁয়ালি রাখো। বাস্তবে কী করবে সেটাই বলো। আমি বললাম, যা ঘটবার ঘটে যাবে, আমাকে শুধু দেখে যেতে হবে। বাস এর বেশি আর কিছু না। দানিয়েল তুমি ভয়ানক ভেঙে পড়েছ। ব্যাটাছেলেদের একটু শক্ত হতে হয়। এ সময় শক্ত হওয়াই প্রয়োজন। ঠাণ্ডা মাথায় স্থির করো কী করবে। আমি বললাম, স্থির করাকরির আর কিছু নেই। তার পার্টির লোকেরা হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে। ডাক্তার বলেছে চিকিৎসাতে ফল হবে না। সে মারা যাবেই। অর্চনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তুমি নেগেটিভ সাইডটা সব সময় বড় করে দেখ। মাথা ঠাণ্ডা করো একটু। আগে রোগী দেখি। তারপর স্থির করা যাবে, কী করতে হবে। আমি অনেক কষ্টে হাসতে চেষ্টা করলাম। বললাম, অর্চনা তোমাকে ধন্যবাদ। সব রকমের বিপদে-আপদে সব সময়ে তোমার মুখ থেকে চমৎকার সান্ত্বনার বাণী বেরিয়ে আসে।

এ সময়ে আবার কলিং বেল। অর্চনা উঠে দরোজা খুলে দিল। দু জন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের একজন হ্যাংলামতো। গায়ের রং ফর্সা, তবে কিছুটা জ্বলে গেছে। পরনে ধুতি আর সাদা শার্ট। ভদ্রলোকের চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। মাথার চুল লম্বা কোঁকড়ানো। সঙ্গের অন্য ভদ্রলোকটি বেঁটেখাটো। চকোলেট রঙের প্যান্ট এবং নীল হাওয়াই শার্ট পরনে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে, এ ভদ্রলোক অত্যন্ত গোছালো। ওঁরা দু জন সোফায় বসলে অর্চনা বলল, এসো দানিয়েল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে সত্যব্রত আমার কলিগ এবং বন্ধু। আমি ধুতিপরা হ্যাংলাপনা ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মেলালাম। আর উনি হলেন অনিমেষদা। আশা করি দেখে চিনে নিতে তোমাদের অসুবিধে হবে না।

এ হচ্ছে দানিয়েল, আমার বাংলাদেশের বন্ধু। তার সম্পর্কে তো তোমাদের অনেক বলেছি। সত্যব্রতবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আরে দানিয়েল সাহেব, আপনার সম্পর্কে অর্চনার কাছে এত শুনেছি যে বলতে গেলে আপনার সমস্ত কিছু মুখস্ত হয়ে গেছে। তাঁর কথায় হাসলাম। তিনি ফের জিগগেস করলেন, আপনি কেমন আছেন। এখানে কোথায় উঠেছেন, আর আপনাদের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ কী ? আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্বন্ধে জানতে চাইলে কেমন নার্ভাস এবং অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকি। মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে আমি কতটুকু বলতে পারি। দেশের ভেতরে কী হচ্ছে কিছু জানিনে। সীমান্তে যা ঘটছে তারও খবর ঠিকমতো পাইনে। থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিরা কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ? আমি সমস্যাতাড়িত অস্তিত্বের ভারে পীড়িত একজন অতি অসহায় মানুষ। আমার কাছে মানুষ যুদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে জবাব দিতে গিয়ে কেমন বাধোবাধো ঠেকে। অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশে একটি মুক্তিযুদ্ধ চলছে। এবং এই যুদ্ধের কারণেই কলকাতা মহানগরীর নাভিশ্বাস উঠেছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সাজো সাজো রব উঠছে। আমি সেই বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা ছিটকে-পড়া অংশ। যতই বিব্রত বোধ করি না কেন, এ জাগ্রত জ্বলন্ত সত্যকে এড়িয়ে যাই কেমন করে। সত্যব্রতবাবু পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা আমাকে দিলেন এবং একটা নিজে ধরালেন। তারপর একটুখানি হেসে বললেন, আমরা আশা করেছিলাম, আপনারা অন্য রকমের একটা ঘটনা ঘটাবেন। মার্চ মাসের প্রাথমিক দিনগুলোতে পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার ছেলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। আপনারা যুদ্ধের সমস্ত মাঠটা পাকিস্তানি সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে একেবারে চূড়ান্ত নাজুক অবস্থায় ইন্দিরা সরকারের অতিথি হয়ে ভারতে চলে এলেন, এটা আমরা আশা করিনি। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু কিছু না বলাটাও অশোভন। তাই আমাকে বলতে হল, পাকিস্তানি আর্মির ক্র্যাক ডাউনের এক সপ্তাহ আগেও আমরা ধারণা করতে পারিনি যে আমাদের এভাবে এখানে চলে আসতে হবে। কিন্তু দেখতে পারছেন তো এসে গেছি। এখন করার বেশি কিছু কি আছে ? সত্যব্রতবাবু অনেকটা আফসোসের ভঙ্গিতে বললেন, আপনাদের দেশ এবং জনগণের ভাগ্য এখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত দেশ চাইবে আপনাদের উপলক্ষ করে দাবায় নিজের চালটি দিতে। মাঝখানে আপনারা চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় কী জানেন, আপনাদের ওই শেখ মুজিব মানুষটি হাড়ে হাড়ে সুবিধেবাদী অথবা আস্ত একটা বোকারাম। কী সুবর্ণ সুযোগই না আপনাদের হাতে ছিল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, সেটা বুকের ভেতর জমিয়ে রাখলাম। অর্চনা বলল, তোমরা আলাপ করো, আমি দেখি চা দেয়া যায় কি না। সে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

অনিমেষবাবু মুখ খুলল, আচ্ছা দানিয়েল সাহেব একটা কথা বলুন তো। আমি শুনেছি শেখ মুজিব নাকি বলেছিলেন, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঠেকাতে হলে সবাইকে তাঁর ওপর নির্ভর করতে হবে। কথাটা কতদূর সত্যি। বললাম, কথাটা আমিও শুনেছি। নিশ্চয়ই সত্যি হবে। তিনি বললেন, আমার অনুমানটা সত্যি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হবে। বাংলাদেশ হয়তো স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু কোন স্বাধীনতা ? আখেরে জনগণের কোনো লাভ হবে না। দোদুল্যমান বিপথগামী নেতৃত্ব দেশের জনগণকে সম্পূর্ণ একটা অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অর্চনা ট্রেতে করে চা নিয়ে এল। সকলে চায়ের কাপ তুলে নিয়েছে, এই সময়ে অর্চনা কথা বলল, বাংলাদেশের কথা বাদ দাও। পশ্চিমবাংলার কথা চিন্তা করে দেখো। তোমাদের গলাকাটা এবং মূর্তি ভাঙা প্রোমটার-এর কী হাল হয়েছে কখনো কি তলিয়ে দেখেছ। অনিমেষদা আমার তো ইচ্ছে হয়, তোমাদের সবাইকে একটা করে আয়না কিনে দিই। যাতে করে নিজেদের চেহারা নিজেরা ভালো করে দেখতে পার। দিনে দিনে যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে পশ্চিমবাংলায়ও কি শ্বাস নিতে কষ্ট হয় না। ভুল শুধু বাংলাদেশের নেতারা করেছে আর তোমরা করনি, এটা কি সত্যি ?

সত্যব্রতবাবু বললেন, বাংলাদেশের সেন্টিমেন্ট এক্সপ্লয়েট করে শাসক কংগ্রেস এখানকার পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে করে তুলেছে যে সত্যিকার বিপ্লবীদের চেহারা দেখানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ঠং করে পেয়ালাটা পিরিচের ওপর রেখে অর্চনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, সত্যব্রত তুমি সত্যিকার বিপ্লবী কাদের বলছ ! যারা মূর্তি ভেঙেছে, গ্রামগঞ্জের জোতদার মহাজনের গলা কেটেছে, চীনের চেয়ারম্যানকে আমাদের চেয়ারম্যান বলেছে, তারাই কি সত্যিকারের বিপ্লবী ? আজকে তোমরা বাংলাদেশের ছেলেদের দায়ী করছ। তোমাদের বন্ধুরা কি অবগত আছেন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য তাঁরা কম দায়ী নন। পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী আন্দোলন বাংলাদেশের আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে সবচাইতে বেশি। সেজন্য বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলো একটা সময় পর্যন্ত জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। তোমাদের নেতাদের মতো তারাও বলেছে, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান ! যেহেতু পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব আছে তাই বামপন্থী কতিপয় দল এখনো পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে আসতে তোমাদের ভ্রান্তনীতি কি সহায়তা করেনি ? আগে নিজেদের দোষগুলো দেখো তারপর বাংলাদেশের দোষ ধরতে যেয়ো। দুঃখ এই জায়গায় যে কেউ সহজ বিষয় সহজভাবে দেখছ না।

বাহ্ চমৎকার আড্ডা হচ্ছে দেখছি। সুনীলদা ঘরে ঢুকলেন। দরোজা খোলাই ছিল। তিনি অর্চনার বড় ভাই। একটি বিদেশী কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভের চাকরি করেন। সব সময়ে হাসিখুশি থাকার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে সুনীলদার। তিনি

ঘরে ঢুকতেই মনে হল, দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিয়েছে কেউ। অনিমেষ, সত্যব্রত, দানিয়েল সবাই একসঙ্গে, বাহ্ চমৎকার। তিনি হাতের ব্যাগটা রেখে একসঙ্গে বসে গেলেন। কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমাদের। অর্চনা বলল, দাদা তুমি তো অফিস থেকে এইমাত্র এলে। কাপড়চোপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে তারপর বসো না, এখন তো তুমি ক্লান্ত। আরে রাখো, ক্লান্ত হব কেন, আমার নার্ভের মধ্যে জীবনযাপনের ঝকমারি ছাড়া অন্য কোনো টেনশন নেই। তাই আমি ক্লান্ত হইনে। তোদের মতো অত প্যাঁচগোচ তো আমি বুঝিনে। আমার ওই একটাই কথা, যে-কেউ নিজের শরীরের চাইতে বড় কোনো কিছুর জন্য আত্মদান করবে, যত ভুলই করুক, তার একটা ফল আলবত ফলবে। এই ধরো না বাংলাদেশের কথা, সেখানে এত মানুষ প্রাণ দিচ্ছে তার একটা সুফল আসবেই। আবার ধরো শয়ে শয়ে নকশাল ছেলে সি.আর.পি. এবং পুলিশের হাতে প্রতিদিন খুন হচ্ছে তারও একটা ফল হবে। হয়তো তুমি আমি যেভাবেই চাই সেভাবে হবে না। কিন্তু ফল একটা অবশ্যই হবে। সত্যব্রতবাবু বললেন, সুনীলদা আপনার একটা সুবিধে কী জানেন ? আপনি সমস্ত জাগতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব আকাশে টেনে নিয়ে একটা সমাধান টেনে আনতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি হেগেলেরও এক কাঠি ওপরে। পরম সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সমস্ত জাগতিক দ্বন্দ্বের অবসান করে ফেলতে পারেন। সুনীলদা বললেন, তোমার ওই হেগেল-টেগেল বুঝিনে। আমি অত্যন্ত সহজ মানুষ এবং সাদা চোখে দুনিয়াটা দেখি। সুনীলদা অন্যরকমের মানুষ। উনাদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বেমানান। এ কথাটা দুপক্ষই বুঝতে পারে। তাই সত্যব্রতবাবু বললেন, চলুন অনিমেষদা যাই। সুনীলদা বললেন, সে-কী ! তোমরা এরই মধ্যে চলে যাবে ? তা কেমন করে হয়। বসো গল্প করি। চাও খাও। অনিমেষবাবু বললেন, চা খেয়েছি। আরেক দিন না হয় আসব আজ চলি। সুনীলদা বললেন, রোববার ছুটির দিন আছে, সকাল বেলা এসো, চুটিয়ে গল্প করা যাবে।

উনারা দু জন চলে গেলে সুনীলদা আমার কাছে ঘেঁষে বসলেন। ধরো দানিয়েল, তোমাকে একটা ভালো সিগারেট দিই। টেনে দেখো যদি ভালো লাগে আস্ত একটি প্যাকেটই প্রেজেন্ট করব। আজ এক পার্টি আমাকে আস্ত একটা কার্টুন গিফ্‌ট করেছে। তিনি সিগারেটে টান দিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দুনিয়াতে বিস্তর ভালো জিনিস আছে, মাঝে মাঝে চেখে না দেখলে জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে যায় বুঝলে দানিয়েল। তারপর তিনি জুতোজোড়া এবং গায়ের জামাটি খুলে টেবিলের ওপর পা দুটি তুলে দিয়ে বললেন, কিছু মনে করো না দানিয়েল। ইচ্ছে হলে তুমিও তুলে দাও। এখন বলো তোমার যুদ্ধের সংবাদ। আমি বললাম, চলছে। সুনীলদা আসলে কথা বলার একটা উপলক্ষ চাইছিলেন। তারপর বলতে থাকলেন। দেখবে একদিন তোমাদের জয় হবেই। এ তোমাদের ন্যায়যুদ্ধ। জান তো যথা ধর্ম তথা জয়। ধর্ম তোমাদের পক্ষে। একদিন আমি তোমাকে বিজয়দার

কাছে নিয়ে যাব। এসব কথা তিনি আমার চাইতে আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। বিজয়দা এখন রামকৃষ্ণ মিশনে থাকেন। মনে করো না, তিনি ধর্মকর্ম নিয়ে ডুবে থাকেন। মোটেই সত্যি নয়। দেখবে কীরকম বিচক্ষণ মানুষ। জগৎসংসারের সব খবর রাখেন। আধুনিক ফিজিক্সের জটিল সব তত্ত্ব, ক্যাট মানে বেড়ালের মতো করে বুঝিয়ে দিতে পারেন। দেখে বিশ্বাসই হবে না এই মানুষটি যৌবনে বাঘা যতীনের সঙ্গে বালেশ্বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, মানুষের মনের এই যে টেনশন তার পেছনে দুটি কারণ, একটি হল লোভ, অন্যটি অনিশ্চয়তা। মনের ভেতর থেকে এই দু বস্তুর অবসান ঘটাতে পারলে দেখবে জীবন অনেক ফলবান এবং পৃথিবী অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে। সুনীলদার বক্তৃতাটি আরো দীর্ঘ হতে পারত। কাজের মেয়েটি খবর দিয়ে গেল, কে একজন তাঁকে টেলিফোনে ডাকছে। আমি বললাম, সুনীলদা আজ আমার একটু কাজ আছে সুতরাং চলি। আরেকদিন না হয় আসব। তিনি জোর করলেন না।

আমার সঙ্গে অর্চনা বড় রাস্তার গোড়া পর্যন্ত এল। বলল, কোনো কথা হল না। দানিয়েল আমি খুবই দুঃখিত। বললাম, অর্চনা, দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। যা ঘটবার ঘটে যাবে, সত্যিকার অবস্থাটি ভুলে থাকতে পারলে আমি খুশি হই। কিন্তু পারি কই ? অর্চনা আমার কাঁধে হাতে রেখে বলল, এক কাজ করো। তোমার বান্ধবীর নাম এবং হাসপাতালের ওয়ার্ড নাম্বারটি লিখে দাও। কলেজ থেকে আসার পথে একবার দেখে আসব। একটা কাগজ নিয়ে আমি তায়েবার ওয়ার্ড নাম্বার লিখে দিলাম। বাইরে পা বাড়িয়ে আমার বুকের ব্যথাটি মোচড় দিয়ে উঠল। এই অবস্থার সঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে আছে। একবার দাঁতের খুব ব্যথা হয়েছিল, যন্ত্রণায় চীৎকার করছিলাম। এই সময়ে দেখি পাশের বাড়িতে মারামারি লেগেছে। থামাতে গিয়ে তিন ঘণ্টার মতো প্রাণান্তকর যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিলাম। বড় রাস্তার ধারে ধারে টিউব লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। গাড়িগুলো তীব্রবেগে ছুটছে। আমি ফুটপাত ধরে হাঁটছি। কোনকিছুর প্রতি খেয়াল নেই। ছাড়া ছাড়া ভাবে নানাকিছু আমার মনের মধ্যে হানা দিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে তায়েবার মুখখানা ভেসে উঠল। কিছুদিনের মধ্যে সে জগৎসংসারের হিসেব চুকিয়ে নেই হয়ে যাবে। তার মায়ের কথা মনে হল। ওঁরা কি এখনো দিনাজপুরে আছেন ? আমার মা, গ্রামের বাড়িঘর, আত্মীয়-পরিজন, ঢাকার বন্ধু-বান্ধব কখনো কি আবার সকলের সঙ্গে দেখা হবে ? আমার সমস্ত স্মৃতির পেছনে আপনা থেকেই মুক্তিযুদ্ধটি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে আমার অস্তিত্বও যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কলকাতা শহরে যে আমি ছায়ার মতো বেড়াচ্ছি, তা যেন আমার সমগ্র সত্তার একটি প্রক্ষিপ্ত টুকরো মাত্র। সেই সংগ্রামের মূল শরীরটির সঙ্গে আমি যুক্ত হতে পারছিনে কেন ? ঘুরে ঘুরে কথাগুলো মনে বেজে যেতে থাকল। কিন্তু জবাব দেবে কে ?

সাত

তার পরদিন সকালবেলাও আমাকে হাসপাতালে যেতে হল। তখন বোধ হয় বেলা দশটা এগারোটা হবে। তায়েবার মা, বড় ভাই, ডোরা, জাহিদুল হক এবং দোলা সবাই তায়েবার বিছানার চারপাশে ভিড় করে আছে। দরোজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা দিতেই একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমি কেমন অন্যরকম হয়ে যাই। এই পারিবারিক সম্মেলনে আমার তো কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। স্বভাবতই আমি ভীরু এবং লাজুক প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু চলে আসাটা ছিল আরো অসম্ভব। আমার দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ল তায়েবার। এই যে দানিয়েল ভাই আসুন, ইতস্তত করছেন কেন ? দেখতে পাচ্ছেন না মা এবং বড় ভাইয়া এসেছেন। আমি কেবিনে ঢুকে তায়েবার মাকে সালাম করলাম। মহিলা আমার মাথায় হাত রাখলেন। সহসা মুখে কোনো কথা জোগালনা। এ মহিলাকে তায়েবার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই মা বলে ডাকে। আমিও চেষ্টা করেছি মা ডাকতে। কিন্তু বলতে পারব না, কী কারণে জিভ ঠেকে গেছে। যাহোক, তিনি জিগগেস করলেন, কেমন আছ বাবা। আমি স্মিত হেসে বললাম, ভালো। তায়েবার বড় ভাইয়া তাঁকে আমরা হেনা ভাই ডেকে থাকি। জিগগেস করলেন, দানিয়েল তোমার সব খবর ভালো তো ? তারপর বললেন, চলো, একটু বাইরে যাই। কেবিন থেকে বেরিয়ে দুজনে হেঁটে গেটের কাছের মহানিম গাছটির গোড়ায় এলে, হেনা ভাই বললেন, চলো এখানে শানের ওপর একটু বসি। বসার পর জিগগেস করলেন, তোমার পকেটে সিগারেট আছে ? ভুলে আমি প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। নীরবে পকেট থেকে চারমিনার বের করে দিলাম। মুখের একটুখানি অপ্রিয় ভঙ্গি করে হেনা ভাই বললেন, আঃ চারমিনার খাচ্ছ। ভালো সিগারেটের প্রতি হেনা ভাইয়ের মস্ত একটা অনুরাগ আছে। মনঃক্ষুণ্ন হলেও তিনি একটা চারমিনার ধরালেন। হেনা ভাই সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছেন। সারা গায়ে পাউডার মেখেছেন। চুলটাও বোধ করি আগের দিন কেটেছেন। আমাদের জীবনকে ঘিরে এতসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো যেন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করেনি। আপাতত তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি গেন্ডারিয়ার বাড়ির খোশগল্প করার মুডে রয়েছেন। এ সময়ে তাঁর পায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন, এ বিদ্যাসাগরী চটিজোড়া গতকাল কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট থেকে কিনলাম। জান তো বিদ্যাসাগরী চটির মাহাত্ম্য ? 'নীল দর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেব যখন ক্ষেত্রমণিকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল, বিদ্যাসাগর মশায় রাগে ক্ষোভে অন্ধ হয়ে পায়ের চটিজোড়া ছুড়ে মেরেছিলেন। তার পরবর্তী দৃশ্যে গিরীশ ঘোষ যিনি নীলকর সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, চটিজোড়া মস্তকে ধারণ করে হলভর্তি দর্শকের সামনে এসে বলেছিলেন, জীবনে আমি অভিনয় করে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের চটিজোড়ার মতো এতবড় পুরস্কার কোনদিন পাইনি এবং পাবও না। তারপর তো ড্রপসিন পড়ে গেল। হলভর্তি লোকের সে কী বিপুল করতালি। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করো।

কেবিনে এসে দেখি ভাইবোন সবাই মিলে ডোরার রবীন্দ্রসঙ্গীতের গল্প করছে। জাহিদুল তাতে আবার মাঝে মধ্যে ফোড়ন কাটছেন। উৎসাহটা মনে হচ্ছে তায়েবারই অধিক। এমন খোশগল্প করার এ আশ্চর্য প্রশান্তি এরা সকলে কেমন করে আয়ত্ত করলেন, আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই। তায়েবা জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ডোরা তার জীবনের মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটিয়ে বসে আছে। আমাদের সকলের অস্তিত্ব চেকন সুতোয় ঝুলছে। এই ধরনের অবস্থায় নির্বিকার মুখ ঢেকে এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা কী করে করতে পারেন ! জীবন সম্ভবত এ রকমই। আঘাত যত মারাত্মক হোক, দুঃখ যত মর্মান্তিক হোক, একসময় জীবন সবকিছু মেনে নেয়। দুনিয়াতে সবচাইতে আশ্চর্য মানুষের জীবন।

তায়েবার মা তায়েবার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ভদ্রমহিলার তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে এক পোঁচ ঘন গাঢ় বিষাদের ছায়া। সকলেই কথা বলছে, তিনি বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন। সাদা-কালো চুলের রাশি একপাশে হেলে পড়েছে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চেহারা। যৌবনে কী সুন্দরীই না ছিলেন। মহিলার দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরানো যায় না। চেহারায় এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, বারবার তাকাতে বাধ্য করবে। আপাতত মাধুর্যমণ্ডিত মনে হলেও গভীরে ধারালো কিছু, কঠিন কিছু আত্মগোপন করে আছে। অনেকবার এই মহিলার কাছাকাছি এসেছি। কিন্তু খুব কাছে যেতে সাহস পাইনি। মহিলার প্রতি যেমন একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম, তেমনি আবার ভয়ও করতাম।

উনারা যখন উঠলেন, তখন বেলা সাড়ে এগারোটা হবে। আমি কী করব স্থির করতে না পেরে উসখুস করছিলাম। তায়েবার মা বলে বসলেন, বাবা দানিয়েল, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি সসংকোচে জানতে চাইলাম, কোথায় ? তিনি বললেন, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আমার দেওরের বাসায়। আর কেউ যাবেন না ? না আর কেউ যাবে না, দোলা যাবে ক্যাম্পে। হেনা দিনাজপুরের লোকদের সঙ্গে থাকে। ডোরার কোথায় রিহার্সেল না কী আছে। তায়েবা কলকলিয়ে উঠল, যান দানিয়েল ভাই, মার সঙ্গে যেয়ে চাচার সাথে পরিচয়টা করুন। আপনার অনেক লাভ হবে। আপনি তো মীর্জা গালিবের কবিতা ভালোবাসেন চাচার সঙ্গে খাতির করতে পারলে উর্দু ভাষাটা তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারবেন। চাচাদের বাড়িতে কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে না। যান, আপনার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

আমি একটা টানা রিকশায় চেপে তায়েবার মাকে নিয়ে পথ নিলাম। যেতে যেতে তিনি আমাকে বললেন, আমার দেওরের বাসা যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে একটু সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে। ওরা কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে না, এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে প্রাণের থেকে ঘৃণা করে। তথাপি আমি থাকছি, কারণ আমার অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই। ওরাও আমাকে থাকতে জায়গা দিয়েছে কারণ এই বাড়িটার অর্ধেকের দাবিদার ছিলাম আমরা। কিন্তু সে কথা আমরা কখনো উত্থাপন করিনি। ওদের জীবনের এমন একটা ধাঁচ তার সঙ্গে আমাদের

একেবারেই মেলে না আর আমাদের মধ্যে কীসব ঘটছে না-ঘটছে সে বিষয়ে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই। এই কথাগুলো বললাম, মনে রাখবে। তোমাকে ওই বাড়িটাতে অনেকবার আসতে হবে। তায়েবাদের পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে আবছা আবছা অনেক কথা শুনেছি। সেগুলো কানে নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিনি। শুনেছিলাম তাদের বাবার পরিবারের কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলেন না। বর্ধমান তাদের স্থায়ী নিবাস হলেও হাড়ে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় তায়েবার বাবা চাচারা মনে করেন তাঁরা পশ্চিমদেশীয়। বাংলা মুলুক তাঁদের পীর-মুরিদি ব্যবসার ঘাঁটি হলেও অত্যন্ত যত্নে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের ভেদচিহ্নগুলো ঘষে মেজে তকতকে ঝকঝকে করে রাখেন। এ ব্যাপারে উর্দু ভাষাটা তাঁদের সাহায্য করেছে সব চাইতে বেশি। স্থানীয় মুসলিম জনগণ তাঁদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করে মেনে নিয়েছে। কারণ পীর বুজর্গরা উর্দু ভাষার মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দেবেন, কোরান কেতাবের মানে বয়ান করবেন এটাতো স্বাভাবিক। সাথে সাথে তাঁরা যদি দৈনন্দিন কাজকর্মে ঐ ভাষাটিকে ব্যবহার করেন, তাতে তো দোষের কিছু নেই, বরং স্থানীয় জনগণের চোখে তাঁদের সম্ভ্রম অনেক গুণে বেড়ে যাওয়ার কথা। এই পরিবারটিতে তায়েবার মায়ের মতো একজন মহিলার বিয়ে হওয়া সত্যিকারের বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটে যায়।

তায়েবার মা শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশ থেকে। তাঁদের বাড়ি ছিল বোলপুরের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের একেবারে সন্নিকটে। তায়েবার মা বালিকা বয়সে পাঁচ ছয় বছর শান্তিনিকেতনে পড়ালেখা করেছেন। বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে এসে একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। নতুন বউ উর্দু ভাষায় কথা বলে না। এমনকি পারিবারিক ভাষাটি শিক্ষা করার কোনো চাড়ও নতুন বউয়ের নেই। দীর্ঘ ইতিহাস সংক্ষেপ করে বলতে গেলে, শ্বশুরবাড়িতে স্বামী এবং দাসী চাকর ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলে না। এই অবস্থাটা অনেক দিন কেটেছে। এই সময়ে ভারতবর্ষ দু টুকরো হয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হল। নতুন বউ স্বামীকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বর্ধমান এবং কলকাতার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে এসে নতুন সংসার পেতে বসেন।

নতুন সংসারে থিতু হয়ে বসার পর মহিলা তাঁর পুত্রকন্যাদের গড়ে তোলায় মনোযোগ দিলেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড ভীতি নিয়ে তিনি এসেছিলেন। দিনাজপুরে বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে অনেক দিন বসবাস কারার পরও সে ভীতি তাঁর পুরোপুরি কাটেনি। সমাজে বাস করতেন বটে, কিন্তু একটা দূরত্ব সব সময় রক্ষা করতেন। সে কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য সব সময় হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করতেন। তা ছাড়া বালিকা বয়সে তাঁর মনে শান্তিনিকেতনে যে সংস্কৃতির রং লেগেছিল, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও তা ফিকে হতে পারেনি। ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো এবং রবীন্দ্রসাহিত্য

পড়ানোর একটা অনমনীয় জেদ মহিলাকে পেয়ে বসে। এই ফাঁক দিয়ে প্রগতিশীল রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টি এসব একেবারে বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তিনি নিজেও এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। মহিলার স্বামী নির্বিরোধ শান্তশিষ্ট মানুষ। সংসারের সাতে পাঁচে থাকেন না। অধিকন্তু মহিলা তাঁর ইচ্ছাশক্তির সবটুকু পরিকল্পনার পেছনে বিনা বাধায় ব্যয় করতে পেরেছিলেন।

তায়েবারা তিন বোন যখন একটু সেয়ানা হয়ে উঠল তিনি তাদের স্থায়ীভাবে ঢাকায় রেখে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদি শেখাবার একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। বিনিময় করে দিনাজপুরে যে ভূসম্পত্তিটুকু পেয়েছিলেন, তার একাংশ বিক্রি করে ঢাকা শহরে গেন্ডারিয়ায় এই ছোট্ট বাড়িটা কিনলেন। বাড়ির পেছনের খালি জায়গাটিতে দুটি কাঠচেরাই কল বসালেন এবং ছোট্ট ছেলেটাকে তার দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। সেই সময়ে ঢাকা শহরে জাহিদুলরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার প্রসার নিয়ে আন্দোলন করছিলেন। এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূত্র ধরেই জাহিদুল এবং রাশেদা খাতুনদের সঙ্গে তায়েবাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। তায়েবার মা তো জাহিদুলদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। এতদিন তিনি মনে মনে এমন সুরুচিসম্পন্ন কাউকে সন্ধান করছিলেন, যার ওপর তাঁর অবর্তমানে মেয়েদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তবোধ করতে পারবেন। একথা মানতেই হবে যে অনেকদিন পর্যন্ত জাহিদুল এবং রাশেদা খাতুনেরা সে দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছিলেন। আমি নিজের চোখেই দেখেছি রাশেদা খাতুন আপন পেটের মেয়েটির চাইতে ডোরার প্রতি অধিক যত্নআত্তি করেছেন। আর জাহিদুল প্রতিদিন তাদের খবরাখবর নিচ্ছেন। কিন্তু নিয়তির কী পরিহাস ! আজ রাশেদা খাতুন আর ডোরা পরস্পরের সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহিদুল ডোরাকে বিয়ে করেছেন। আর জাহিদুলকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে রাশেদা খাতুন শশীভূষণকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন। এই সবকিছুর জন্য কি একটা যুদ্ধই দায়ী ? দেশে যদি স্বাভাবিক জীবনযাপন করত তা হলে এই জীবনগুলো কি এমনভাবে বেঁকে চুরে যেত ? কী জানি জীবন বড় আশ্চর্য জিনিস। জীবনের বিস্ময়ের অন্ত নেই।

এই মহিলা যাঁর পাশে আমি বসে আছি, যাঁর তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে চিন্তার বড় বড় গভীর বলিরেখা পড়েছে, যাঁকে দেখলে সব সময় সিংহীর কথা মনে উদয় হয়েছে, জানিনে তিনি কী ভাবছেন। তিনি সারা জীবন যে সমস্ত বস্তুকে মূল্যবান মনে করে লড়াই করে এসেছেন, সে বিশ্বাসগুলো কি এখনো তাঁর মনে কাজ করে যাচ্ছে ? সমস্ত জীবন ধরে যে অপার আগ্রহ নিয়ে আকাশ দেখবেন বলে অক্লান্ত জঙ্গল কাটার কাজ করেছেন, আজ সেই নীল নির্মেঘ আকাশ থেকে তাঁর মাথায় বজ্র ঝরে পড়ল। তিনি দোষ দেবেন কাকে ? দায়ী করবেন কাকে ? তায়েবার মার পাশাপাশি রিকশা চেপে যাচ্ছি। আমি জানি তিনি আমার কাছে কিছু জিগগেস করবেন না, আমিও কিছু জানতে চাইব না। হঠাৎ গলায় ঘর্ঘর শব্দটি শুনতে

পেলাম। ভদ্রমহিলার হাঁফানি ছিল সেটি জাগতে চাইছে। ভদ্রমহিলা প্রাণপণ শক্তিতে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে বললেন, এই রিকশা বাঁয়ে রোখো। এরই মধ্যে আমরা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এসে পড়েছি। তায়েবার মা আমাকে নিয়ে একটা সেকেলে ধরনের তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাড়িটার গঠনশৈলী দেখে মনে হবে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে যে ধরনের বাড়ি হত এটি তার একটি। প্রকাণ্ড চওড়া দেয়াল। লাল ইটগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। দরোজা জানালাগুলো আকারে আয়তনে বেশ বড়সর। কার্নিসের কাছে দুতিনটে অশ্বত্থ গাছের চারা বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে। কতকাল সংস্কার হয়নি কে জানে।

তায়েবার মা আমাকে বললেন, তুমি এখানে দাঁড়াও আমি ভেতরে যাই। যা বলেছি মনে থাকে যেন। তোমার তো আবার অস্থির মেজাজ। একটু বুঝেশুনে কথাবার্তা বলবে। আমার তো মনে হচ্ছে এখানে আমাকে অনেক দিন থাকতে হবে। মহিলা পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। আমার মনে হল এই বাড়িতে এখনো সদর অন্দর মেনে চলা হয়।

একটু পর বুড়োমতো দাড়িঅলা এক লোক এসে বলল, আপ মেরে সাথ আইয়ে। লোকটির পেছন পেছন আমি তিনতলা দালানের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। ছাদটি অনেক উঁচু। বিরাট বিরাট লোহার বিমের ওপর বসানো রয়েছে ছাদ। দরোজা জানালায় খুব দামি মোটা কাপড়ের পর্দা টাঙানো আছে। কিন্তু সেগুলো এত ময়লা যে দেখতে ইচ্ছে করে না। ঘরে হাল আমলের একজোড়া সোফাসেট আছে বটে কিন্তু না থাকলেই যেন অধিক মানানসই হত। দেয়ালে মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফ, বাগদাদ শরিফ ও আজমির শরিফের ছবি ; মোটা মোটা দামি ফ্রেমে টাঙানো। সোনালি অক্ষরে আরবিতে আল্লার নাম, মুহম্মদের নাম বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত একখানা ইসলামি ক্যালেন্ডার দেয়ালে ঝুলছে। সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হল আমি অন্য একটা জগতে এসে প্রবেশ করেছি। অবাক হয়ে সবকিছু লক্ষ করছি, এই সময়ে খুবই মোলায়েম ভঙ্গিতে সালাম দিয়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। তাকিয়ে দেখলাম, দোহারা চেহারার অত্যন্ত দীর্ঘকায় গৌরকান্তি এক ভদ্রলোক। মুখে অল্প অল্প দাড়ি। হঠাৎ করে দেখলে বাঙালি বলে মনে হতে চায় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, বসেন বসেন, আমি তায়েবার চাচা। আমার নাম আসগর আলী শাহ। বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের মাতৃভাষা বাংলা নয়।

ভদ্রলোক বললেন, ভাবির মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনি কেমন আছেন, তবিয়েত ভালো তো। আমি উপস্থিত মতো কিছু একটা বলে ভদ্রতা রক্ষা করলাম। তার পরে ভদ্রলোক মৃদু হাততালি দিলেন। সেই আগের লোকটি দেখা দিল। তিনি আদেশ দিলেন, মেহমান কি লিয়ে শরবত আওর নাশতা লে আও। কিছুক্ষণ পর লোকটি একটি খাঞ্চায় করে নাস্তা এবং শরবত নিয়ে এল। খাঞ্চাটি রুপোর এবং ওপরে ফুলতোলা কাপড়ের ঢাকনা দেয়া, গেলাসটি মজবুত এবং কারুকাজ করা।

এই বাড়িতে সব কিছুই পুরোনো। এমনকি তায়েবার চাচা যিনি আমার বিপরীতে বসে আছেন, বসনে ভূষণে অপেক্ষাকৃত একালের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক মনে হলেও কোথায় একটা এমন কিছু আছে আমার মনে হতে থাকল ভদ্রলোকের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটা যোগ রয়েছে। ভদ্রলোক সেটা ঢেকে রাখার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করছেন না। সে যাহোক ভদ্রলোক ঢাকনা উঠিয়ে বললেন, নাস্তা নিন। আমি তো দেখে অবাক। পাঁচ ছটা বিরাট বিরাট পরোটা, আবার তার সঙ্গে পেয়ালাভর্তি খাসির মাংস, হালুয়া, শরবত।-এতসব খাব কী করে। পেটে জায়গা থাকতে হবে তো। তা ছাড়া আমি সকালবেলা ডা. মাইতির বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। তিনি বললেন, কিছু মুখে দিয়ে দেখেন। একেবারে না করতে নেই। আমিও বুঝতে পারলাম একবারে না খেলে তিনি খুবই অপমানিত বোধ করবেন। এক টুকরো পরোটা ছিঁড়ে মুখে দিলাম। পরোটা মাংসের স্বাদ পেয়ে মনে হল আমি যে প্রথমে পেটে ক্ষুধা নেই মনে করেছিলাম সেটা সত্যি নয়। দেখতে দেখতে চারটা পরোটা, পেয়ালার সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললাম। সেই লোকটি আমাকে চিলুমচিতে হাত ধুইয়ে দিল। আমি চামচ দিয়ে কেটে কেটে প্লেটের সব হালুয়া খেয়ে শেষ করলাম। ভদ্রলোক একদৃষ্টে এসে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন। হালুয়া খাওয়া শেষ হলে ভদ্রলোক শরবতের গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, শরবত পান করেন। আমি ঢক-ঢক করে শরবতটাও খেয়ে নিলাম। ভদ্রলোক আমার খাওয়ার ধরন দেখে কিছু একটা মনে করেছেন। সেটা আমি বুঝতে পারলাম। আমাকে লজ্জা থেকে উদ্ধার করার জন্যই বললেন, ভাবি বলেছেন, আপনি অনেক এলেমদার মানুষ। অনেক কেতাব লিখেছেন। তা এখন আপনাদের খবর কী ? যুদ্ধ কেমন চলছে ? আমি একটুখানি মুশকিলে পড়ে গেলাম। ভদ্রলোককে কী জবাব দিই। জানতে পেরেছি ভদ্রলোক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী। এই ফ্রি স্কুল এলাকাটিও ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক স্থান। এখানকার কসাইরা ছেচল্লিশে হিন্দু-মুসলমানে রায়টে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এখনো ভারত পাকিস্তানে কোনো ধরনের গোলযোগ হলে এই ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে শহরের রাজপথে পাকিস্তানের সপক্ষে মিছিল বের হয়ে যায়। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সালের সেই বিখ্যাত শ্লোগান : কান মে বিড়ি মুখে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এর রেশ এখানকার মানুষের মন থেকে একেবারে অবসিত হয়ে যায়নি। তথাপি ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করার জন্যে কিছু একটা বলতে হয়। তাই বললাম, সবটা তো আমি জানিনে। তবে নিশ্চিত যে একদিন আমরা জিতব। জিতবেন তো বটে ততে আপনারা নয়, জিতবে হিন্দুস্থান এবং হিন্দুরা। আপনারা তো জানেন না লাখো জান কোরবান করে মুসলমানেরা পাকিস্তান কায়েম করেছে। আর আপনারা সেটা ভেঙে ফেলতে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আমার হাত ধরে বললেন, একটু এদিকে আসুন। তিনি আমাকে জানালার পাশে নিয়ে গেলেন। তারপর একটা একতলা বাড়ির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করে বললেন, ওই যে দেখছেন ওটা আবদুল ওয়াহেদের বাড়ি। আবদুল ওয়াহেদ কে ছিল জানেন ?

জবাবে আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। আপনি আবদুল ওয়াহেদের নাম শুনেননি ? আমি আবার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি দু হাতে তালি দিলেন। সেই বুড়ো লোকটি দেখা দিলে তিনি বললেন, হান্নান সাহেবকো বোলাকে লে আও।

কিছুক্ষণ পর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে সালামালায়কুম দিলেন। ভদ্রলোক বেশ বুড়ো। চোখের ভুরু পর্যন্ত পেকে গেছে। শাহ আসগর আলী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আমাকেও দাঁড়াতে হল। শাহ সাহেব বললেন, ইনি হান্নান সাহেব, আবদুল ওয়াহেদের চাচা। উনার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। তারপর প্রৌঢ় হান্নান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ে জয় বাংলাকা আদমি হ্যায়। তাজ্জব কা বাত হ্যায় ইয়ে কভি আবদুল ওয়াহেদ কো নাম নেহি শুনা।

হান্নান সাহেবের সঙ্গে আমাকে বসিয়ে দিয়ে শাহ আসগর আলী সাহেব কাজের দোহাই দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। হান্নান সাহেব আমার সঙ্গে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতে থাকলেন এই কলকাতা শহরে একসময়ে তাঁরা মিষ্টির দোকানে বসে মিষ্টি খেতে পারতেন না। দোকানের বাইরে মুসলমানদের দাঁড়িয়ে থাকতে হত। ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, তখনো আপনাদের জন্ম হয়নি। সেজন্য পাকিস্তান কী চীজ বুঝতে পারবেন না। আমি বিনীতভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। পাকিস্তান কী বস্তু সে বিষয়ে কিছুটা কঠিন জ্ঞান আমাদের হয়েছে। পাকিস্তানিরা তিরিশ বছর আমাদের উপর শোষণ করেছে। বিগত পঁচিশে মার্চ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তারা আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। স্মৃতিভারাতুর বৃদ্ধকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করিনে কেন, তিনি তার স্মৃতি স্বপ্নের জগৎ থেকে এক তিলও অগ্রসর হতে রাজি নন। ফের তিনি বলে যেতে লাগলেন, জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের ডাক দিয়েছেন, কিছু কিছু এলেমদার মানুষ মুসলিম লীগে যোগ দিতেও আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ কলকাতা শহরে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করবার কোনো লোক ছিল না আমার ভাইপো ওয়াহেদ মিয়া ছাড়া। ওই যে আপনাদের শেখ মুজিব। তিনিও তো আমার ভাইপোর পেছন পেছন ঘোরাফেরা করতেন। তখন টিঙটিঙে ছোকরা শেখ মুজিবকে চিনত কে ? ওয়াহেদের চেষ্টার ফলেই তো তিনি অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস মুসলিম লীগের সামনের কাতারের একজন নেতা বনে গেলেন। ওই যে একতলা বাড়িটা দেখছেন, ওখানে শেখ মুজিব কতদিন কতরাত কাটিয়েছেন। ওই বাড়িতে শুধু শেখ মুজিব কেন, ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী, স্যার নাজিমুদ্দীন, আবুল হাশিম প্রমুখ মুসলিম লীগের বড় বড় নেতারা তশরিফ আনতেন। একবার তো স্বয়ং কায়িদ-ই-আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ অসুস্থ আবদুল ওয়াহেদকে দেখতে এসেছিলেন। আমি অনুভব করতে পারলাম ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাসিন্দাদের চোখে এই বাড়িটা অত্যন্ত পবিত্র। কেননা এই বাড়িতে এমন একজন মানুষের জন্ম হয়েছিল যিনি পাকিস্তান নামক একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে শ্রম, স্বপ্ন সব ব্যয় করে অকালে

প্রাণত্যাগ করেছিলেন। পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি এইসমস্ত লোক এত অনুগত তথাপি তাঁরা অন্যদের মতো পাকিস্তানে বসবাস করতে যাননি কেন ? সত্যিই তো একটা গভীর প্রশ্ন। আমি হান্নান সাহেবকে জিগগেস করলাম, আপনারা পাকিস্তানকে এত ভালোবাসেন, তবু বসবাস করতে পাকিস্তান যাননি কেন ? এই সময়ে তায়েবার চাচা শাহ আসগর আলী ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনিও শুনলেন প্রশ্নটা। জবাবে বললেন, হ্যাঁ এটা একটা কথার মতো কথা বটে। শুরুতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম, কলকাতা পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কলকাতা তো হিন্দুস্থানের অংশ হয়ে গেল। আমরা সাত পাঁচ পুরুষ ধরে এই কলকাতায় মানুষ। এর বাইরে কোথাও যেতে হবে সেকথা চিন্তাও করতে পারিনি। তা ছাড়া আমার মনে বরাবর একটা সন্দেহ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা সত্যিকারের ইসলামি আহকাম মেনে চলে একথা বিশ্বাস করতে মন চাইত না। আমার কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতে গেছেন। তাঁদের চলাফেরা দেখে মনটা দমে গিয়েছিল। দেখেশুনে আমার ধারণা হয়েছিল, তামাম হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা লড়াই করে যে পাকিস্তান কায়েম করেছে এই মানুষগুলো সেই রাষ্ট্রটিকে টিকে থাকতে দেবে না। বাংলা ভাষার নামে কোনো মুসলমান এত হল্লাচিল্লা করতে পারে, তা তো ছিল আমার ধারণার অতীত। বলুন, এসব হিন্দুদের চক্রান্ত নয় ? তখন পাকিস্তান ধ্বংসের আলামত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। হিজরত করতে পারতাম। কিন্তু লাভ হত না। এখন যেমন হিন্দুস্থানে আছি তখনো হিন্দুস্থানে থাকতে হত। আপনাদের বাংলাদেশ তো আরেকটা হিন্দুস্থান হতে যাচ্ছে, সেখানে সত্যিকার মুসলমানের স্থান কোথায় ? এঁদের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। পাকিস্তান কী বস্তু, বাস্তব অর্থে তার কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা এঁদের নেই। এঁরা আছেন তাঁদের স্বপ্ন এবং স্মৃতির জগতে। যেহেতু তাঁরা মনের থেকে হিন্দুদের ঘৃণা করেন, সেজন্য তাঁদের একটা কল্পস্বর্গের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশের চিন্তাভাবনা এই একই রকম। তাঁরা ভারতে বসবাস করবেন, কিন্তু মনে মনে চাইবেন পাকিস্তানটা টিকে থাকুক। আমি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে তায়েবার চাচার বাড়িতে এসেছি কোনো বিষয়ে বিতর্ক করার জন্য নয়। এ ব্যাপারে তায়েবার মা আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং শাহ আসগর আলী এবং হান্নান সাহেব পাকিস্তানের পক্ষে যা বললেন, হাঁ হাঁ করে শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে পালিয়ে আসি। কিন্তু পারছিলাম না তায়েবার মার কথা ভেবে। যেখানে আমার একদণ্ড অপেক্ষা করতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে সেই পরিবেশে এই মহিলা কী করে দিবস-রজনী যাপন করছেন, সে কথা চিন্তা করে চুপ করে রইলাম। এই পুঁতিগন্ধময় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহিলা সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে স্বেচ্ছায় এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে অগাধ অটুট বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য ভিন্নরকমের একটা সুন্দর জীবন নির্মাণ করতে

পারবেন। সামাজিক আচার সংস্কার দু পায়ে দলে যা শ্রেয় উজ্জ্বল সুন্দর বলে মনে হয়েছে সেদিকে সমস্ত কর্মশক্তিকে ধাবিত করেছেন। আজকে আবার তাঁকে সেই বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। এ যেন বয়ঙ্ক সন্তানের মাতৃগর্ভে ফিরে যাওয়ার মতো ব্যাপার। যে অবস্থায় তিনি এই বাড়ি, এই আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেই বাড়ির অবস্থা এখনও তেমনই আছে; তিল পরিমাণ পরিবর্তন হয়নি। আত্মীয়স্বজনেরা সেই স্মৃতি স্বপ্নের জগতে বসবাস করছেন। মাঝখানের তিরিশটি বছর যেন কিছু নয়। চেষ্টা করলে তিনি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে পারতেন। এ বাড়িতে কেন উঠলেন তা আমার বোধবুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। আমি বাইরের মানুষ। আমার কাছে এঁরা যেভাবে কথাবার্তা বললেন, তার মধ্যে গভীর একটা ঘৃণার রেশ রয়েছে। মহিলা কি উঠতে বসতে প্রতিনিয়ত আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হচ্ছেন না? এইসব কথা ঢেউ দিয়ে মনে মনে বারবার জেগে উঠছিল। তায়েবার মা আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, নিশ্চয়ই তাঁর কোনো উদ্দেশ্য আছে।

অনেক বথাবার্তার পর শাহ আসগর এবং হান্নান সাহেব আমাকে রেহাই দিলেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠে যাওয়ার সময় শাহসাহেব বললেন, আপনি আরাম করে বসুন। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। ভাবি সাহেবা বোধাকরি আপনার সঙ্গে কী আলাপ করবেন। উনারা চলে গেলে তায়েবার মা ঘরে প্রবেশ করে আমার মাথায় হাত দিয়ে জিগগেস করলেন, কী বাবা দানিয়েল, তোমার কি খুব খারাপ লেগেছে? এঁরা এরকমই সেকথা তো তোমাকে আগে বলেছি। আশা করি আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা হয়েছে। আমি ঈষৎ হাসলাম। তিনি আমার উল্টোদিকে বসলেন। তারপর ঠোঁট ফাঁক করে একটুখানি হাসবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাসিটা ভারি মলিন দেখাল। তিনি বললেন, তোমাকে বাবা ডেকে এনেছি একটু কথাবার্তা বলার জন্য। দেখছনা চারপাশে কেমন দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। কথা না বলে বলে ভীষণ হাঁফিয়ে উঠেছি। এভাবে কিছুদিন থাকলে, আমি নিজেও অসুখে পড়ে যাব। এখন যে এখানে সেখানে অল্প-স্বল্প হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি সেটিও আর সম্ভব হবে না। আসলে মহিলা কোন কথাটির অবতারণা করতে যাচ্ছেন সেটি আমি অনুমান করতে চাইলাম। আমি জানতাম তাঁর স্বভাব বড় চাপা। খুব প্রয়োজন না হলে মনের কথা কখনো মুখে প্রকাশ করবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে চাইলেন, আমি কলকাতা এসেছি কবে এবং চট্টগ্রামে আমার মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কোনো বিপদ হয়েছে কি না। তারপর তিনি এদিক ওদিক ভালো করে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, তায়েবার অসুখটা কী জান? আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ জানি। তিনি এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। ডোরার খবরও কি পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ পেয়েছি। মহিলা বললেন, আমার হয়েছে কী বাবা জান চারদিক থেকে বিপদ। কাউকে কইতেও পারছিনে আবার সইতেও পারছিনে। জাহিদুলটা এমন একটা কাণ্ড ঘটাবে তা আমি কখনো বিশ্বাসই করতে পারিনি। তার

সততা এবং ভালমানুষির ওপর আমি বড় বেশি নির্ভর করেছিলাম। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন। তিনি আবার জিগগেস করলেন, হেনার খবর শুনেছ কিছু? বললাম, হেনাভাই সম্পর্কে আমি কিছু জানিনে। আজ সকালে হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। জান হেনা একটা বিয়ে করে ফেলেছে? আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এরই মধ্যে হেনাভাই আবার বিয়ে করে ফেললেন? মনের ঝাঁঝ কথার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। চেপে রাখতে পারলাম না। আমার মনোভাব টের পেয়ে মহিলা হেনা ভাইয়ের পক্ষ সমর্থন করেই বললেন, বিয়েটা করে হেনা মানুষের পরিচয় দিয়েছে। মেয়েটির স্বামীকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। কচি মেয়ে কোথায় যাবে? তাই বিয়ে করে এখানে নিয়ে এসেছে এবং বালুহাক্কাক লেনে আলাদা বাসা করে থাকছে। আমি মনে করি হেনা আরো কিছুকাল পর বিয়েটা করলে শোভন হত। কী করব, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে কি আর মা-বাবার কথার বাধ্য থাকে! আমার হয়েছে কী বাবা জান সমূহ বিপদ। কোথাও গিয়ে শান্তি পাইনে। মনে সর্বক্ষণ একটা উথালপাথাল ঝড় বইছে। দুদণ্ড স্থির হয়ে বসব সে উপায় নেই। এরই মধ্যে আবার হাঁপানির জোরটা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। আমার বড় মেয়েটি, যে ছিল আমার সব রকমের ভরসার স্থল, এখন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আমার বুকে ভীষণ ব্যথা, ভীষণ জ্বালা। কোথায় যাব, কী করব পথ খুঁজে পাচ্ছিনে। ভদ্রমহিলার দুচোখ ফেটে ঝরঝর করে পানি বেরিয়ে এল। বুকটা কামারের হাপরের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মাত্র অল্পক্ষণ। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতাসহকারে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে বসলেন। আশ্চর্য সংযম ভদ্রমহিলার। স্বাভাবিক কণ্ঠে নীচু স্বরে বললেন, লোকে মনে করতে পারে এই ছেলেমেয়েরা আমার গর্ভের কলঙ্ক। কিন্তু মায়ের কাছে ছেলেমেয়ে তো ছেলেমেয়েই। তারা যত ভুলই করুক আমি কিছু মনে করিনে। কথাগুলো নিজেকে না আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, বুঝতে পারলাম না।

মহিলা আমার আরো কাছে ঘেঁষে এলেন। আমার হাত দুটি ধরে বললেন, বাবা আমার একটি অনুরোধ রাখবে? আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, আগে কথা দাও রাখবে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। তোমার প্রতি তায়েবার একটা অন্ধ আকর্ষণ আছে। তুমি হাসপাতালে তাকে দেখতে এলে সে বড় খুশি হয়। তোমরাও খুব সুখে নেই জানি। তবু সময় করে যদি একটু ঘনঘন দেখতে যাও—বলো মায়ের এই অনুরোধটা রক্ষা করবে? জবাব দিতে গিয়ে আমার চোখে পানি বেরিয়ে গেল। তিনিও আমার মাথাটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেললেন। আমরা দুজন দুজনকে বুঝতে পেরেছি। তবু আমি আমতা আমতা করে বললাম, কেউ যদি কিছু মনে করে। আমি হাসপাতালে যাই ওটা অনেকে সুনজরে দেখেন না। কারো মনে করাকরি নিয়ে বাবা কিছু আসে যায় না। আমি ও আমার মেয়ে, সেটা আমি বুঝব। আমাদের সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শেষ করে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে হল মধ্যযুগীয় অন্ধকার গুহা থেকে মুক্তি পেলাম।

আট

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে বৌবাজারের হোস্টেলে এসে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের মধ্যেই মাদুর বিছিয়ে খাওয়াদাওয়া চলছে। খাসির মাংস, ভাত, ডাল, সব দোকান থেকে আনা হয়েছে। খেতে বসেছেন নরেশদা, খুরশিদ, মাসুম, বিপ্লব এবং অপর একজন, যাঁকে আমি চিনিনে। বয়স তিরিশ টিরিশ হবে, গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে উনি কোনো ক্যাম্প থেকে এসে থাকবেন। খুরশিদই পরিচয় করিয়ে দিল, ক্যাপ্টেন হাসান। মুর্শিদাবাদের লালগোলার কাছাকাছি একটি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসেছেন। উনারা খেতে বসেছেন, হ্যান্ডশেক করার উপায় ছিল না। একটা ব্যাপার আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি। বাংলাদেশ থেকে যত মানুষ কলকাতায় এসেছে, তাদের একটা অংশ কী করে জানিনে আমাদের এই আস্তানাটা, শিগগির কি বিলম্বে চিনে ফেলেছে। আমাদের সঙ্গে কী করে জানিনে নানা জাতের, নানা পেশার অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাদের মধ্যে গায়ক আছে, অ্যাকটর আছে, সাংবাদিক, শিল্পী, ভবঘুরে বেকার, পেশাদার লুচ্চা, বদমায়েশ, চোরছ্যাঁচড়ও আছে। সকলের একটাই পরিচয়, আমরা বাংলাদেশের মানুষ। এই সময়ের মধ্যে আমাদের আস্তানাটির কথা গোটা কলকাতা শহরে প্রচার হয়ে গেছে। আমরা সব ভাসমান কর্মহীন মানুষ। একে অপরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করি। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাবে না তো কোথায় যাবে। তার পরেও খুরশিদের কৃতিত্বটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রায় প্রতিদিন নিত্যনতুন মানুষকে এই হোস্টেলে নিয়ে আসার কৃতিত্ব মুখ্যাত খুরশিদের। সে বাইরে বড় গলা করে নিজেকে আওয়ামী লীগের লোক বলে ঘোষণা করে। পেছনে অবশ্য কারণও আছে। আওয়ামী লীগের ছোট বড় মাঝারি নেতাদের অনেককেই খুরশিদ চেনে এবং তাঁরাও খুরশিদকে চেনেন। পারতপক্ষে তাকে তাঁরা এড়িয়েও চলেন। তাই কার্যত খুরশিদ আমাদের ডেরায় এসে তার আওয়ামী লীগত্ব জাহির করে। আজকের ক্যাপ্টেন হাসান ভদ্রলোককেও নিশ্চয়ই খুরশিদ নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। এতসব খাবারদাবারের আয়োজন, পয়সাটা এসেছে কোত্থেকে। নির্ঘাত টাকাটা ক্যাপ্টেনের পকেট থেকে গেছে এবং এতে খুরশিদের শিল্পকলার সামান্য অবদান থাকা বিচিত্র নয়।

নরেশদা বললেন, কাপড়চোপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে তুইও বসে যা। যা খাবার আছে, তাতে আরো দুজনের হয়ে যাবে। আমি মুখ হাত ধুয়ে এসে খেতে বসে গেলাম। আজ খুরশিদের মেজাজটি ভয়ঙ্কর রকম উষ্ণ হয়ে আছে। এমনিতেও উত্তেজনা ছাড়া খুরশিদের জীবনধারণ একরকম অসম্ভব। একটা না একটা ঝগড়া বিবাদের বিষয়বস্তু খুঁজে আবিষ্কার করতে তার কোনো জুড়ি নেই। আজকে তার অসন্তোষটা অন্যান্য দিনের চাইতে পরিমাণে অনেক অধিক। আমি তাই কৌতূহলী হয়ে জিগগেস করলাম, খুরশিদ আজ তোমার আলোচ্য বিষয়সূচি কী ? নরেশদা জবাব দিলেন, খোন্দকার মুশতাক আহমেদ। মুশতাকের মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষও

তোমার আলোচনার বিষয় হতে পারে, এ তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি। হলই বা ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ মন্ত্রী। আমি তো তোমাকে আরো ওপরের তরিকার মানুষ বলে মনে করতাম।

আমার কথায় খুরশিদের মেজাজের কোনো পরিবর্তন হল না। সে প্রায় ধমক দেয়ার সুরে বলল, আরে মশায় শুনবেন তো শালার ব্যাটা শালা, নেড়ি কুত্তার বাচ্চা কী কাণ্ডটা করে বসে আছে। এইখানে এই কলকাতায় বসে বসে বেটা হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে এতকাল যোগাযোগ করে আসছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে ভান করে মুক্তিসংগ্রামকে পেছন থেকে ছুরিকাহত করাই ছিল তার প্ল্যান। তলায় তলায় আমেরিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করছিল। শালা, মেনি বিড়াল কোথাকার। ফন্দি টন্দি এঁটে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার নাম করে ভারত থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ঝুলির ভেতর থেকে সবগুলো বিড়াল বের করবে এটাই ছিল তার ইচ্ছা। মাঝখানে ভারতের ইনটিলিজেন্স তার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা উদঘাটন করে ফেলেছে। তাজুদ্দীন তার নিউইয়র্কে যাওয়া আটকে দিয়েছেন। তাজুদ্দীনকে যতই অপবাদ দিক আসলে কিন্তু মানুষটা খাঁটি। দেশের প্রতি টান আছে।

ক্যাপ্টেন হাসান হাত ধুয়ে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, তাজুদ্দীন বলুন, মুশতাক বলুন থিয়েটার রোডে যারা বসে তারা সকলে একইরকম। নিজেদের মধ্যে দলাদলি করছে, সর্বক্ষণ একজন আরেকজনকে ল্যাং মারার তালে আছে। দেখেছেন একেক জনের চেহারার কেমন খোলতাই হয়েছে। খাচ্ছে দাচ্ছে, আমোদ ফুর্তি করছে। সবাই তোফা আরামে আছে। যুদ্ধটা কী করে চলছে সেদিকে কারো কি কোনো খেয়াল আছে? কেউ কি কখনো একবার গিয়ে দেখেছে ক্যাম্পগুলোর কী অবস্থা? সাহেব, আমরা যে অবস্থায় এখন থাকছি, বনের পশুও সে অবস্থায় পড়লে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। আমাদেরকে বলা হয়েছে যুদ্ধ করো। কিন্তু কী দিয়ে যুদ্ধ করবে আমাদের ছেলেরা? শুধু হ্যান্ডগ্রেনেড দিয়ে কি পাকিস্তানি সৈন্যের দূরপাল্লার কামানের সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায়? আমরা প্ল্যান করি ভারতীয়রা সে প্ল্যান নাকচ করে। নালিশ করে প্রতিকারের কথা দূরে থাকুক, কোনো উত্তর পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমরা ছেলেদের সব জেনেশুনে প্রতিদিন আত্মহত্যা করতে পাঠাচ্ছি। একেকটা সামান্য অস্ত্র জোগাড় করতেও প্রতিদিন কত দুয়ারে ধন্না দিতে হয়। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর দুঃখ হয়, এত কষ্ট করে আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে কেন মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে এখানে এলাম। ক্যাম্পে থাকলে তবু ভালো থাকি। ছেলেদের সঙ্গে একরকম দিন কেটে যায়। কিন্তু কলকাতা এলে মাথায় খুন চেপে বসে। ইচ্ছে জাগে এই ফর্সা কাপড় পরা তথাকথিত নেতাদের সবকটাকে গুলি করে হত্যা করি। এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। একদিন আমরা দেশে ফিরে যাব। তখন এই সবকটা বানচোতকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে মারব। দেখি কোন বাপ সেদিন তাদের উদ্ধার করে। কলকাতায় নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পোলাও কোর্মা খাওয়ার মজা ভালো করে দেখিয়ে দেব। ক্যাপ্টেন হাসান চেয়ারের হাতলে

তোয়ালেখানা রেখে পকেট থেকে ইন্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন এবং নরেশদাকে একটা দিলেন।

থিয়েটার রোডের লোকদের বিরুদ্ধে এসব নালিশ নতুন নয়। সবাই নালিশ করে। কিন্তু তাদের করবার ক্ষমতা কতদূর তা নিয়ে কেউ বিশেষ চিন্তাভাবনা করে বলে মনে হয় না। আমি মনে মনে তাজুদ্দীনের তারিফ করি। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। আমার বিশ্বাস সবদিক চিন্তা করে দেখার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি কতদূর কী করবেন। আওয়ামী লীগারদের মধ্যে অনেকগুলো উপদল। ভারত সরকার সবকটা উপদলকে হাতে রাখার চেষ্টা করছে। আবার তাদের অনেকেই তাজুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। পাকিস্তানি এবং আমেরিকান গুপ্তচরেরা এখানে ওখানে ফাঁদ পেতে রেখেছে। তাদের খপ্পরে আওয়ামী লীগারদের একটা অংশ যে পড়ছে না, একথাও সত্যি নয়। এই প্রবাসে অন্য একটি সরকারের দয়ার ওপর নির্ভর করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। ভারত সরকারের মর্জি মেজাজ যেমন মেনে চলতে হয়, তেমনি অজস্র উপদলীয় কোন্দলের মধ্যে একটা সমঝোতাও রক্ষা করতে হয়। ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞদের আবার একেকজনের একেক মত। কেউ মনে করেন এদলকে হাতে রাখলে ভালো হবে। আবার আরেকজন মনে করেন, আখেরে এই উপদলের টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। সুতরাং অন্য দলটিকে ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সা দিলে উপকার হবে। দেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুত অবস্থায় সবকটি উপদলই মনে করছে তারাই প্রকৃত ক্ষমতার দাবিদার। কোনো নেতা ক্ষমতা দাবি করছেন, কেননা তিনি শেখ মুজিবের আত্মীয়। আরেক নেতা ক্ষমতা দাবি করছেন, কারণ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয়স্বজনদের দুচোখে দেখতে পারেন না। হয়তো আরেক নেতা মনে মনে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতা করেন বলেই ক্ষমতা অধিকার করতে চান। ধৈর্য ধরে সবকিছু দেখে যাওয়া ছাড়া তাজুদ্দীনের করবার কী আছে?

সবাই মুখহাত ধুয়ে বসে বসে পান চিবুচ্ছি। এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে মাসুম ঘরে প্রবেশ করে বলল, নরেশদা, দানিয়েল ভাই শিগগির চলুন রেজোয়ান আত্মহত্যা করেছে। মাসুমের মুখে সংবাদটি শুনে আমরা সকলেই অভিভূত হয়ে গেলাম। দুচারদিন আগেও আমাদের আড্ডায় এসেছিল, ফর্সাপানা, সুন্দর চেহারার লিকলিকে ছেলেটি। নিজে সর্বক্ষণ হাসত এবং সর্বক্ষণ অপরকে হাসাত। সব সময়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা নবদ্বীপ হালদারের কমিক মুখস্ত বলত। এই যুদ্ধ, দেশত্যাগ, খুন, জখম, বীভৎসতা কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, মানুষ এত হাসে কেমন করে? স্বীকার করতে আপত্তি নেই রেজোয়ানের প্রতি মনের কোণে একটুখানি বিদ্বেষ পুষে রাখতাম।

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটি কেটে গেলে মাসুমের মুখে রেজোয়ানের আত্মহত্যার কারণটা জানতে পারলাম। কিছুদিন আগে রেজোয়ানদের আড্ডায় কুমিল্লা থেকে

মজিদ বলে আরেকটি ছেলে আসে। রেজোয়ানরা থাকত রিপন স্ট্রিটে। মজিদ আর রেজোয়ান দুজনেই কুমিল্লার কান্দিরপাড় এলাকার একই পাড়ার ছেলে। মজিদ কলকাতা এসে সকলের কাছে রটিয়ে দেয় যে রেজোয়ানের যে বোনটি উম্যান্স কলেজের প্রিন্সিপাল সে একজন পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করে ফেলেছে। এই সংবাদটা পাওয়ার পর রেজোয়ান দুদিন ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে। কারো সঙ্গে একদম কথাবার্তা বলেনি। অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। অবশেষে রাত্রিবেলা ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সকালে সে বিছানা ছেড়ে উঠছে না দেখে রুমের অন্যান্যরা ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে দেখে মরে শক্ত হয়ে গিয়েছে। আর মুখের লালা পড়ে বালিশ ভিজে গেছে। তার মাথার কাছে পাওয়া গেল একটি চিরকুট। তাতে লিখে রেখেছে, বড় আপা যাকে আমি বিশ্বাস করতাম সবচাইতে বেশি, সে একজন পাকিস্তানি মেজরের স্ত্রী হিসেবে, তার সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমোচ্ছে একথা আমি চিন্তা করতে পারিনে। দেশে থাকলে বড় আপা এবং মেজরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতাম। এখন আমি ভারতে। সুতরাং সে উপায় নেই। অথচ প্রতিশোধ স্পৃহায় আমায় রক্ত এত পাগল হয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত নিজেকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেই। যার আপন মায়ের পেটের বোন দেশের চরমতম দুর্দিনে, দেশের শত্রুকে বিয়ে করে তার সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করতে পারে, তেমন ভাইয়ের বেঁচে থেকে লাভ কী? কী করে আমি দেশের মানুষের সামনে কলঙ্কিত কালো মুখ দেখাব। আমার মতো হতভাগ্যের বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। সকলকে কষ্ট দিতে হল বলে আমি দুঃখিত এবং সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ইতি রেজোয়ান।

শুনেই আমি, নরেশদা এবং খুরশিদ রিপন স্ট্রিটে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে শুনি রেজোয়ানের লাশ থানায় নিয়ে গেছে। অগত্যা থানায় যেতে হল। ময়না তদন্ত ছাড়া লাশ বের করে আনতে কম হ্যাঙ্গাম হুজ্জুত পোহাতে হল না। এতে সমস্যার শেষ নয়। তার পরেও আছে কবর দেয়ার প্রশ্নটি। আমরা কলকাতা শহরে সবাই ভাসমান মানুষ। মৃত ব্যক্তিকে এখানে কোথায় কবর দিতে হয়, কী করে কবর দিতে হয়, এসব হাজারটা কায়দা কানুনের কিছুই আমরা জানিনে। তা ছাড়া আমাদের সকলের পকেট একেবারে শূন্য। টাকা থাকলে বুকে একটা জোর থাকে। সেটাও আমাদের নেই। কী করি। আমাদের একজন ছুটল কাকাবাবু মুজফফর আহমদের কাছে। তিনি নিজে অসুস্থ মানুষ। তাঁকে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। তিনি একসময়ে বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন, এই দাবিতে আমরা সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পেতেছি। তিনি সাধ্যমতো আমাদের দাবি পূরণ করেছেন। এইরকম একটা ব্যাপার নিয়ে তাঁকে বিব্রত করা ঠিক হবে কি না এ নিয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। তবু তাঁর কাছে যেতে হল। তিনি তাঁর পার্টির একজন মানুষকে বলে গোবরা কবরস্থানে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার পরেও আমাদের টাকার প্রয়োজন। লাশকে গোসল দিতে হবে, কাফন কিনতে হবে, কবর

খুঁড়তে হবে, কবরস্থানে নিয়ে যেতে হবে, জানাজা পড়াতে হবে—এ সবের প্রত্যেকটির জন্য টাকার প্রয়োজন টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। আমাদের আরেকজন ছুটল প্রিন্সেপ স্ট্রিটে অধ্যাপক ইউসুফ আলির কাছে। তিনি আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তা হলেও আমাদের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে। ইচ্ছে করলে তিনি টাকাটা ম্যানেজ করে দিতে পারেন। আমাদের অনুমানই সত্য হল। ইউসুফ সাহেব কাফন-দাফনের টাকাটা ব্যবস্থা করলেন। ক্ষেত্রবিশেষে জীবিত মানুষের চাইতে মৃত মানুষের দাবি অধিক শক্তিশালী।

রেজোয়ানকে গোসল ইত্যাদি করিয়ে কবর দিতে দিতে সন্ধে হয়ে গেল। আমার ধারণা হয়েছিল মৃত্যু আর আমাকে বিচলিত করে না। পঁচিশে মার্চের পর থেকে ভারতে আসার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যু তো কম দেখিনি। আমি নীলক্ষেত দেখেছি, রাজারবাগ দেখেছি, শাঁখারি বাজার দেখেছি। আমার নিজের কানের পাশ দিয়েও পাকিস্তানি সৈন্যের রাইফেলের গুলি হিস হিস করে চলে গেছে। কিন্তু রেজোয়ানের মৃত্যুটি একেবারে অন্যরকম। আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়ে দিয়ে গেছে। যার বোন পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করেছে, তাকে হত্যা করতে হয়। যদি হত্যা করা সম্ভব না হয় তা হলে নিজেকেই হত্যা করতে হয়। সেদিন আমাদের সকলের হৃদয় এমন গভীর বিষাদে ভারাক্রান্ত ছিল যে কেউ কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারিনি।

রেজোয়ানকে কবর দিয়ে সকলে চলে এল। আমার সকলের সঙ্গে ফিরতে ইচ্ছে হল না। নরেশদা বললেন, কী রে দানিয়েল যাবিনে। আমি বললাম, আপনারা যান আমি পরে আসছি। সকলের অন্তঃকরণ গভীর ভাবাবেগে পরিপূর্ণ। কেউ কাউকে টেনে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা ছিল না। আমি রেজোয়ানের কাঁচা কবরের কাছে ছাতাধরা একটি পাথরের বেঞ্চির ওপর বসে রইলাম। চারপাশে সার সার কবর। গোবরা কবরস্থানে চারদিক থেকে চরাচরপ্লাবী অন্ধকার নেমে আসছে। হাজার হাজার মৃত মানুষ ঘুমিয়ে আছে। আমি একা হাতের ওপর মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছি। কেবল কেয়ারটেকারের কুকুরটি অদূরে দুপায়ের ওপর বসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। বোধ করি ভাবছে কবরস্থানে এই ভর সন্ধ্যায় জীবিত মানুষ কেন?

মানুষের জীবন-মৃত্যু এসব ছায়াবাজির খেলা বলে মনে হল। নিজের অস্তিত্বটাও অর্থহীন প্রতীয়মান হল। আকাশে ছায়াপথে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে। এই অনাদি অসীম বিশাল বিপুল ব্রহ্মাণ্ড, তার মধ্যে মানুষ এবং মানুষের পৃথিবীর গুরুত্ব কতটুকু। আমার আগে পৃথিবীতে কত মানুষ এসেছে, তারা কত কী কাজ করেছে, চিন্তা করেছে, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, তারপরে সকলে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। মানুষের সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ববিবাদ ওই সুদূরের তারকারাজি অনাদিকাল থেকে সবকিছু মুগ্ধ চোখে দেখে আসছে। আমি যেন মৃত মানুষদের চুপিচুপি সংলাপ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাদের অতিশপ্ত কামনা বাসনার ঢেউ যেন আমার বুকে এসে আছড়ে পড়ছে। কেবল রেজোয়ানের কাঁচা কবরটির অস্তিত্ব কাঁটার মতো যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

ছেলেটা দুদিন আগেও আমাদের সঙ্গে হাঁটাচলা করেছে। অবিশ্রাম হেসেছে, অপরকে হাসিয়েছে। এত সকালে তার মরার কথা নয়। বাংলাদেশের যুদ্ধটা না লাগলে হয়তো ছেলেটাকে এমন অকালে মরতে হত না। আমার মগজের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বদলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের যুদ্ধটা চক্কর দিতে লাগল। বড় ভাগ্যহীন এই বাঙালি মুসলমান জাতটা। আবহমানকাল থেকে তারা ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। সেই হিন্দু আমল, বৌদ্ধ আমল, এমনকি মুসলিম আমলেও তারা ছিল একেবারে ইতিহাসের তলায়। এই সংখ্যাগুরু মানবমণ্ডলী কখনো প্রাণশক্তির তোড়ে সামনের দিকের নির্মোক ফাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। যুগের পর যুগ গেছে, তাদের বুকের ওপর দিয়ে ইতিহাসের চাকা ঘরঘর শব্দ তুলে চলে গেছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। রেজোয়ান ছেলেটা যে অকালে মারা পড়ল তার মধ্যে ইতিহাসের দায়শোধের একটা ব্যাপার যেন আছে!

বাঙালি মুসলমানেরাই প্রথম পাকিস্তান চেয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, সীমান্ত প্রদেশ কোথায় লোকে পাকিস্তানের কথা বলত। জিন্নাহ সাহেব বাংলার সমর্থন এবং আবেগের ওপর নির্ভর করেই তো অপর প্রদেশগুলোকে নিজের কবজায় এনেছিলেন। যে বাঙালি মুসলমানদের অকুণ্ঠ আত্মদানে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, সেই পাকিস্তানই তিরিশ বছর বুকের ওপর বসে তাদের ধর্ষণ করেছে। একটা জাতি এতবড় একটা ভুল করতে পারে? কোথায় জানি একটা গড়বড়, একটা গোঁজামিল আছে। আমরা সকলে সেই গোঁজামিলটাই ব্যক্তিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অদ্যাবধি বহন করে চলেছি। পাকিস্তানের গণপরিষদে তো পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাভাষার দাবিটি তো তাঁরা সমর্থন করতে পারতেন। হলেনই বা মুসলিম লীগার। তবু তাঁরা কি এদেশের মানুষ ছিলেন না? তাঁদের সাতপুরুষ বাংলার জলহাওয়াতে জীবনধারণ করেননি? তবু কেন, বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের ছাত্র তরুণদের প্রাণ দিতে হল? পূর্বপুরুষদের ভুল এবং ইতিহাসের তামাদি শোধ করার জন্য কি এই জাতিটির জন্ম হয়েছে?

উনিশশো আটচল্লিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত এই জাতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আর চূড়ান্ত মুহূর্তটিতে আমাদের সবাইকে দেশ ও গ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে। আমাদের হাতে সময় ছিল, সুযোগ ছিল। কোলাহল আর চীৎকার করেই আমরা সে সুযোগ এবং সময়ের অপব্যবহার করেছি। পাকিস্তানের কর্তাদের আমরা আমাদের বোকা বানাতে সুযোগ দিয়েছি। তারা সৈন্য এনে ক্যান্টনমেন্টগুলো ভরিয়ে ফেলেছে এবং সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। হয়তো যুদ্ধ একদিন শেষ হবে, তারপর কী হবে? আমাদের যুদ্ধটা ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মন বলছে পাকিস্তান হারবে, হারতে বাধ্য। কিন্তু আমরা কী

পাব ? ইতিহাসের যে গোঁজামিল আমরা বংশপরম্পরা রক্তধারার মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছি তার কি কোনো সমাধান হবে ? কে জানে কী আছে ভবিষ্যতে।

ঢেউ দিয়ে একটা চিন্তা মনে জাগল। যা-ই ঘটুক না কেন আমরা বাঙালি হওয়া ছাড়া উপায় কী ? আর কী আমি হতে পারি ? দুনিয়ায় কোন জাতিটি আমাকে গ্রহণ করবে। গোরস্থানের কেয়ারটেকার এসে বলল, দশটা বেজে গেছে। এখখুনি গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং আমাকেও চলে আসতে হল।

তার পরের দিন আমার পক্ষে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পয়সার ধান্ধায় কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছুটে বেড়াতে হয়েছে। তা ছাড়া একসঙ্গে আমরা অনেক মানুষ থাকি। যৌথ জীবনযাপনের নানা সদস্যা তো আছেই। আমাদের কাজ নেই, কর্ম নেই তবু জীবন প্রতিনিয়ত সমস্যার সৃষ্টি করে যায়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বচসা, অভিমান এসব তো লেগেই আছে। সেসবের ফিরিস্তি দিয়ে বিশেষ লাভ হবে না।

রোববার দিনটিতে আমি সন্ধের একটু আগেই হাসপাতালে গেলাম। গিয়ে দেখি জমজমাট ব্যাপার। ডোরা এসেছে, দোলা এসেছে, তায়েবার মাও এসেছেন। আর তায়েবা বালিশ হেলান দিয়ে বসে অর্চনার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। আজকে তায়েবাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। চমৎকার একটা ধোয়া সাদা শাড়ি পরেছে। খোঁপায় বেলি ফুলের মালা জড়িয়েছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল গেন্ডারিয়ার বাড়িতে আনন্দঘন সময় কাটাচ্ছে। আমাকে প্রথম দেখতে পেল অর্চনা। সে কলকল করে উঠল, এই যে দানিয়েল, কাল থেকে টিকিটিরও দেখা নেই কেন। আমি হেসে বললাম, আটকে গিয়েছিলাম। তায়েবাদি হাসপাতালে, আর তুমি গা ঢাকা দিয়ে আছ। আমি জিগগেস করলাম, অর্চনা তুমি কালও এসেছিলে নাকি ? অর্চনাদি কালও এসেছিলেন এবং অর্ধেক দিন আমার সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন। আজকে আমার জন্য বেলি ফুলের মালা নিয়ে এসেছেন। খোঁপা থেকে মালাটা খুলে হাতে নিয়ে দেখাল। কী ভালো অর্চনাদি ! তার সঙ্গে কথা বললে মনটা একেবারে হাল্কা হয়ে যায়। অর্চনা কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, বাজে বকো না তায়েবাদি, তোমার মতো এত প্রাণখোলা মেয়ে এতদিন হাসপাতালে পড়ে আছ এখবর আমি আগে পাইনি কেন ? দু মহিলার এই পারস্পরিক প্রস্তুতি বিনিময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হল। তায়েবার মা আমার কাছে জানতে চাইলেন, বাবা দানিয়েল, কাল কি তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছিল। তোমাকে খুব দুর্বল এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, না আমি সুস্থই ছিলাম। তা হলে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন। মা তুমি যেন একটা কী ! মনে করতে চেষ্টা করো, তাঁকে কখন তুমি সুস্থ মানুষের মতো দেখেছিলে। সব সময় তো একই রকম দেখে আসছি। গোসল করবে না, জামাকাপড় পরিষ্কার রাখবে না, দাড়ি কাটবে না আর এমন একটা মেকআপ করে থাকবেন, দেখলে মনে হবে রোগী অথবা সাত জন, পাঁচ জনে ধরে কিলিয়েছে। কথা বলা অবান্তর। এই নালিশটি

তায়েবা আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই করে আসছে। তায়েবার কথা শুনে ডোরা খিলখিল করে হেসে উঠল ডোরার এই হাসিটিও আমার পরিচিত। গেন্ডারিয়ার বাসায় তায়েবা অপরিচ্ছন্ন থাকার অনুযোগ করলেই ডোরা এমন করে হেসে উঠত। আশ্চর্য ডোরা আজও তেমন করে নির্মলভাবে হাসতে পারে ? নানা অঘটন ঘটে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে, সকলে ঠিক আগের মতোই আছে। কিন্তু আমি একা বদলে যাচ্ছি কেন ? বোধ করি মানুষের ভালো মন্দ সবকিছুর বিচারক সেজে বসি বলেই কী আমার এ দুরবস্থা। মানুষের কৃতকর্মের বিচারক সেজে বসার আমার কী অধিকার ? তায়েবার মা কথা বললেন, কী বাবা হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেলে কেন ? ডোরা ফোড়ন কেটে বলল, একটুখানি গম্ভীর না দেখালে লোকে ইন্টেলেকচুয়াল বলবে কী করে ? কথাটা তায়েবার, ডোরা ধার করে বলল। কলকাতা এসে দেখেছি ডোরার মুখ খুলে গেছে। সে কায়দা করে কথা বলতে শিখে গেছে। এবার দোলা মুখ খুলল। বেচারিকে তোমরা ক্ষেপাচ্ছ কেন ? আসলে দানিয়েল ভাই খুব সরল সহজ ভালো মানুষ। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় নাক সিধে চলেন, ডানে বামে তাকান না। তাঁর দোষ ঐ একটাই, তিনি রসিকতা বোঝেন না। আজকে হাসপাতালে এসে আমার একটা ভিন্নরকম ধারণা হল। এতদিন মনে করে এসেছি এরা তায়েবার এই ভয়ঙ্কর অসুখটিকে কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে সবাই নিজের নিজের তালে আছে। আজকে মনে হল, সবাই তায়েবাকে তার মারাত্মক অসুখটির কথা ভুলিয়ে রাখার জন্যই এমন হাসিখুশি এমন খোশগল্প করে। মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ ঘনিয়ে উঠল। আমিই তো প্রথম থেকে তায়েবাকে তার একান্ত ব্যথার জায়গাটিতে আঘাত করে আসছি। হাবে ভাবে আচার আচরণে তায়েবাকে তার ভাইবোন আত্মীয়স্বজন থেকে আলাদা করে ফেলার একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ক্রমাগত দেখিয়ে এসেছি। এটা কেমন করে ঘটল ? তায়েবার ওপর আমার কী দাবি ? যদি বলি তায়েবাকে আমি প্রাণের গভীর থেকে ভালোবাসি। তা হলে ভালোবাসার এমন উদ্ভট দাবি-কেমন করে হতে পারে যে আমি তাকে তার ডাল মূল থেকে আলাদা করতে চাইব। আমি নিশ্চিত জানি সে মারা যাবেই। প্রতিদিন একটু একটু করে তার জীবনপ্রদীপের তেল শুকিয়ে আসছে। তথাপি আমার মনের অনুক্ত আকাঙ্ক্ষা এই মৃত্যুপথযাত্রী তায়েবার সবটুকুকে আমি অধিকার করে ফেলব। পারলে, তার স্মৃতি থেকেও নিকটজনের নাম-নিশানা মুছে ফেলব। নিজের মনের ভেতর জমাটবাঁধা একটা ঈর্ষার পিণ্ড যেন দুলে উঠল। এই প্রথম অনুভব করলাম, আমি একটা পশু, একটা দানব। যা পেতে চাই সবকিছু ভেঙেচুরে ছত্রখান করে গুঁড়িয়ে পেতে চাই। অথচ মনে মনে একটা ভালোমানুষির আত্মপ্রসাদ অনুভব করে দুনিয়ার তাবৎ মানুষকে আসামি বানিয়ে বিচারক সেজে বসে আছি। সেই সন্ধের হাসপাতালে আমার মনের এই কুৎসিত দিকটির পরিচয় পেয়ে ক্রমশ নিজের মধ্যেই কুঁকড়ে যেতে থাকলাম। স্বাভাবিকভাবে কোনো কথাবার্তা বলতে পারছিলাম না।

হাসপাতালের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল। অর্চনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তায়েবাদি আজ আসি। শিগগির আবার আসব। সে ব্যাগটা কাঁধে দুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বলল, শোনো দানিয়েল, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। থাক ভালোই হল, কথাটা মনে পড়ল। পারলে এরই মধ্যে একবার সময় করে আমাদের বাড়িতে আসবে একটা জরুরি ব্যাপার আছে। জরুরি ব্যাপারের কথা শুনে আমি অর্চনার পিছুপিছু করিডোর পর্যন্ত এলাম। জানতে চাইলাম, আসলে ব্যাপারটা কী? অর্চনা বলল, জান আমার এক দূরসম্পর্কীয় দাদা এসেছেন ফ্রান্স থেকে। তিনি একসময়ে অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর নেতাজি সুভাষ বোসের সঙ্গে আজাদ হিন্দু ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা অনেকদিন তাঁর কোনো সংবাদ পাইনি। অনেক বছর পরে জানতে পারলাম, তিনি ফ্রান্সে চলে গিয়েছেন এবং এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেছেন। আমরা তো তাঁর কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি তো তাঁকে কোনোদিন চোখেও দেখিনি। হঠাৎ করে গত সপ্তাহে তিনি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বাড়ির লোকজন কলিযুগেও এমন আশ্চর্য কাণ্ড ঘটতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। তিনি সংবাদপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ পাঠ করে আর টেলিভিশন রিপোর্ট দেখে সোজা কলকাতা চলে এসেছেন। একেই বলে বিপ্লবী। তিনি এখন আমাদের বাড়িতেই আছেন। তুমি একদিন আসবে। তোমার সঙ্গে কথা বললে দাদা ভীষণ খুশি হবেন। অর্চনা চলে গেল।

অর্চনাকে বিদায় করে তায়েবার কেবিনে ঢুকে দেখি জাহিদুল এবং হেনাভাই দু জন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারলাম। আমি নিজের ভেতরে সহজ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি বলেই যেন চারপাশের জগৎটা আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। দোলা, ডোরা এবং তায়েবার মা উনারাও উঠে দাঁড়ালেন। দোলাকে যেতে হবে ধর্মতলা। সেখান থেকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে দমদম তার ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে। ডোরা, জাহিদুলের সঙ্গে কোন বাড়িতে গান গাইতে যাবে। আর মাকে হেনাভাই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে রেখে তারপর নিজের ডেরায় চলে যাবেন। আমি নিজে খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। সকলে গেল, অথচ আমি রয়ে গেলাম। ভাবলাম, চলেই যাই। কিন্তু তায়েবাকে বলা হয়নি। কথাটা কীভাবে তাকে বলব, চিন্তা করছিলাম। কেবিনে আর কেউ নেই। উৎপলাকে বোধ হয় অন্য কোথাও শিফট করা হয়েছে। মাঝখানে শুনছিলাম, তার অসুখটির খুব বাড়াবাড়ি চলছে। জিগগেস করতে ইচ্ছে হয়নি। পাছে একটা খারাপ জবাব শুনি। তায়েবাই নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলল। আচ্ছা দানিয়েল ভাই, একটা কথা জিগগেস করি। আমি বললাম, বলো আপনি এত অপরিষ্কার থাকেন কেন? এটা বহু পুরোনো কথা। সুতরাং জবাব দিলাম না। সে বলল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখুন ঝাঁটার শলার মতো দাড়িগুলো কীরকম খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। এভাবে গালভর্তি বিশ্রী দাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে আপনার লজ্জা লাগে না। চুপ করে রইলাম। আজকাল ওর কথার পিঠে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। কী, চুপ করে রইলেন যে, কথা

বলছেন না কেন। তার কথার মধ্যে দিয়ে ঝাঁঝ বেরিয়ে এল। অগত্যা আমি বললাম, তায়েবা লজ্জাবোধ সকলের সমান নয়।

সে বিছানা থেকে সটান সোজা হয়ে বসল। আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে বলল, আপনি আমাকে খুব সোজা মেয়ে পেয়েছেন তাই না, সব সময় যাচ্ছে তাই ব্যবহার করেন। অর্চনাদির মতো কোনো শক্ত মহিলার পাল্লায় পড়লে দুদিন আপনার মাথার ভূত ঝেঁটিয়ে একেবারে সিধে করে দিত। আমি আর কদিন। আল্লার কাছে মোনাজাত করি অর্চনাদির মতো কোনো শক্ত মহিলার সঙ্গে যেন সারাজীবন আপনাকে ঘর করে কাটাতে হয়। তায়েবা ঠাট্টাচ্ছলে কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু আমি সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। সে অর্চনাকে নিয়ে কী অন্যরকম একটা ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছে ? আমি বললাম, এর মধ্যে অর্চনার কথা আসছে কেন ? তার সঙ্গে আগে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু চাক্ষুস পরিচয় তো এই কদিনের। তায়েবা বলল, অর্চনাদির কথা বললে আপনি অত আঁতকে ওঠেন কেন ? তার কথা আমি বারবার বলব। একশো বার বলব। অত্যন্ত ভালো মেয়ে। আমার ভীষণ মনে ধরেছে।

আমি উসখুস করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ হয়েছে, শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে। তার পরেও হাসপাতালে যদি থাকি, কেউ কিছু বলতে পারে। এখানকার নিয়ম-কানুন বড় কড়া। কী কারণে বলতে পারব না, আমি চলে আসতে চাই, একথাটা তায়েবাকে বলতে পারছিলাম না। কোথায় একটা সংকোচ বোধ করছিলাম। এই দোদুল্যমানতা কাটাবার জন্য একটা চারমিনার ধরাব স্থির করলাম। কেবিনের বাইরে পা দিতেই তায়েবা অনুচ্চস্বরে বলল, কোথায় যাচ্ছেন ? আমি বললাম, একটা সিগারেট খেয়ে আসতে যাচ্ছি। বাইরে যেতে হবে না। এখানে ওই উৎপলার বেডে বসে খান। আমি ইতস্তত করছিলাম। তায়েবা বলল, আপনার ভয় নেই। মনের সুখে সিগারেট খেতে পারেন। ডা. ভট্টাচার্যি আজ কলকাতার বাইরে গেছেন। থাকার মধ্যে আছেন, মাইতিদা তাঁকে আমি সামাল দেব। আমি সত্যি সত্যি উৎপলার বেডে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম। সে বলল, বুঝলেন দানিয়েল ভাই, তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না। আজকে আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে কাটাব। হোস্টেলে এক ভদ্রলোককে নয়টার সময় আসতে বলেছি। তার সঙ্গে আমার টাকা-পয়সার একটা ব্যাপার আছে। এসে যদি ভদ্রলোক ফেরত যান, আবার কবে দেখা হয় বলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া প্রয়োজনটা আমার। আমারই প্রয়োজনে ভদ্রলোককে আমি অনুরোধ করেছি আসতে। তাই মনে মনে একটুখানি দমে গেলাম। তায়েবা সেটা বুঝতে পারল। কী, আপনার সঙ্গে গল্প করতে চাই সেটি বুঝি পছন্দ হল না। পছন্দ না হয় তো চলে যান। আমি আপনাকে আটকে রাখিনি। আমি তো অর্চনাদি নই যে জরুরি প্রয়োজনে আপনাকে নির্দেশ দিতে পারি।

আমি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে টুলটা টেনে তার বিছানার পাশে এসে বসলাম। বললাম, ঠিক আছে গল্প করো আমি আছি। কতক্ষণ থাকবেন ? আমি বললাম,

যতক্ষণ গল্প কর। আমি সারারাত গল্প করতে চাই, সারারাত আপনি থাকবেন ? বললাম, সাররাত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থাকতে দেবে ? সে মাথার বেণীটি দুলিয়ে বলল, সে দায়িত্ব আমার। এবার সে সত্যি সত্যি রহস্যময়ী হয়ে উঠল। জানেন দানিয়েল ভাই, আপনার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না হয়, আপনি এত বিষণ্ন এবং অপরিষ্কার থাকেন। মাঝে মাঝে তো বমি বেরিয়ে আসতে চায়। এটা তো ভূমিকা মাত্র। আসলে তায়েবা গোটা রাত কিসের গল্প করতে চায়, সেটা আমাকে ভয়ানক কৌতূহলী করে তুলল। আমি ভুলে গেলাম যে সে একজন মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। সে যেমন করে হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে বসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়ল। বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। এই অবস্থায় কী করি। ডা. মাইতিকে ডাকব কি না চিন্তা করছিলাম। কিছুক্ষণ পর তার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে এল। চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। আহ্ দানিয়েল ভাই। আপনি আরেকটু এগিয়ে এই আমার মাথায় কাছটাতে বসুন এবং হাতখানা দিন। ডান হাতখানা এগিয়ে দিলে দু হাতে মুঠি করে ধরে দু-তিন মিনিট চুপ করে রইল। স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে এমনি ফিসফিস করে বলল, জানেন এ বছর আমি সাতাশে পা দিয়েছি। রাঙা আমার দু বছরের ছোট। তার একটি মেয়ে আছে। গোলগাল পুতুলের মতো। আঃ কি সুন্দর ! দেখলে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। রাঙার বয়সে বিয়ে হলে এতদিনে আমারও ছেলেমেয়ে থাকত। গোটা জীবনটা কী করে কাটালাম, ভাবলে দুঃখে বুক ফেটে যেতে চায়। তায়েবার এ সমস্ত কথার প্রত্যুত্তর আমার জানা নেই। বুকটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসছিল। বহু কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখলাম। কিছু বললাম না। তায়েবা বলে যাক যা মন চায়। তার প্রাণপাতালের তলা থেকে যদি অবরুদ্ধ কামনা বাসনার স্ফুলিঙ্গগুলো বেরিয়ে আসতে চায়, আসুক। এতকাল আমার মনে হয়েছিল তায়েবা ঠিক মানবী নয়। সাধারণ মেয়েদের মতো সে কামনা বাসনার ক্রীতদাসী নয়। অন্যরকম। আজ এই সন্ধেয় ওপরের নির্মোক বিদীর্ণ করে তার অন্তরালবর্তী নারী-পরিচয় এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। দানিয়েল ভাই, আবার সে ফিসফিস করে কথা বলল। মনে হল ওটা তার কণ্ঠস্বর নয়। পাথরচাপা কামনা বাসনারই যেন কথা কইছে। জানেন দানিয়েল ভাই, আমার সারাশরীরে প্রচণ্ড আগুনের তাপ। আমি জ্বলে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি। আর বুকে কী ভয়াবহ তৃষ্ণা, মনে হয় সমুদ্র শুষে নিতে পারি। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষ্ণার তাপে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। আর বেশিদিন নয়, শিগগিরই আমি মারা যাব। তারপর সবকিছুর শেষ হবে ! ও মা ! আপনি অত দূরে কেন। কাছে আসুন, আপনি এত লাজুক এবং ভীত কেন ? কই আপনার হাত দুটি কোথায় ? সে আমায় দু হাত টেনে নিয়ে বুকের ওপর রাখল। স্তন দুটি কবুতরের ছানার মতো গুটিসুটি মেরে বসে আছে। আমার বুকের মধ্যে যেমন একটা ভূমিকম্প হচ্ছিল, তেমনি একটা পুলক প্রবাহও রি রি করে সমস্ত লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় কাঁপছিল। এই নারী, এতকাল যাকে মনে করে আসছি ধরাছোঁয়ার

বাইরে, সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, কত সহজে আমার কাছে নিজেকে উন্মোচন করেছে। মুসা নীলনদের তল দেখেও কী এতটা পবিত্র পুলকে শিউরে শিউরে উঠেছিলেন? দানিয়েল ভাই শব্দটা বাদ দিয়ে শুধু আমার নামটা ধরে ডাকল। জান তোমাকে আপনাকে ভালোবাসি। এতদিন বলিনি কেন জান? আমি অনেকদিন আগে থেকে, এমনকি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব থেকেই আমার অসুখটার কথা জানতাম। আমার ভয় ছিল, জানালে কেটে পড়বেন। আর আপনাকে ভালোবাসি একথা জানাতে পারিনি, একটা কারণে পাছে তুমি মনে কর, আমি আপনাকে প্রতারিত করেছি। এ দোটানার মধ্যে বহুকষ্টে আমার জীবন কেটেছে। আজকে আমার কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় নেই। দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের সামনে বলতে পারি, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আজ আমার কোনো ভয়, কোনো ডর নেই। আমার ভেতর বাইরে এক হয়ে গেছে। আজ কোন দ্বিধা, কোন সংশয় নেই। আহ্, আপনাকে আমি দেখতে পারছিনে। ওইখানে যেয়ে একটু আলোর কাছে বসুন। ভালো করে দেখি। আমি আলোর কাছে সরে বসলাম। আহ্ চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। মনে আছে, যেদিন প্রথম আমাদের গেন্ডারিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন গায়ে একটা ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি ছিল। বুকের কাছটিতে রং লেগে লাল হয়ে গিয়েছিলো। মনে হয় গতকাল এ ঘটনা ঘটে গেছে।

জুতো মচমচিয়ে ডা. মাইতি কেবিনে প্রবেশ করলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে দানিয়েল সাহেব যে, আসুন আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করি। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম। করমর্দনের পালা সাঙ্গ হলে ডা. মাইতি বললেন, এবার দানিয়েল সাহেব আপনাকে কিন্তু একটা কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি বললাম, কিসের কৈফিয়ত ডা. মাইতি। আপনার তো অজানা থাকার কথা নয়, হাসপাতালে ছ টার পরে কাউকে থাকতে দেয়া হয় না। এখন আটটা বেজে তিরিশ মিনিট। মাইতিদা উনি চলে যেতে চেয়েছিলেন, আমি একরকম জোর করেই রেখে দিয়েছি। জবাব দিল তায়েবা। ভালো করনি। এখানকার একটা ডিসিপ্লিন তো আছে। সেটা যদি জোর করে ভেঙে ফেল আমরা টলারেট করব কেন? তায়েবা ডা. মাইতির কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বলল, ঠিক আছে দানিয়েল ভাই, চলে যান। আমিও চলে আসার জন্য পা বাড়িয়েছিলাম। এমন সময় ডা. মাইতি তায়েবার হাত দুটো ধরে হো হো করে হেসে উঠলেন। দিদি তোমার আচ্ছা রাগ তো। এটা যে হাসপাতাল বাড়ি নয়, সে কথা তোমাকে কেমন করে বোঝাই। ঠিক আছে, দানিয়েল সাহেব আর দশ মিনিট বসুন। বিছানার একপাশে বসলাম। এখনো তায়েবা রাগ করেনি। দানিয়েল সাহেব আপনি কেমন আছেন? আমি বললাম, ভালো। সে-রাতের পর আপনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। মাঝেমধ্যে সময় হলে গরিবের দরোজায় একটু টোকা দেবেন। সে-রাতের পর থেকে কেন জানিনে আমি ডা. মাইতির মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। কেমন ভয় ভয় করে। তায়েবা বলল, কালকে আসবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমাকে হাসপাতাল থেকে চলে আসতে হল।

নয়

সেদিনটি ছিল আগস্ট মাসের চৌদ্দ তারিখ। চারদিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালনের তোড়জোড় চলছে। সকালবেলা ঢাকা রেডিও ধরেছিলাম। গোটা বাংলাদেশে আজ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের কণ্ঠস্বর শুনলাম। জঙ্গিলাট পাকিস্তানের দু অংশের ঐক্য কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অটুট থাকবে, এ ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করে ঘোষণা করছেন, কোনো দুশমন পাকিস্তানের এক ইঞ্চি মাটি একজন পাকিস্তানি বেঁচে থাকতেও দখল করতে পারবে না। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ শব্দটি উচ্চারণ করে ইয়াহিয়া খান তাঁর উর্দু বক্তৃতা শেষ করলেন। পরপর ইংরেজি এবং বাংলায় তাঁর বক্তৃতা অনুবাদ করে শোনানো হল। ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক পাকিস্তানকে সমর্থন করে এমন জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, শুনে আমার শিরার সমস্ত রক্ত চট করে মাথায় এসে জমা হল। এই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমরা দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। হয়তো অধ্যাপক শখ করে পাকিস্তানকে সমর্থন করার জন্য রেডিওতে বক্তৃতা দিতে আসেননি। সৈন্যরা বন্দুক দেখিয়ে বাড়ি থেকে টেনে বের করে রেডিওর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবু আমার ভীষণ খারাপ লাগতে আরম্ভ করল। আগস্ট মাসের এই সকালটি অত্যন্ত সুন্দর। শিশু-সূর্যের প্রাণপূর্ণ উত্তাপে প্রাসাদনগরী কলকাতা যেন ভেতর থেকে জেগে উঠেছিল। মনটা অকারণে খুশিতে ছেয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সে গানটির কলি মনের ভেতর আসা-যাওয়া করছিল। 'আজি প্রভাত স্বপনে শরৎ তপনে কি জানি পরান কীযে চায় গো/শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কী যে গায় গো।' ঢাকা রেডিও শুনে সবকিছু অশ্লীল মনে হতে লাগল। বন্ধ করে দিলাম। এই কান্তিমান দিনের সমস্ত আলো, উত্তাপ প্রতিশ্রুতি আমার কাছে একেবারে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। আজ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আগামীকাল ভারতের স্বাধীনতা দিবস। আর আমরাও একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আকাশে বাতাসে সর্বত্র শাড়ির আঁচলের মতো স্বাধীনতা যেন দুলে দুলে খেলা করছে। হায়রে স্বাধীনতা !

আমার মনে কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের মতো একটা বিশ্রী অনুভূতি জন্ম হচ্ছিল, বিমর্ষতাটা আরো বেড়ে গেল। ঘরের বন্ধুদের কারো কাছে এ অনুভূতি আমি প্রকাশ করতে পারছিনে। এমনকি নরেশদাকেও না। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কণ্ঠনালি দিয়ে একটার পর একটা তেতো ঢেকুর উঠে আসতে চাইছিল। সকালে নাস্তা খাওয়া হয়নি। ঠিক আছে এ বেলা কিছু খাব না। রুমে একটা তুমুল বিতর্ক চলছে। ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ব্যাপারে সিরিয়স কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমতী গান্ধী যা ইচ্ছে করুন। আমি প্যান্ট সার্ট পরে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু গেটের কাছে এসে চিন্তা করলাম, কোথায় যাওয়া যায়। সত্যি সত্যি কলকাতা শহরে যাওয়ার মতো জায়গা খুবই অল্প আছে। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল অ্যান্টনি বাগান লেনে মজহারুল ইসলামের বাড়িতে গেলে মন্দ হয় না ! সকালের

নাস্তাটাও ওখানে খেয়ে নেয়া যাবে। আর ইসলামের কাজকর্মের একটু ফাঁক থাকলে তাঁকে নিয়ে অর্চনার ফ্রান্স থেকে আগত দাদার কাছে গিয়ে আলাপ করা যাবে।

আমি যখন অ্যান্টনি বাগানে এসে পৌঁছলাম, দেখি ইসলামেরা সবেমাত্র নাস্তার টেবিলের চারপাশে এসে বসেছে। এখনো কেউ খেতে আরম্ভ করেনি। আমাকে দেখে ইসলাম হাসতে হাসতে বললেন, আরে মশায় আপনার উৎপাতে সকাল-বেলাটাও দেখছি নিরাপদে কাটানো যাবে না। বললেন, কোন মহা প্রয়োজনে এই সাতসকালে বাড়িতে এসেছেন। আমি বললাম, কাজ না থাকলে কি আর আসি। আপনারা বাংলাদেশের মানুষেরা বেশ আছেন, গোটা কলকাতা শহরে একেকজন ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একেক মহাপুরুষের সুকীর্তির কাহিনী শুনতে শুনতে কানে পচন ধরে গেছে। আপনারা তো ইন্দিরা সরকারের অতিথি হিসেবে দিব্যি আছেন। এদিকে ইন্দিরাজি আমাদের কোন হাল করেছেন, সেটার কিছু খোঁজ খবর রাখেন ? গতকাল এই পাড়ায় আমাদের পার্টির যত কর্মী ছিল সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। আমি বাসায় ছিলাম না। তাই আপনার সঙ্গে দেখা হল। মজহারুল ইসলাম সি. পি. আই. এম.-এর ডেডিকেটেড ওয়ার্কার। এখন পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশংকরের কংগ্রেস সরকারের সমস্ত রোষ সি. পি. আই. এম.-এর বিরুদ্ধে। কেননা জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন সি. পি. আই. এম.-ই হল কংগ্রেসের পয়লা নম্বরের দুশমন। প্রতিদিন কর্মীরা দলে দলে গ্রেপ্তার হচ্ছে। কেউ নিজের বাড়িতে থাকতে পারছে না। মজবুত ঘাঁটিগুলো একে একে কংগ্রেসের হাতে গিয়ে পড়ছে। বাইরে থেকে ঠিক বোঝার উপায় নেই। এখানেও কংগ্রেস সরকার একটি ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।

মজহার সুযোগ পেলেই আমাদের খোঁচা দিতে ছাড়েন না। তাঁর অভিযোগটির মর্মবস্তু অনেকটা এরকম, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কৌশলে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুটি অস্বাভাবিক বড় করে জনমত সেদিকে আকর্ষণ করে রাখতে চাইছেন। আর সে সুযোগটি পুরোপুরি নিয়ে বিরোধী দলের অস্তিত্ব একবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য অবিরাম হামলা করে চলেছেন শ্রীমতী। তিনি এবং তাঁর মতো অনেকেই মনে করেন আমরা এখানে এসে শ্রীমতী। গান্ধীর হাতে একটি মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিয়েছি। তথাপি সি. পি. আই. এম.-এর লোকদের আমাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি আছে। নকশাল ছেলেরা তো সরাসরি মনে করে আমরা জনগণের বিপ্লবের জানী দুশমন। আর ভারতীয় গোঁড়া মুসলমানেরা বাংলাদেশের মানুষদের হিন্দুদের খেলার পুতুল ছাড়া কিছু মনে করেন না। সে যাক, আমি মজহারকে বললাম, আপনাকে মশায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মজহার প্রথমে যেতে চাননি। একাজ সেকাজের অছিলা করে পিছলে যেতে চেষ্টা করছিলেন। আমি যখন চাপচাপি করতে থাকলাম, শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে উপায় রইল না। নাস্তা করার পর দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ভাবলাম গড়িয়াহাটা অবধি বাসে যাব। কিন্তু মজহার রাজি হলেন না। তিনি বললেন, মশায়

এখন ট্রামেও যাওয়া চলবে না। গতরাতে পাড়া থেকে আমাদের পার্টির সমস্ত ওয়ার্কারকে তুলে নিয়ে গেছে। আপনার সাধ হয়েছে আমার কিছু পয়সা খরচ করাবেন। তা আর কী করা যাবে। অপেক্ষা করুন ট্যাক্সি আসুক।

ট্যাক্সি এলে দুজনে উঠে বসলাম। ডানদিকে বেরিয়ে শেয়ালদার মোড়ে এসে যানজটের মধ্যে আটকে গেল ট্যাক্সি। মজহার বললেন, আপনি মশায় মানুষটাই অপয়া...দিন একখানা চারমিনার। আর তো কিছু করার উপায় নেই ! বসে বসে ধোঁয়া ছাড়ি। আমি সিগারেট বের করে দিলাম। তিনি দেয়ালে সাঁটা একটা পোস্টারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, দেখুন ইন্দিরা গান্ধীকে কেমন চিতাবাঘিনীর মতো দেখাচ্ছে না ? আমার কিন্তু তেমন মনে হল না। ইন্দিরা গান্ধীকে ইন্দিরা গান্ধীর মতোই মনে হচ্ছিল। বোধাহয় চিতাবাঘিনীর ছাপটি মজহারের মনে আছে। তাঁকে তুষ্ট করার জন্য বললাম, তা দেখাচ্ছে বটে, আপনাদের পোস্টার ? তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ ছবিটা কে এঁকেছেন জানেন ? তিনি বললেন, ছবিটা হল গিয়ে দেবব্রত দাশগুপ্তের। বাঁদিক থেকে তাকিয়ে দেখুন একেবারে অবিকল চিতাবাঘিনী। তাকিয়ে দেখার পর আমারও কেমন চিতাবাঘিনী মনে হল। এই সময়ে যানজট হাল্কা হয়ে এল।

গোলপার্কে এসে ট্যাক্সি থেকে নামলাম দুজন। দরোজায় বেল টিপতেই অর্চনা নিজে এসে দোর খুলে দিল। অর্চনা স্নান করেছে, পিঠের ওপর আধভেজা চুলের বোঝা ছড়িয়ে আছে। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। চশমা না পরলে তাকে সত্যি সত্যি সুন্দর দেখা যায়। মজহারকে সামনে ঠেলে দিয়ে বললাম, তোমার প্যারিস-ফেরত দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এক বন্ধুকে ধরে নিয়ে এসেছি। অর্চনা মাথা নিচু করে আদাব জানিয়ে জিগগেস করল, আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ? মহজার বললেন, না, আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। তবে দু পুরুষ ধরে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছি এবং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে একখানা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চালাই।

আপনারা বসুন আমি চা দেই। প্রমোদদা ততোক্ষণে এসে পড়বেন। আমি জানতে চাইলাম তিনি কি এখন বাড়িতে নেই ? অর্চনা বলল, খুব সকালবেলা উঠে তিনি একাকী বেরিয়ে পড়েন। ঘুরে ঘুরে পুরোনো আড্ডার জায়গাগুলো দেখেন। রোদটা তেতে উঠলেই চলে আসেন বাসায়, আসার সময় প্রায় হয়ে এল। চায়ে মুখ দিয়েছি, এমন সময় বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামার শব্দ শোনা গেল। অর্চনা উঠে দাঁড়িয়ে দরোজা খুলতে খুলতে বলল, ওই বুঝি দাদা এলেন।

লম্বা চওড়া ফর্সা সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখতে ঠিক বাঙালি বলে মনে হয় না। এখনো বেলা অধিক হয়নি। তবু ভদ্রলোকের সারা শরীর ঘামে একরকম ভিজে গেছে। অর্চনা তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে এনে দিল এবং ফ্যানটা অন করে স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে জিগগেস করল, দাদা আপনার প্রাতঃকালীন তীর্থদর্শন আর কতদিন চলবে ? সারা জীবন দেখলেও মনে হচ্ছে শেষ

হবে না। ভদ্রলোকের অনভ্যস্ত জিহ্বায় বাংলা ভাষাটা ঠিকমতো আসতে চায় না। হঠাৎ করে বয়স্ক মানুষের মুখে শিশুর মতো বাংলাভাষা শুনলে কানটা আচমকা খুব খুশি হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, বিদেশে এই কলকাতা শহরের অনেক অপবাদ শুনেছি। কলকাতা নোংরা, ঘিঞ্জি আর দুর্গন্ধময় এসব আর কি। ঘুরে ঘুরে দেখতে কিন্তু আমার বেশ লাগে।

শেয়ালদার মোড়ে নোংরা জঞ্জাল আর আবর্জনার স্তূপ দেখে অর্চনা আমার কী মনে হল জানিস ? যেন আবার নতুন করে জন্মাচ্ছি। কী জানি দাদা আপনি দার্শনিক মানুষ। আপনার দেখার ধরনটাই আলাদা। আমরা কিন্তু নোংরা আবর্জনাকে আবর্জনাই দেখি। প্রমোদবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে। এসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তোকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আহ্ কতদিন পরে আবার কলকাতা দেখছি ! নিজের মাটি, নিজের মানুষ কী জিনিস যদি বুঝতে চাস তো, একটানা কয়েক বছর দেশের বাইরে কাটিয়ে আয়, তারপর বুঝতে পারবি। এই মাটি মানুষ ছেড়ে বিদেশে আপনি তো একটানা দু-যুগেরও অধিক সময় কাটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, মাঝে মাঝে আমি নিজেও অবাক হয়ে ভাবি এতটা সময় কী করে কাটিয়ে দিলাম। কোনো কোনো সন্ধেবেলা অথবা রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ভাবতাম, আর না, ঢের হয়েছে। এবার সব ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে গিয়ে ছোটনাগপুরের ওদিকে একটা কুটির তৈরি করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু আর হল কই ? দেশে আসতে চাইলেও আসতে দিচ্ছে কে ? আমি ফ্রেঞ্চ সিটিজেন হয়ে গেছি। তাছাড়া তোমার বৌদি আছে, ছেলেমেয়েরা আছে। তারা সকলে ওদেশটার জীবনধারায় অভ্যস্ত। সবকটাকে এখানে নিয়ে এলে ডাঙার মাছের মতো অবস্থা হবে। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মানুষের সব সাধ কি পূর্ণ হয় ? তবু ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বাংলাদেশের ফ্রিডম ওয়রটা শুরু হল। আর নিজেকে আটকে রাখা গেল না। ছুটে চলে এলাম। অর্চনা বলল, অন্তত একটা সাধ তো আপনার মিটল। পুরোনো দিনের কারো সঙ্গে দেখা হল ? প্রমোদবাবু বললেন, দেখ, তোকে আসল খবরটাই বলা হয়নি। আমার সঙ্গে গেল পরশুদিন অনুকূলদার দেখা হয়েছে। তিনি পূর্বের মতো শক্তসমর্থ আছেন। শুধু মাথার চুলটাতেই একটু পাক ধরেছে। এ ধরনের চিরতরুণ মানুষকে দেখলে ঈর্ষা হয়। এখনো তিনি সমানে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা ষোলো আঠারো বছর বয়সে যেভাবে তাঁর কাছে ঝাঁক বেঁধে যেতাম, তেমনি এখনো তাঁর ঘরে ষোল আঠারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে। তাদের চোখে স্বপ্ন, বুকে কিছু একটা করার দুরন্ত কামনা। এখনো তিনি ছেলেমেয়েদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। জানিস অর্চনা, অনুকূলদা পুরনো বিপ্লবীদের জড়ো করে বেঙ্গল ন্যাশনাল ভালান্টিয়ার্স পার্টি গড়েছেন। তাঁর দলের ছেলেরা কলকাতা শহরের সব জায়গায় বড় বড় করে লিখেছে, দু বাংলার চেকপোস্ট উড়িয়ে দাও—দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। অনুকূলদাদের বি. এন. ভি. পি. ফান্ডে তিনশো ডলার ডোনেট করলাম।

প্রমোদবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্চনা ঝংকার দিয়ে উঠল, দাদা আপনি এতদিন বাদে দেশে এসে আবার বি. এন. ভি. পি.-র পাল্লায় পড়েছেন? ছি, কী কেলেঙ্কারির কথা। কেন, বি. এন. ভি. পি কী দোষটা করল? ওরা ভাঙা বাংলাকে আবার জোড়া লাগাতে বলছে। এ কী চাট্টিখানি কথা। জান এই বাংলা বিভাগ সহ্য করতে না পেরে উনিশশো সাতচল্লিশে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। অর্চনা বলল, আপনি যেন একটা কী দাদা। এই বি. এন. ভি. পি.-র মতো প্রতিক্রিয়াশীল দল গোটা পশ্চিমবাংলায় আর একটিও নেই। আপনি চেনেন না বটে। ওদের আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এমন চমৎকার ডিপো আর একটাও খুঁজে পাবেন না। আপনি গিয়ে তাদের খপ্পরে পড়লেন? একদিক দিয়ে হিসেবে করলে আপনি বিশেষ ভুল করেননি। মানুষের বাচ্চা বয়সে চোট লাগলে বুড়ো বয়সে সেটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। আপনার কৈশোর এবং যৌবনকাল কেটেছে অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে। মাঝখানে পঁচিশ তিরিশ বছরের মতো বিদেশে কাটিয়েছেন। কিন্তু আপনার মন ওই জায়গাটিতেই এখনো আটকে রয়েছে। মাঝখানে দু-দুটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। সমাজের কত পরিবর্তন ঘটে গেছে, রাজনীতির ধরনধারণ কত পাল্টে গেছে। আপনার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতি এখন অতীত যুগের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। অর্চনা অধিক কথা না বাড়িয়ে বলল, যাকগে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আমার এক বাংলাদেশের বন্ধুকে ডেকে এনেছি। ওর নাম দানিয়েল। আপনাকে ঢাকার সমস্ত খবরাখবর বলতে পারবে। প্রমোদবাবু নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড়হাত করলেন। তারপর জিগগেস করলেন, আপনি ঢাকায় থাকেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, উয়ারি চেনেন? বললাম, ঢাকায় থাকি উয়ারি চেনব না কেন? আচ্ছা আপনি জানেন উয়ারিতে একটা র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট আছে। আমাকে বলতে হল, হ্যাঁ উয়ারিতে একটা র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট আছে। এই র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের ৩২ নম্বরের বাড়িতে ছোটবেলায় আমি থেকেছি। জিগগেস করলাম, ওটা কি আপনাদের বাড়ি ছিল? জবাবে প্রমোদবাবু বললেন, ঠিক আমাদের বাড়ি নয়। আমি জন্মেছি গ্রামে। ঢাকাশহর থেকে বেশি দূরে নয়। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণপাড়ে শুভড্যায়। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের বাড়িটি ছিল আমার দাদামশায় রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ চৌধুরীর। তিনি ছিলেন দুঁদে জমিদার। অসাধারণ প্রতাপশালী মানুষ। আপনি কি কখনো রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ চৌধুরীর নাম শুনেছেন? আমাকে বলতেই হল এরকম কোনো নাম শুনেছি মনে তো পড়ে না। তিনি একটুখানি নিরাশ হলেন মনে হল। তারপর জানতে চাইলেন, আচ্ছা র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের ৩২ নম্বর বাড়িটি আপনি দেখেছেন? আমি বললাম, র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটটি চিনি বটে কিন্তু কোন বাড়িটির কথা বলছেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। প্রমোদবাবু বললেন, বাড়িটি দোতলা। সামনে একটা লোহার গেট। গেটের কাছে একটা বেলগাছ। বাড়ির পেছন দিকে একসার নারকেল গাছ। এবার চিনতে পারলেন? এত বিশদ করে বলার পরও বাড়িটি আমার চেনার বাইরে থেকে গেল। ভদ্রতার খাতিরে বলতে হল, আমি থাকি র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট থেকে অনেক দূরে। সে কারণে বাড়িটির সঙ্গে

পরিচয় ঘটে উঠতে পারেনি। ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। পকেট থেকে সিগারেট-প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি ফের জানতে চাইলেন, আপনি কি ফরাশগঞ্জের সত্যানন্দ সিংহের নাম শুনেছেন, একসময়ে যিনি ঢাকার অনুশীলন সমিতির সর্বেসর্বা ছিলেন। এবারেও আমাকে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে হল।

প্রমোদবাবু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, একটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, আপনি ঢাকায় থাকেন অথচ সত্যানন্দ সিংহের নাম শোনেননি। আমাদের সময়ে সত্যানন্দ সিংহকে সকলে একডাকে চিনত। বৃটিশ সরকার তাঁর মাথার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আপনারা মুক্তিযুদ্ধ করছেন, অথচ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নাম পর্যন্ত জানেন না, এটা কেমন করে হয় ! আমি মনে মনে রেগে গেলাম। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না। বললাম, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নাম জানার কোনো সম্পর্ক আছে কি ? তিনি বললেন, বা রে সম্পর্ক থাকবে না কেন ? সব ব্যাপারে একটা ধারাবাহিকতা থাকা তো প্রয়োজন।

উত্তরে আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। অর্চনা এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করল। সে প্রমোদবাবুকে জিগগেস করল, আচ্ছা দাদা বুলন দেখি আপনি দেশ ছেড়েছেন কত দিন হয় ? প্রমোদবাবু মাথা চুলকে বললেন, তা হবে সাতাশ আটাশ বছর। অর্চনা ফের জানতে চাইল, অগ্নিযুগের যেসকল বিপ্লবীকে চিনতেন দেশ ছাড়ার সময়ে সকলের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল ? প্রমোদবাবু বললেন, তা ছিল না—কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলেন তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে ? কেবল অনুকূলদার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল। আপনি প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে যোগাযোগ রাখতে পারেননি। এই বেচারি যদি আপনার চেনাজানা মানুষদের চিনতে না পারে, তা হলে কি খুব অন্যায় হবে ? মধ্যিখানে কত কিছু ঘটে গেল। দেশ বিভক্ত হল, জন্ম নিল হিন্দুস্থান, পাকিস্তান। আবার সেই পাকিস্তানও এখন ভেঙে যেতে লেগেছে। আপনার দশা হয়েছে রিপভ্যান উইঙ্কলের মতো। আপনি যে-ঢাকার কথা বলছেন, সে হল আপনার স্মৃতি এবং স্বপ্নের ঢাকা শহর। এখনকার ঢাকা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। শুনেছি রাস্তাগুলো প্রশস্ত এবং সোজা। লেখাপড়া শিক্ষা সংস্কৃতিতে ঢাকা এখন অনেক এগিয়ে গেছে। কোনো কোনো দিক দিয়ে কলকাতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ প্রমোদবাবু আমার চোখে চোখ রেখে জিগগেস করলেন, আচ্ছা এখনো কি ঢাকা শহরে পঙ্খিরাজ গাড়ি আছে ? কথা শুনে আমার হাসি পাওয়ার দশা। বললাম, এখন কি আর পঙ্খিরাজের যুগ আছে ? আমার কথায় তিনি বোধকরি খানিকটে আহত হলেন। সে কী ! আপনারা এমন সুন্দর জিনিসটি উঠিয়ে দিলেন ? জবাবে বললাম, কেউ উঠিয়ে দেয়নি, কালের প্রভাবে আপনা-আপনিই উঠে গেছে। তারপর আমার কাছে জানতে চাইলেন, আপনাদের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ বলুন। ফ্রেঞ্চ টেলিভিশনে প্রায় প্রতিদিনই খবর থাকত। মনে করেছিলাম, বাংলাদেশে একটি বড় ঘটনা ঘটছে ? অনেকদিন থেকেই দেশে আসব আসব ভাবছিলাম, তবে

ইনারশিয়া কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। টি. ভি.-তে বাংলাদেশের সংবাদ শুনে শুনে নিজের মধ্যে এমন একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করছিলাম আর স্থির থাকতে পারলাম না, চলে এলাম।

এরই মধ্যে চা বিস্কুট এসে গেছে। ভদ্রলোক একটা বিস্কুটের কোনায় কামড় দিয়ে এক চুমুক চা পান করলেন। সেই সময়ে তাঁর দৃষ্টি মজহারুল ইসলাম সাহেবের ওপর পড়ল। লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে আপনার সঙ্গে তো কথাই বলা হয়নি। আপনিও কি বাংলাদেশের ? ইসলাম বললেন, না আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। তবে আমরা দু পুরুষ ধরে কলকাতায় বসবাস করছি। আপনি কী করেন ? ইসলাম বললেন, আমি এখানে কলেজ স্ট্রিটে একখানা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চালাই। আপনার নাম ? ইসলাম বললেন, মজহারুল ইসলাম। আপনি মুসলমান ? ইসলাম জোর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ মুসলমান। প্রমোদবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। অর্চনা বুদ্ধিমতী মহিলা। কথার খেই ধরে জিগগেস করল, আপনার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নামটি কিন্তু এখনো জানা হয়নি। ইসলাম বললেন, 'নব জাগৃতি'। কেমন চলছে আপনার ব্যবসা ? অর্চনার কৌতূহল মেটাবার জন্য বললেন, বর্তমানে ব্যবসার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। আমরা তো মার্কসিস্ট বইপত্র ছেপে থাকি। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার বর্তমানে মার্কসিস্ট সবকিছুর ওপর অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে আছেন। কোনো কোনো সপ্তাহে দোকান খোলাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার তো আবার ডবল রিস্ক। নামে মুসলমান, তার ওপর মার্কসীয় বইপত্রের প্রকাশক। অর্চনা সোজা হয়ে বসেছিল। একটুখনি ঝুঁকে পড়ে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল। তার চোখেমুখে সহানুভূতিমিশ্রিত লজ্জার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। আপনি মুসলিম বলে ব্যবসাপত্র করতে অসুবিধে হয় কি ? ইসলাম বললেন, সব সময়ে নয়, মাঝে মাঝে বেশ বিপদে পড়তে হয়। এই দেখুন না আমার দোকানটা ছিল পূরবী সিনেমার কাছে। গেল রায়টের সময় গোটা দোকানটাই জ্বালিয়ে দেয়া হয়, একটি পৃষ্ঠাও বাঁচাতে পারিনি। শুনে সহসা অর্চনার মুখে কোনো কথা জোগাল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এটা ভারি লজ্জা এবং দুঃখের। ভারতের নেতৃবৃন্দ যারা প্রকাশ্য জনসভায় বড় বড় কথা বলেন, তাঁদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত। ইসলাম বললেন, আমাদের দেশে খারাপ লোকের সংখ্যা নেহায়েতই মুষ্টিমেয়। তারা ক্ষমতাসীনদের সহায়তাতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। গড়পড়তা সাধারণ মানুষ খুবই ভালো। এই ভালো মানুষেরা আছে বলেই এখনো পর্যন্ত টিকে আছি। আমি ধরে নিয়েছি, ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। তাই আমার কোনোরকমের নালিশ বা অনুযোগ নেই।

প্রমোদবাবু হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর বললেন, অর্চনা, বোধ করি তোর কথা সত্যি। এরই মধ্যে এতসব পরিবর্তন হয়ে গেছে আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানিনে। আমার মন সে সাতচল্লিশ আটচল্লিশে থিতু হয়ে আছে। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড করমের ওলটপালট হয়ে গেছে। এই উপমহাদেশটি কোন দিকে যাচ্ছে ? একবার দেশ ভাগ

হয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যদি সফল হয় পাকিস্তান আবার খণ্ড হবে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করি, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে। গোটা ভারত উপমহাদেশে বাংলার স্থান কোথায়? ব্রিটিশ তাড়ানোর সংগ্রামে বাংলা দিয়েছে সবচাইতে বেশি, পেয়েছে সবচাইতে কম। বাঙালির ভাগ্য কী হবে বলতে পারেন? আমি চুপ করে রইলাম। অর্চনা বলল, দাদা আমার ক্ষমতা থাকলে রাজনৈতিক কুষ্ঠি তৈরি করতাম। আপাতত যখন সে ক্ষমতা নেই, সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়াই উৎকৃষ্ট কর্ম মনে করি। অত ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন কী? যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। তিনি অর্চনার কথা কানে না নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, আপনাদের শেখ মুজিবুর রহমানটি কেমন মানুষ আমার জানতে খুব ইচ্ছে হয়। মুক্তিযুদ্ধ যদি জয়যুক্ত হয়, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জানেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার। বাংলার ইতিহাসে আমি যতদূর জানি, এই ভূখণ্ডে বিক্ষোভ বিদ্রোহের অন্ত নেই কিন্তু বাঙালি আপন প্রতিভাবলে নিজেদের মেরুদণ্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করেছে, তেমন কোনো প্রমাণ নেই। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে তাহলে একটা অভিনব ব্যাপার হবে। কলকাতায় খোঁজখবর নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি, তা থেকে স্থির কোনো ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, মুজিব একজন গাঢ় সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের সময় সোহ্‌রাওয়ার্দীর চ্যালা ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্য। অহিংস অসহযোগনীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এই বিরাট গণসংগ্রাম রচনা করেছেন। দুচারজন কমিউনিস্ট বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে যা জেনেছি তাতে সংশয়টা আরো বেড়ে গেল। মুজিব নাকি ঘোরতর কমিউনিস্টবিরোধী। মুজিব লোকটা কেমন, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন কী সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে পারেননি। আমার কাছে সবটা ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া মনে হয়। কিন্তু একটা বিষয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মানুষটার ভেতর নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। নইলে তাঁর ডাকে এতগুলো মানুষ বেরিয়ে এল কেমন করে। আমি টি. ভি.-তে মুজিবের অনেকগুলো জনসভার ছবি দেখেছি। দেখার সময় শরীরের পশম সোজা হয়ে গিয়েছিল। এরকম মারমুখী মানুষের ঢল আমি কোথাও দেখেছি মনে পড়ে না। মনে মনে কল্পনা করতাম অনুশীলন, যুগান্তর এ-সকল বিপ্লবী পার্টির প্রভাবে এই গণসংগ্রাম জন্ম নিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, আমার মধ্যে যথেষ্ট ইনফর্মেশন গ্যাপ ছিল। ফ্রান্সে আমার এক ইন্ডিয়ান বন্ধু আছেন। তাঁর ছোট ভাই ওয়েস্ট বেঙ্গল কংগ্রেসের এক হোমড়াচোমড়া ব্যক্তি। বেলেঘাটার দিকে বাড়ি। গত পরশুদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে এবং পাকিস্তান আর টিকে থাকতে পারছে না। আমি তাঁর সরল বিশ্বাসের কোনো প্রতিবাদ করিনি। রকম-সকম দেখে মনে হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে

সামান্য অধিকার আমার আছে, তা দিয়েই বলতে পারি ভারতবর্ষের ব্যাপারে একজাতিতত্ত্ব এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব কোনোটাই খাটে না। আসলে ভারতবর্ষ বহুজাতি এবং বহু ভাষার একটি মহাদেশ। উনিশশো সাতচল্লিশে ধর্মের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে অন্য সব প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়েছিল। আরো একটা কথা, নানা অনগ্রসর পশ্চাৎপদ জাতি এবং অঞ্চলের জনগণ তাদের প্রকৃত দাবি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই আপাত-সমাধান হিসেবে ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটির জন্ম হয়েছিল। পরিস্থিতি যে-রকম দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান ভেঙে পড়বেই, ভেঙে পড়তে বাধ্য। বাংলাদেশ একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র জন্ম নিতে যাচ্ছে। একথা যদি বলি আশা করি অন্যায় হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। তারপরে ভারতকে একই সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আঞ্চলিক জাতিগত ধর্ম এবং ভাষাগত বিচ্ছিন্নতার দায় মেটাতে গিয়ে ভারতবর্ষের কর্তাব্যক্তিদের হিমসিম খেতে হবে। এমনকি ভারতের ঐক্যও বিপন্ন হতে পারে।

মনে মনে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এই কলকাতা শহরে ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন আমি একজন বিপন্ন ব্যক্তি মাত্র। আপন অন্তর্গত বেদনার ভারে সর্বক্ষণ কুঁজো হয়ে আছি, আপন হৃদয়ের উত্তাপে সর্বক্ষণ জ্বলছি। কোথাও পালিয়ে গিয়ে দুঃখগুলো নাড়াচাড়া করব সে রকম কোনো ঠাঁই নেই। কেউ আমাকে নিছক আমি হিসেবে দেখতে রাজি নয়। যেখানেই যাই ভারত-পাকিস্তান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এসব এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এ এমন জটাজাল ছাড়াতে চাইলেও ছাড়াতে পারিনে। 'হাম কমলি কো ছোড়নে মাংতা, মাগার কমলি হামকো নেহি ছোড়তা।' আমি যেখানেই যাই বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা ওঠে। বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা উঠলেই চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকার কথা আপনিই এসে পড়ে। বাংলাদেশের এককোটির মতো মানুষ ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার জন্য যেন আমি দায়ী। চীনা অস্ত্রে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের জনগণকে হত্যা করছে, সেজন্যও আমি ছাড়া দায়ী কে? বিশ্ববিবেক বাংলাদেশের এই দুঃখের দিনে কোনোরকমের সাড়া দিচ্ছে না, তার জন্যও আমাকে ছাড়া কাকে দায়ী করব? আমিই হলাম গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সমস্যা সঙ্কটের অঙ্কুর। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার যদি জন্ম না হত...।

তায়েবা হাসপাতালে পড়ে আছে। তার সাংঘাতিক ক্যান্সার, ডাক্তার বলছে সে বাঁচবে না। এই বেদনার ভার আমি কী করে হালকা করি। যতই চেষ্টা করি না কেন আমার ভেতরের সঙ্গে বাইরের কিছুতেই মেলাতে পারিনে। পৃথিবী চলছে তার আপন নিয়মে। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে রক্ত আসতে চায়। কী করব স্থির করতে পারিনে। ঘটনাস্রোত আমার সমগ্র অস্তিত্বকে এমন একটা গহ্বরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে, সারাজীবন চেষ্টা করলেও বোধকরি বেরিয়ে আসতে পারব না। সময় তার জটাজাল প্রসারিত করে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

এরই মধ্যে সুনীলদা বাজার সেরে এসে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। মজহার, সুলীলদা, অর্চনা, প্রমোদবাবু উনারা কথা বলে যাচ্ছিলেন। আমার কিছু বলতে

প্রবৃত্তি হচ্ছিলো না ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে এক দৌড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু যাব কোথায় ? প্রায় অর্ধেক কলকাতা শহর ঘুরে একটুখানি সান্ত্বনার প্রত্যাশায় তো এ বাড়িতে এলাম। অর্চনার আজকের রকম-সকম দেখে মনে মনে ভীষণ ব্যথিত হলাম। আমি জানি তায়েবা মারা যাচ্ছে। কারো করার কিছু নেই। আমারও না, অর্চনারও না। তবু অর্চনা যখন আগ্রহী হয়ে তায়েবার অসুখের কথা জিগগেস করে, আমাকে মিথ্যে আশ্বাসে আশ্বস্ত করে, আমি মনে মনে শান্তি পাই। আমি শান্তি পেলে কি তায়েবা বাঁচবে ? না বাঁচবে না। সে মারা যাবে, তাকে মারা যেতেই হবে। মারা যাবার জন্যই সে অতি কষ্টে সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতা শহরে এসেছে। আসলে সংকট আমার ভেতরে। তায়েবাকে উপলক্ষ করে একটা আবরণ তৈরি করে নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

সুনীলদা এক পর্যায়ে সমস্ত আলোচনাটা তাঁর সেই সুবিখ্যাত শান্তির থিয়োরির দিকে টেনে নিলেন, জানেন প্রমোদ দা ভেতরের টেনশনই হল দুনিয়ার সমস্ত অশান্তির উৎস। যুদ্ধ, বিভীষিকা, মানুষে মানুষে সংঘাত এসব হল ভেতরের টেনশনের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। এগুলো থেকে মুক্তি না পেলে পৃথিবীর অসুখ কখনো সারবে না আর মানুষও কোনোদিন শান্তি পাবে না। ক্ষণিক ঘটনার দিকে না তাকিয়ে সমস্যার মূলটাই আমাদের দেখা উচিত। প্রমোদবাবু ফস করে জিগগেস করে বসলেন, কীরকম। এই যে ধরুন মানুষের রিপুগুলো আছে না, তারাই তো মানুষকে সংঘাতের শান্তিনাশা পথে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং মানুষের প্রথম লক্ষ হওয়া উচিত এইসব রিপু থেকে মুক্ত হওয়া। প্রমোদবাবু বললেন, তার কোনো পথ আছে কি ? আছে, আছে প্রমোদ দা। তা হলে তো মানুষ থাকবে না, সব দেবতা হয়ে যাবে। প্রমোদ দা, মানুষ তো আসলে দেবতাই, জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে বিচার করতে পারে না বলেই সে পশু হয়ে যায়। প্রমোদবাবু বললেন, সুনীল তোমার কথাগুলো অত্যন্ত চমৎকার। আমি অনেক বছর ইউরোপে থেকেছি। সুতরাং আস্থা স্থাপন করতে পারব না। অর্চনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, দাদা তুমি প্রমোদদার সঙ্গে চুটিয়ে শান্তিচর্চা করতে থাকো। রান্না হওয়ার বেশ দেরি আছে। আমি দানিয়েলকে নিয়ে গেলাম। বেচারি কষ্ট পাচ্ছে। তারপর ইসলামের দিকে তাকিয়ে বললেন, দয়া করে আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি একটু দানিয়েলকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।

অর্চনা আমাকে ভেতরের ঘরে বসিয়ে ফ্যানটা ছেড়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, দানিয়েল, তোমার খবর বলো। কোনো দুঃসংবাদ নেই তো। কেমন আছেন তায়েবাদি ? আমি বললাম, যেমন দেখেছিলে সেরকমই আছে। তা তোমার মুখ-চোখ অমন শুকনো কেন ? এই সময়ে তোমাকে তো শক্ত হতে হবে। আমি বললাম, শক্তই তো আছি, যতটুকু থাকা যায়। অর্চনা ভ্রূ কুঁচকে বলল, তোমার চোখমুখ কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে। বললাম, আমার পক্ষে কোথাও স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। চারদিক থেকে এমন একটা চাপ এসে আমার ওপর পড়ছে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিনে। অর্চনা আমার কাঁধে হাত দিয়ে কণ্ঠস্বরটা খুবই নামিয়ে

অনেকটা ফিসফিস করে জিগগেস করল, দানিয়েল তুমি তায়েবাদিকে খুবই ভালোবাসো, তাই না ? তার কথার জবাব দিতে গিয়ে আমার মুখে কথা আটকে গেল। সহসা কোনোকিছু বলতে পারলাম না। অর্চনা আমার মানসিক অবস্থাটা আঁচ করে বলল, দানিয়েল তুমি বরং আরেক কাপ চা খাও এবং একটু শান্ত হয়ে বসো। আমি একটু ভেতর থেকে আসি। বড়জোর দশ মিনিট। তার বেশি নয়।

শোভা মেয়েটি চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মনে হল বাইরের গরম ভেতরের গরমকে অনেকখানি কাবু করে ফেলেছে। আমার ভাবাবেগ অনেকখানি প্রশমিত হয়ে এসেছে। আমি সমস্ত বিষয় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করতে পারছি। বাইরের ঘরের টুকরো টুকরো আলাপ কানে আসছে। ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ হিন্দু মুসলমান চীন রাশিয়া আমেরিকা, বাঙালি, অবাঙালি, শেখ মুজিব, ভাসানী, ইন্দিরা গান্ধী নকশাল কংগ্রেস সি. পি. এম., এ সকল বিষয় আলোচনায় বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে। আমি সেখানেই যাই সেখানেই মাটি ফুঁড়ে একটি বিতর্ক জেগে ওঠে। আমার জন্মই যেন একটা মস্ত বড় বিতর্কের বিষয়। আমি যদি জন্ম না নিতাম, এতগুলো মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে আসত না, তায়েবার অসুখ হত না, যে সকল সংকট সমস্যা পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহের গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার কিছুই ঘটত না। দুনিয়াতে যেখানে যা-কিছু ঘটছে তার জন্য যেন আমিই দায়ী। আমাকে নিন্দা করতে হয়, পক্ষ নিতে হয়। মনে হচ্ছে আমি দুনিয়াজোড়া প্রসারিত একটা শক্ত মাকড়সার জালের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। হাজার চেষ্টা করেও তার নাগপাশ ছিন্ন করতে পারব না।

অর্চনা ভেতরের ঘর থেকে এসে জিগগেস করল, চা খেয়েছ ? আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। সে আমার দিকে ক বার চোরাচোখে তাকাল এবং তারপর বলল, তায়েবাদির অসুখটা বেশ জটিল। খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন এমন তো মনে হয় না। তুমি কী মনে কর ? জবাব দিলাম, তায়েবা আর অসুখ থেকে কোনোদিনই সুস্থ হয়ে উঠবে না এবং এটাই তার শেষ অসুখ। সে আমি বিলক্ষণ জানি, তায়েবা জানে এবং তার মা-বোন-আত্মীয়স্বজন সকলেই জানে। কোন দিনটিতে সে মারা যাবে সে সংবাদটি আমরা কেউ জানিনে। সেটাই হয়েছে চূড়ান্ত সমস্যার বিষয়। অর্চনা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, দানিয়েল তুমি সময়বিশেষে ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পার। আমি বললাম, তুমি এর মধ্যে নিষ্ঠুরতার কী পেলে ? যেকথাটি সকলে জানে শুধু সঙ্কোচবশে প্রকাশ করছে না, সেকথাটিই আমি বলেছি। আচ্ছা দানিয়েল তোমাকে একটা কথা জিগগেস করব ? আমি বললাম, হ্যাঁ করো। ধরো যদি তায়েবাদির কিছু একটা ঘটে যায় তুমি কি খুব কষ্ট পাবে ? একথা কেন জানতে চাইছ ? তোমার আর তায়েবাদির সম্পর্কটা ভারি অদ্ভুত। আমার কী মনে হয় জান, হঠাৎ করে তায়েবাদি যদি এ অসুখটাতে না পড়তেন, তোমরা যে একে অন্যকে ভালোবাসো, সেটা এমন করে অনুভব করতে পারতে না। অর্চনার কথা শুনে সহসা আমার মুখে কোনো কথা জোগাল না। আমি চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম।

তায়েবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী ধরনের। সে কি আমাকে ভালোবাসে ? আমিও কি তাকে ভালোবাসি ? তার সঙ্গে আমার পরিচয় চার বছরেরও অধিক। কখনো এমন করে আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে হয়নি। আজকে অর্চনার কথা শোনার পর আমাকে নিজের ভেতর ডুবে যেতে হল। তায়েবার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে আমাদের মধ্যে যা যা ঘটেছে একে একে মনের মধ্যে খেলে যেতে থাকল। খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকল। আমি স্পষ্টই অনুভব করলাম, সব সময়ই আমার মন তায়েবার দিকে বলগাহারা অশ্বের মতো ছুটে গিয়েছে, কিন্তু যখনই কাছাকাছি গিয়েছি, থমকে দাঁড়াতে হয়েছে, হৃদয় মন রক্তাক্ত করে ফিরে আসতে হয়েছে। তার সমস্ত অস্তিত্ব তার পার্টির ভেতর প্রোথিত। বারবার মনে হয়েছে সে যেন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত একটা মানবদুর্গের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দি এক নারী। এই দুর্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার কথা সে যেমন চিন্তা করতে পারে না আমিও তার ভেতর প্রবেশ করব কখনো মেনে নিতে পারিনি। আমরা পরস্পরের প্রতি যতদূর আকর্ষণ অনুভব করেছি, ঠিক সমান পরিমাণ বিকর্ষণ আমাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। তার পরেও তায়েবা যখন ডেকেছে ছুটে গেছি, হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে তার পায়ে অঞ্জলি দেব ভেবেছি। কিন্তু পরক্ষণেই এমন কিছু ঘটেছে আমাকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়ে বুকের ভেতর একটা জখম নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে অর্চনা জিগগেস করল, দানিয়েল কী ভাবছ ? আমি বললাম, আর ভাবাভাবির কী আছে, যা ঘটবার ঘটে যাবে। শোনো দানিয়েল একটা কথা তোমাকে বলি। তায়েবাদির হাসপাতালে তোমার আরো বেশি সময় থাকা উচিত। তুমি থাকলে উনি খুবই হাসিখুশি থাকেন। আমি বললাম, তার কাছাকাছি থাকতে পারলে আমারো ভালো লাগে। কিন্তু তার পার্টির মানুষেরা আমার দিকে এমন চোখে তাকায়, আমি খুবই বিব্রত বোধ করি। উনারা চোখমুখের এমন একটা ভঙ্গি করেন যেন আমি তায়েবাকে দেখতে এসে মস্ত একটা অপরাধ করে ফেলেছি। আর তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা হলেই একটা না একটা খোঁটাখুঁটি লেগে যায়। শেষে তায়েবার ওপর সবকিছুর চাপটা গিয়ে পড়ে। তার রোগের যন্ত্রণাটা বেড়ে যায়। এটা এমন একটা জটিল এবং বিদঘুটে ব্যাপার তোমাকে সবটা খুলে বোঝাতে পারব না। অর্চনা বলল, কিছু কিছু বুঝতে পারি। তবু একটা কথা বলব, তুমি ভয়ানক একরোখা এবং জেদি, নিজের দিকটা ছাড়া আর কিছু দেখ না। বিশেষ বিশেষ সময়ে মানুষকে নমনীয় হতে হয়। আমি বললাম, তুমি আমাকে আমি যা নই তা হতে বলছ, সে তো সম্ভব নয়। দূর দানিয়েল আমি কী বলতে চাইছি, তুমি কিছুই বুঝতে পারনি। যাক, এখন তুমি কী করতে চাও, সেটা বলো। আমি তোমার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ করব বলে এসেছি। অর্চনা বলল, বলে ফেল। তায়েবা তোমার খুব তারিফ করেছে। তার কথা শুনে মনে হয়েছে, সে মনের ভেতর থেকে তোমাকে খুব্‌ই পছন্দ করে। যে সমস্ত মানুষজন ওখানে আসে তার বেশির ভাগই তাকে একভাবে না একভাবে জখম না করে ছাড়ে না। অথচ সে কাউকে কিছু বলতে পারে না। সমস্ত পরিস্থিতিটাই এমন

হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোথাও থেকে একটি সান্ত্বনার বাক্য শোনার সুযোগ নেই। তার যারা একেবারে কাছের মানুষ, তাদের দেখলে সে মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তুমি যদি এক আধটু সময় করে হাসপাতালে যাও, এটা ওটা বলে তার মনটা একটু হালকা রাখতে চেষ্টা কর, ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।

অর্চনা বলল, দানিয়েল তোমার বলার প্রয়োজন ছিল না। আমি তো এমনিতেই তায়েবাদিকে দেখতে প্রতিদিন যাচ্ছি। তাঁকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। একেবারে খড়খড়ে মহিলা। কোথাও কোনো স্যাঁতস্যাঁতেপনা নেই। কিন্তু তুমি যে বললে আমি এটা ওটা বলে তার মনটা হাল্কা করতে পারব, এটা বোধ করি সত্যি নয়। আমি জিগগেস করলাম, তুমি একথা বললে কেন ? অর্চনা বলল, সব কথার কারণ জানতে চাও কেন ? আমি আর কথা বাড়ালাম না। অর্চনা বলল, আজ দুপুরে আমাদের এখানে খেয়ে যাও। আমি বললাম, না অর্চনা তা হয় না। আমাকে বাংলাদেশের ছেলেদের সঙ্গেই খেতে হবে। আর তা ছাড়া ইসলাম সাহেব ততক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি হবেন না। ভদ্রলোককে আমি একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছি। বাইরের ঘরে যখন এলাম, দেখি মজহারুল ইসলাম সাহেবের কাছে প্রমোদবাবু তাঁর কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিচারণ করছেন। এই ফ্রান্সপ্রত্যাগত ভদ্রলোকটিকে আমার মনে ধরেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে হয়তো কোনো ব্যাপারে আমার মতের মিল হবে না। কিন্তু তাঁর চরিত্রের একটি দিক আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। প্রমোদবাবু এখনো মনে করেন, জাতি হিসেবে বাঙালির একটি স্বাধীন অবস্থান সৃষ্টি হবে। এটা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। যদিও নানা পরস্পরবিরোধী মতামতের দ্বন্দ্ব দেখে তাঁর মনে নানারকম সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমি বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম। আরেক দিন সময় করে এসে গল্প করে যাব। প্রমোদবাবু বললেন, কাল আমি আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প দেখতে সীমান্ত এলাকায় যাব। হয়তো দু চার দিন থেকে যেতে হবে। আমি বাড়িতে আছি কি না খবর নিয়ে আসবেন। আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করার ইচ্ছে। আমি বললাম, আপনি একা একা সীমান্ত এলকায় যাবেন কোনো অসুবিধে হবে না ? তিনি জবাবে বললেন, ত্রিগুনা সেন হলেন তাঁর এক বন্ধুর মামা। ত্রিগুনাবাবু তাঁকে বি.এস. এফ.-এর এক কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। কর্নেল সাহেবই তাঁকে নিয়ে যাবেন।

অর্চনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ার পর মজহারুল ইসলাম সাহেব বললেন, মশায় আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। একবার ইসলামের ধুয়ো তুলে দেশ ভাগ করলেন। আবার এখন বাঙালিত্বের ধুয়ো তুলে কী সমস্ত বিষাক্ত মতামত এখানে ওখানে ছড়াচ্ছেন। দুনিয়াতে পাগলের সংখ্যা তো অল্প নয়, বস্তাপচা বাঙালি জাতীয়তার কথায় বিশ্বাস করে এমন মানুষও দেখি পাওয়া যায় ভূড়িভূড়ি। আমি বললাম, পাওয়া যাবে না কেন ? মশায় দেখছি আপনারা আমাদের অনেক জ্বালাবেন। আমি বল্লাম, আল্লাহ্ আমাদের জ্বালাবার ক্ষমতাটুকুই শুধু দিয়েছেন। তিনি একটা চারমিনার ধরিয়ে বললেন, রাখেন আপনার আল্লাহ্, আজকের গোটা দিনটিই নষ্ট হল।

দশ

দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর মাস চলে এসেছে। হাসপাতালে যাওয়া আমার নিত্যিদিনের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্য কোনো কাজকর্ম না থাকলে দিনে দু-বারও যাই। রোজই দেখতে পাচ্ছি তায়েবার প্রাণশক্তি আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসছে। এখন সে নিজের শক্তিতে বিছানা থেকে উঠতে পারে না, তাকে তুলে বসাতে হয়। ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়। কলকাতায় আমাদের জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে উঠেছে। তায়েবার মা, দুবোন, বড় ভাই সকলেই কলকাতায় আছেন। তার পার্টির কর্মীরাও নিয়মিত আসে, দেখাশোনা করে। কিন্তু তায়েবা শুয়ে থাকে। বড় বড় চোখ পাকিয়ে সবকিছু দেখে। খুব কমই কথা বলে। আগে যে তায়েবাকে দেখেছে, এ অবস্থায় দেখলে মনে হবে এই শরীরের মধ্যে আগের তায়েবার কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে যখন শুয়ে থাকে, দেখলে আমার মরা নদীর মতো মনে হয়। গতি নেই, স্পন্দন নেই। আমার বুকটা ধক করে ওঠে। কী যে বেদনার স্রোত বয়ে যায় সে আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এখনো জাহিদুল আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। ডোরা দেখলে অপ্রস্তুত বোধ করে। এমন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটিয়ে তোলে, তার অর্থ দাঁড়ায় তুমি এখানে কেন ?

কারো কোনো মন্তব্য আমি আর গায়ে মাখিনে। আমার সঙ্গে কেউ কথা বলুক, না-বলুক আমার কিছু যায় আসে না। আমি যখন তার কেবিনে ঢুকি দেখামাত্রই তায়েবার ঠোঁটে একটা ক্লান্ত সুন্দর হাসির রেখা জেগে ওঠে। তার এই হাসিটাই আমাকে সবকিছু অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছে। আমার ইচ্ছে করে তার হাত পায়ে হাত বুলিয়ে দিই। মাথার উড়োউড়ো রুক্ষ চুলগুলো ঠিক করে রাখি। খসে-পড়া সাপের খোলসের মতো এলমেলো শাড়িটা গুছিয়ে ঠিক করে পরিয়ে দিই। কিছুই করতে পারিনে আমি। সব সময় ঘরভর্তি মানুষ তাকে পাহারা দিয়ে রাখে। আমাকে মনের বেদনা মনের ভেতর চেপে রাখতে হয়।

আমাদের বেঁচে থাকাটাই একটা সংগ্রাম। পরের বেলার ভাত কীভাবে জোটাব সেজন্য অনেক ফন্দিফিকির করতে হয়। ভাগ্যগুণে একটা থাকার জায়গা পেয়েছি। সেখানে যারা থাকে সকলের অবস্থাই আমার মতো। যেখান থেকে যে পয়সা সংগ্রহ করে আনি, ও দিয়ে সকলে মিলে ভাত খাওয়া সম্ভব হয় না। প্রায় সময় আমাদের মাদ্রাজি দোকানে দোসা খেয়ে কাটাতে হয়। তার ওপর আমার আবার সিগারেট খাওয়ার নেশা। রোজ তায়েবার পেছনে কম করে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করতে কী পরিমাণ বেগ পেতে হয় বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

এখানে সেখানে লেখালেখি করে অল্পস্বল্প অর্থ আমি আয় করেছি। তার পরিমাণ খুবই সামান্য। বাংলাদেশের নানা চেনাজানা মানুষ কিছু টাকা-পয়সা দিয়েছে। অস্বীকার করব না, প্রিন্সেপ স্ট্রিটে অস্থায়ী সরকারের অফিস থেকেও নানা সময়ে কিছু টাকা আমাকে দেয়া হয়েছে। কলকাতার মানুষেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সহায়ক সমিতির সাধারণ

সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী অল্পস্বল্প কাজ করিয়ে নিয়ে, সে তুলনায় অনেক বেশি টাকা আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু টাকার এমন ধর্ম, পকেটে পড়ার সাথে সাথে উধাও হয়ে যায়। যেদিকেই তাকাই প্রয়োজন গিলে খাওয়ার জন্য হাঁ করে ছুটে আসে।

আমি কিছু কাজ করতে চেয়েছিলাম। বেশি নয় অন্তত দিনে পাঁচটা টাকা জোটাবার জন্য আমি কিছু কাজ করতে চাই। তিন ঘণ্টা কুলিগিরি করেও যদি পাঁচটি টাকা পাই আমি করতে রাজি। ওই টাকাটি না পেলে আমার পক্ষে তায়েবার হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হবে না। আর ইদানীং একটা সঙ্কোচবোধ আমাকে ভয়ানক আড়ষ্ট করে ফেলেছে। তায়েবার কথা বলে চাইলে ওই টাকাটা হয়তো আমি কারো না কারো কাছ থেকে আদায় করতে পারি। আমার চেনাজানা মানুষের সংখ্যা নেহায়েত অল্প নয়। নানা সময়ে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাদের কাছে হাত পেতে চেয়ে নিতে কোনোরকমের কুণ্ঠা বোধ করিনি। তায়েবার অসুখের নাম করে কারো কাছে টাকা চাওয়া গেলেও আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব হবে না। দু-তিন দিন আগে অর্চনা হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে রেস্টুরেন্টে চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানেই সে আমার হাতে পাঁচশো টাকার একটি নোট দিয়ে বলেছিল, দানিয়েল, টাকাটা রাখো। এ সময়টাতে তোমার বোধ হয় খুবই টানাটানি চলছে। আমি হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সময়ে পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। তথাপি অর্চনার টাকাটি আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলাম, টাকাগুলো তোমার কাছে থাকুক, আমার যখন খুব প্রয়োজন পড়বে চেয়ে নেব। অর্চনা বললো, তুমি বরাবর একগুঁয়ে। আর তাছাড়া... । তাছাড়া কী ? তুমি আমাকে বন্ধু মনে কর না। আমি বললাম, অর্চনা আমি তোমাকে ঠিকই বন্ধু মনে করি, এই কলকাতা শহরে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যার কাছে আমার মনের বোঝা হাল্কা করতে পারি। তুমি না থাকলে নিঃসন্দেহে আমার কষ্ট অনেক গুণে বেড়ে যেত। আমার টাকার ভীষণ প্রয়োজন, তথাপি তোমার টাকাটি গ্রহণ করতে পারব না। দয়া করে কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি। অর্চনা টাকা ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, বক্তৃতাটি কি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল না ? আমি কোনো কথা না বলে গড়িয়াহাটার ট্রামে না উঠা পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিলাম।

আমি যে কিছু কাজ করতে চাই একথা বন্ধুবান্ধব অনেককেই বলেছি। সেদিন সন্ধেবেলা হাসপাতাল থেকে বৌবাজারের হোস্টেলে ফেরার পর নরেশদা জানালেন সৌগতবাবু একটা কাজের খবর দিয়ে গেছেন। শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটিকে আমি কখনো পছন্দ করিনি। তাই তাঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে আলাপ পর্যন্ত করা হয়নি। আজ তিনি আমার চূড়ান্ত বিপদের সময় এত বড় একটা উপকার করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলাম। নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকলাম। না জেনে, না শুনে, না বুঝে, কত সময় আমরা মানুষের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করি। নরেশদা একটুকরো কাগজ আমার হাতে তুলে দিলেন। দেখলাম লেখা রয়েছে

অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক সাপ্তাহিক নতুন খবর, ৯১ নম্বর মঠ লেন, কলকাতা-৯১। নরেশদাকে জিগগেস করলাম, নতুন খবর নামে কলকাতায় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে তা তো জানতাম না। আমাকে কী ধরনের কাজ করতে হবে কিছু বলেছেন নাকি ? তিনি জবাবে বললেন, না সেসব কিছু বলেননি। শুধু তোমাকে আগামীকাল সাড়ে নটার সময় তৈরি থাকতে বলেছেন, তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। সেদিন বাংলাদেশের ছেলেরা কেউ হোস্টেলে ছিল না। সকলে মিলে হাওড়াতে একটা অনুষ্ঠান করতে গেছে।.ঘর ফাঁকা। আমার ঠিক কী হয়েছে, খুলে বলতে পারব না। যখন অধিক লোকজন থাকে একটুখানি নির্জনতার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। আর যখন লোকজন থাকে না নির্জনতা বোঝার মতো বুকের ওপর চেপে বসে। নরেশদার ভেতর কী ঘটছে অনেকদিন জিগগেস করা হয়নি। অঞ্জলি কলকাতা আসতে চায় কি না। তার বাবা মা এখন রাজার মঠে বড় ভায়ের বাসায় কী অবস্থায় আছেন, ভদ্রতার খাতিরে হলেও এসকল সংবাদ জিগগেস করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার কোনো কথা বলার প্রবৃত্তি হল না। তিনি জিগগেস করলেন, এখন কী করবি ? আমি বললাম, ঘুমোব কাল সৌগতবাবুর সঙ্গে যাবি ? হ্যাঁ বলে মশারিটা নামিয়ে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময় সৌগতবাবু এসে হাজির। বললেন, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিন। অনিমেষদা আবার সময়নিষ্ঠ মানুষ। তাঁকে কথা দিয়েছি ঠিক দশটার সময় আমরা আসব। অধিক কথা না বাড়িয়ে জামাকাপড় পরে সৌগতবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। বাসের জন্য বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল। আমরা যখন মঠ লেনে এসে নামলাম দশটা প্রায় বাজে। প্রচণ্ড ভিড়ে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছি। নতুন খবরের অফিসে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিল না। মঠ লেন বড় ঘিঞ্জি জায়গা, আমাদেরকে প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে একটি সেকেলে লাল ইট বের হওয়া দালানের তিনতলায় উঠতে হল। সিঁড়ির বাঁদিকে ছোট একটি নেমপ্লেট লাগানো। দরোজা খোলাই ছিল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। অফিস কামরাটি খুব বড় নয়। একপাশে দেখলাম দু জন কম্পোজিটর কম্পোজ করছে। টাইপের খাঁচার পাশ ঘেঁষে একটা চিকন লম্বা টেবিল পাতা। একজন অল্পবয়েসী মানুষ বসে বসে প্রুফ কাটছে। মাঝখানটিতে সম্পাদক অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেবিল। একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে ভদ্রলোক রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। ভদ্রলোকের খুব ধারালো চেহারা। নাকটি তীক্ষ্ণ এবং বাঁকানো। গোঁফজোড়া ছুঁছালো করে ছাঁটা। পরনে ধুতি এবং মটকার পাঞ্জাবি। ভদ্রলোকের চোখজোড়া ভীষণ উজ্জ্বল। বয়েস কত হবে বলা মুশকিল। পঁয়তাল্লিশ হতে পারে, আবার পঞ্চান্নও হতে পারে। কিছু মানুষ আছে যাদের চেহারা দেখে বয়েস আন্দাজ করা যায় না।

সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় নমস্কার করে বললেন, এই যে অনিমেষদা দেখলেন তো কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এসে হাজির হয়েছি। অনিমেষবাবু তাঁর রিভলভিং চেয়ারে

একটুখানি নড়ে চড়ে বসলেন। টেবিল থেকে পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে নাড়া-চাড়া করলেন। তারপর বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে বললেন, বসো বসো সৌগত, একটা কাজের মতো কাজ করে বসে আছ দেখছি। জীবনে তোমাকে এই প্রথম সময় রক্ষা করতে দেখলাম। তারপর তোমার পকেটবিপ্লবী দলের সংবাদ কী। এই বুঝি তোমার নতুন কমরেড।

সৌগত অনিমেষবাবুর অন্যসব কথার জবাব না দিয়ে বললেন, আপনি একজন অনুবাদক চেয়েছিলেন। আমার ধারণা ইনি ভালো অনুবাদ করতে পারবেন। ভদ্রলোক বাংলাদেশ থেকে এসে ভীষণ অসুবিধেয় পড়ে গেছেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয়ার ভীষণ অসুখ। আপনি যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন। এবার তিনি আপাদমস্তক আমাকে একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর জানতে চাইলেন, আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ? আমি মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, বাংলাদেশ মানেই তো অসুবিধে। ওই মুসলমানের দেশে এতদিন পড়েছিলেন, আগে চলে আসেননি কেন ? ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি একরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। আমার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না। কী বলতে হবে খুঁজে না পেয়ে সৌগতবাবুর দিকে তাকালাম। দেখি তিনিও মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তিনি আমার চাইতে কম অবাক হননি।

সৌগতবাবু আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করলেন, আপনি অনুবাদ করার লোক চেয়েছিলেন, আমার ধারণা ইনি ভালো অনুবাদ করবেন, আপনি টেস্ট করে দেখতে পারেন। আরেঁ রাখো তোমার টেস্ট, আগে কথাবার্তা বলতে দাও। তারপর অনিমেষবাবু আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, কী মশায় চুপ করে আছেন, আগে চলে আসেননি কেন ? আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম, আগে চলে আসব কেমন করে ? তিনি ফের জিগগেস করলেন, এখন কী করে চলে আসতে পারলেন ? আমি বললাম, পাকিস্তানি মিলিটারি আক্রমণ করে বসল, তাই বাধ্য হয়ে...। আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগে ভদ্রলোক কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললেন, মুসলমানদের লাথি ঝাঁটা এতদিন খুব মধুর লেগেছিলো তাই না, এখন মুসলমানে মুসলমানে লাঠালাঠি লেগেছে, আপনারা সকলে একসঙ্গে হুড়মুড় করে আমাদের ওপর চড়ে বসেছেন। অগত্যা আমাকে বলতে হল, আমিও মুসলমান। তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। হলেনই বা মুসলমান। তাতে এমন কী এসে গেল। আমি মশায় সাফ কথার মানুষ। হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হয়েছে, হিন্দুদের সে দেশ থেকে অনেক আগেই চলে আসা উচিত ছিল। দেড় কোটিরও বেশি হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার জন্য আমাদেরকে দশ কোটি মুসলমানকে সহ্য করতে হচ্ছে। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ভারতবর্ষে চলে এলে আমরা মুসলমানদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করতাম। সব সমস্যার সাফ সাফ সমাধান হয়ে যেত। ওই হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার জন্যই ভারতকে মুসলমানে মুসলমানে মারামারি কাটাকাটিতে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। ভারতের কি আর কোনো

সমস্যা নেই ? সে কথাও থাকুক। ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ বলেই না হয় হিন্দুরা ভারতবর্ষে এসেছে। কিন্তু আপনারা কোন মুখে দলে দলে চলে এলেন ? আমি অনিমেষবাবুর কথায় রাগ করতে পারলাম না। আমার লেগেছে একথা সত্যি। তারপরেও মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসা না করে পারলাম না। তাঁর মধ্যে আর যা-ই হোক কপটতার বালাই নেই।

আমি মনে করলাম, আর বসে থেকে লাভ কী ? অন্তত একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো হল। আমি স্যান্ডেলে পা গলিয়ে বললাম, তা হলে আমি আসি। সৌগতবাবুকে আমার সঙ্গে আসতে বলব কি না ভাবনায় পড়ে গেলাম। অনিমেষবাবু বললেন, আপনার খারাপ লেগেছে বুঝতে পারি। কিন্তু আমি মশায় যা ভাবি বলে ফেলি। আমার ভেতর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কিছু পাবেন না। বসুন চা খান। চলে যাবেন কেন, আপনি তো কিছু কাজ চেয়েছিলেন। আমার তো একজন অনুবাদকের প্রয়োজন। তারপর তিনি কম্পোজিটরদের একজনকে ডেকে বললেন, ভূপতি যাও নিচে থেকে চা এবং সিঙারা নিয়ে এসো। উঠি উঠি করেও উঠতে পারলাম না। সৌগতবাবু বললেন, অনিমেষদা চা আনতে তো কিছু সময় লাগবে, ততক্ষণে আপনি দানিয়েল সাহেবকে টেস্ট করে দেখেন, অনুবাদে হাত আছে কি না। অনিমেষবাবু ধমক দিয়ে বললেন, সৌগত নড়াচড়া করবে না। ঠিক হয়ে বসো। আমি তোমাদের শখের কমিউনিস্টদের মতো হিপোক্রাইট নই। আমার অনুবাদের মানুষ দরকার উনি যদি ভালোভাবে করতে পারেন, অবশ্যই কাজ দেব। সহজ কথাটা সহজভাবে বলি বলে মনে করো না, আমার কোনো ভদ্রতা জ্ঞান নেই।

এবার অনিমেষবাবু অপেক্ষাকৃত সহজ ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন আমার বাড়ি কোথায়। আমি বললাম, চট্টগ্রাম। তিনি বললেন, আমাদের বাড়িও একসময় ওদিকে ছিল। পঞ্চাশের রায়টের পর সবকিছু বেচে-কিনে চলে এসেছি। আমি তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম কোথায় জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, না চট্টগ্রাম নয়, তবে সীমান্তের অপর পাড়েই তাঁদের বাড়ি। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায়। এরই মধ্যে চা এল, সিঙারা এল। আমার দিকে প্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, খান। চা খাওয়া শেষ হলে একটা সিগারেট খাওয়া যাবে কি না অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, ফিল ফ্রি। সংবাদপত্রের অফিসে আবার কেউ সিগারেট খাওয়ার অনুমতি চায় নাকি। তারপর তিনি আমাকে ইংরেজি টাইপ করা একটি প্রবন্ধ দিয়ে বললেন, একটা পৃষ্ঠা অনুবাদ করে দেখান, দেখি আপনার হাত কেমন। আমি একটু সরে বসে অনুবাদ করতে লেগে গেলাম। প্রবন্ধটির শিরোনাম হল আর্যদের আদি নিবাস। স্বামীজী বিরূপাক্ষ হলেন লেখক। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আর্যদের বহিরাগত প্রমাণ করে যেসকল বই-পুস্তক লিখেছেন, সেগুলো একেবারে প্রমাণসিদ্ধ নয়। আর্যদের আদি নিবাস হল ভারতবর্ষে। এই ভারতবর্ষ থেকেই আর্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার একটা পৃষ্ঠা অনুবাদ করতে আধঘণ্টার মতো সময় লাগল। তারপর আমি অনুবাদ করা অংশটি নিয়ে অনিমেষবাবুর টেবিলে রাখলাম। তিনি চশমা খুলে পড়ে দেখলেন। বললেন, আপনি তো মোটামুটি ভালোই অনুবাদ করেন। শুধু একটি শব্দ আমি পাল্টাচ্ছি। যেখানে সিন্ধুনদের পানি বলেছেন, আমি পানি কেটে জল শব্দটি বসাচ্ছি। আমি বললাম, জল পানিতে আমার কিছু আসবে যাবে না।

সৌগতবাবু বললেন, দেখি অনিমেষদা। তারপর মূল প্রবন্ধ এবং অনূদিত অংশ টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন। অনুবাদের অংশটি পড়া শেষ করে বললেন, তাহলে এখন থেকে আপনি আর্যদের আদি নিবাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই ধরনের প্রবন্ধের পাঠক এখনো পশ্চিবঙ্গে আছে নাকি। আপনার কাগজ কেউ পড়ে ? সৌগত তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। শখের কমিউনিস্টগিরি করে বেড়াও বলে দেখতে পাওনি। দশ বছর থেকেই প্রতি সপ্তাহে আট হাজার কাগজ ছেপে আসছি। বাজারে দেয়ার প্রয়োজন হয় না, গ্রাহকদের বাড়িতে আমি কাগজ পাঠিয়ে দেই। তারা আমাকে ডাকে চাঁদা পাঠান। তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তোমার মতো পশ্চিমবাংলায় সকলে বিটকেলে জাতখোয়ানো বামুন নয়। কিছু খাঁটি এবং সৎ ব্রাহ্মণ এখনো আছেন। সৎ হিন্দুও অনেকে আছেন। তাঁরা অনেকদিন থেকেই আমার কাগজ নিয়মিত পাঠ করে আসছেন। তুমি যদি দেখতে চাও আমি গ্রাহক লিস্ট দেখাতে পারি।

অনিমেষবাবুর খোঁচা খেয়ে সৌগত একটু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, বুঝলাম, সৎ হিন্দুরা আপনার কাগজ পড়েন। কিন্তু আপনি কাগজে কী লিখেন ? কেন আমি হিন্দুদের কথা লিখি। হিন্দুদের মহান ঐতিহ্যের কথা লিখি। স্বার্থের কথা লিখি। হিন্দুরা যে মহান জাতি সেকথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেই। অনিমেষবাবুর কথার মধ্যে কোনো জড়তা নেই। যে-কেউ তাঁর কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, তাঁর মন এবং মুখের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। অনিমেষবাবু বললেন, সৌগত আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার বাংলাদেশের কমরেডের সঙ্গে কথাবার্তাটা আগে ফয়সালা করে নেই। প্রতি সপ্তাহে এ রকম একটা করে প্রবন্ধ অনুবাদ করতে হবে। প্রতি হাজার শব্দে আমি পঁচিশ টাকা করে দিয়ে থাকি। আমাদের যিনি অনুবাদ করতেন, তিন-চার মাস যাবত অসুস্থ। বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। তোমার বন্ধু যদি রাজি থাকেন, তাঁকে কাজটা দিতে আমি প্রস্তুত। সৌগতবাবু বললেন, কিন্তু দাদা আমার একটা খটকা থেকে গেল। আপনার কাগজ হিন্দুদের কাগজ। একজন মুসলিম যদি অনুবাদ করে আর সে লেখা যদি আপনি ছাপেন, তাতে কেনো দোষ হবে না ? অনিমেষবাবু স্পষ্টভাবে বললেন, না কেনো দোষ হবে না। কেন দোষ হবে ? যদি হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা থাকত, তুমিও বুঝতে পারতে এতে দোষের কিছু নেই। আমি একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসেবে অনুভব করি সঠিক বিষয়টি চিন্তা করা ছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য নেই। যুগে যুগে ব্রাহ্মণেরা তাই করে এসেছে। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করেছে, বৈশ্যেরা ব্যবসা করেছে, শূদ্রেরা পরিশ্রম করেছে। আর ব্রাহ্মণ সব সময়ে বিধান দিয়েছে।

কেউ না কেউ ব্রাহ্মণের কাজ করে দিয়েছে। একজন গুণবান পণ্ডিত ব্রাহ্মণের লেখা একজন মুসলমান দিয়ে অনুবাদ করালে এবং সে লেখা হিন্দুদের পড়তে দিলে এতে দোষের কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনে।

সৌগতবাবু এবং অনিমেষবাবুর বিতর্কটি শুনে আমি তো দিশেহারা। ভাবনায় পড়ে গেলাম। কাজটা নেব কি না। আমার যে অবস্থা রাস্তায় কুলিগিরি হলেও আপত্তি ছিল না। আমার দৈনিক মাত্র পাঁচ ছয়টি টাকার প্রয়োজন। কুলিগিরিতে শারীরিক পরিশ্রম লাগে কিন্তু মানসিক নির্যাতন নেই। এই কাজটি গ্রহণ করলে তার চাইতে ঢের কম শ্রমে আরো বেশি আমি পেতে পারি। আমার অন্তরাত্মা বলছে, এই কাজের ভেতরে এমন কিছ আছে, গ্রহণ করলে আমি নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব। কিন্তু তায়েবার কথা মনে হওয়ায় বুকটা হুহু করে উঠল। কথা মেনে কথা দিলাম, অনুবাদের কাজটা আমি করব।

এগার

অনিমেষবাবুর অনুবাদের কাজটা গ্রহণ করার পর থেকে আমার মানসিকতার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আমার সেই উড়ু উড়ু ভাবটা অনেক পরিমাণে কমেছে। আসলে এতদিন আমার ভেতরে যে হা-হুতাশ চলছিল এবং যা আমি তায়েবার প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ মনে করে আসছিলাম, সর্বাংশে সঠিক নয়। আমার নিজের প্রতি নিজের যে কর্তব্যবোধ তা পালন করার অক্ষমতা থেকেই আমার ভেতরে ভাবাবেগ জন্ম নিচ্ছিল। তায়েবার চারপাশে যারা জড়ো হয়, যারা তাকে সকাল বিকেল দেখতে আসে আমি মনে করতাম, কেউ তায়েবার মঙ্গল চায় না। তারা আসে মজা দেখার জন্য, কষ্ট বাড়াবার জন্য অথবা জাহিদুল এবং ডোরার মতো নিজেদের কৃতকর্মের অপরাধবোধ লাঘব করার জন্য। আমি মনে করতাম, গোটা কলকাতা শহরে আমিই হলাম একমাত্র ব্যক্তি যে তায়েবার মঙ্গল চায়। আর সকলেই তায়েবার শত্রু।

দৈনিক দশ টাকা আয় করার জন্য তিন, সাড়ে-তিন ঘণ্টার কঠোর খাটুনি খাটতে গিয়ে আমার চোখ খুলে গেল। আমি আবিষ্কার করলাম তায়েবার চিকিৎসার যাবতীয় অষুধপত্তর সবটা হাসপাতাল দেয় না, বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তার পেছনে অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিনশো টাকা ব্যয় করতে হয় প্রতিদিন। এই টাকাটা কে সংগ্রহ করে, কার কাছ থেকে সংগ্রহ করে, কে অষুধ কেনে, কে পথ্য সরবারাহ করে কিছুরই সংবাদ জানিনে। অথচ আমি মনে করি আমি তায়েবাকে ভালোবাসি। এই ভালোবাসার দাবিতে না করতে পারব হেন দুঃসাধ্য কর্ম আমার নেই। তায়েবার দেখাশোনার সব দায়িত্বটা যদি আমার ওপর পড়ত, আমি কী করতাম। আমি মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। তার পার্টির মানুষদের আমি অপরাধী সাব্যস্ত করে বসে আছি। কিন্তু তারা তো টাকাটা ম্যানেজ করছে।

জাহিদুলকে আমি ক্রিমিন্যাল ধরে নিয়েছি। আমার বিবেচনায় ডোরা একটি নষ্ট মেয়ে। দু-তিনদিন আগে জানতে পেরেছি, জাহিদুল এখানে সেখানে ডোরাকে নিয়ে গিয়ে যে অনুষ্ঠান করায়, তাতে যে টাকাটা আসে, তার সবটা তায়েবার পেছনে খরচ করে। এমনকি দিল্লিতে গান গেয়ে যে টাকাটা ডোরা পেয়েছিল, ও দিয়ে আমেরিকা থেকে কী একটা দুষ্প্রাপ্য ইনজেকশন আনিয়েছে। ডোরা জাহিদুলকে বিয়ে করেছে, তাতে এমন অন্যায়টা কী হয়েছে। এরকম অনেক তো ঘটে। হেনাভাই একটা বিধবা মেয়েকে এ সময়ে বিয়ে করে অপরাধ কী করেছে, মহিলা এবং হেনাভাই পরস্পরকে পছন্দ করেই তো বিয়ে করেছে। আমি একাধারে যে সকলকে অপরাধী মনে করি, কেন। পৃথিবীর সকলে ঘোরতর পাপে লিপ্ত, আর আমি একা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এ কেমন করে হয়।

তায়েবার ক্যান্সারের জন্য অন্য সবাই দায়ি হবেন কেন ? ক্যান্সার রোগ তো আরো অনেকের হয়। এই ওয়ার্ডের অধিকাংশই তো ক্যান্সার রোগী। তারা কাকে দায়ী করে ? বড়জোর ভাগ্যকে ? আমি যে তায়েবার পক্ষ অবলম্বন করে মনে মনে এত লম্ফঝম্ফ করছি এ পর্যন্ত তায়েবার জন্য কী করতে পেরেছি ? হ্যাঁ এপর্যন্ত একটা কৃতিত্ব আমার আছে। তায়েবাকে সন্ধেবেলা হাসপাতালে প্রতিদিন দেখতে যাওয়ার খরচটা আয় করার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি। নিজের দীনতা, তুচ্ছতা এবং হীনম্মন্যতার পরিচয় পেয়ে একটা আত্মঘৃণা ঘুরে ঘুরে বারবার আমাকে দগ্ধ করতে থাকল। সেদিন সকালবেলা আমি হাসপাতালে গেলাম। ডা. মাইতি আমাকে একটা পাশের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলেন। দিনটি খুবই সুন্দর। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। হাওয়াতে সামান্য হিমেল পরশ। আকাশে চনচনে রোদ উঠেছে। শিশু-সকালের রোদে চারপাশের গাছপালা সব হাসছে। আমার মনের ভেতরে একটা ব্যথাবোধ ঢেউ দিয়ে জেগে উঠল। গাছপালা চিরদিন এমনই সবুজ থাকবে, সূর্য এমনি করে সুন্দর আলোকরাশি বর্ষণ করবে, এমনি করে মানুষজনের কলকাকলিতে রাজপথ মুখরিত হবে, রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি ঘোরা এমনি ধরনের আওয়াজ করে বাতাস কম্পিত করে তুলবে, শুধু থাকবেনা তায়েবা, জীবনের চলমান স্রোত থেকে বাদ পড়ে যাবে শুধু একজন। আল্লার দুনিয়ার এই পরিপূর্ণতার মধ্যে তার প্রস্থানের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। আমার এত বড় ক্ষতি আমি পূরণ করব কী করে।

তায়েবার কেবিনে যখন প্রবেশ করলাম, দেখে খুবই ভালো লাগল। সে উঠে বসেছে। সকালবেলা বোধ হয় গোসল করে ফেলেছে। খয়েরি রঙের একটা পাটভাঙ্গা শাড়ি পরেছে। তাকে খুবই প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। মুখে মনে হয় ক্রিম মেখেছে, ঘাড়ে পাউডারের দানা ছড়িয়ে আছে। হাসপাতালে আমি কোনোদিন তায়েবাকে এরকম হাসিখুশি দেখেছি মনে পড়েনা। আমার মনের ভেতরে একটা সূক্ষ্ম আশার রেখা খেলে গেল। তাহলে কি তায়েবার অসুখ সেরে যাবে !

আমাকে দেখামাত্রই তায়েবা কলকল করে উঠল। এই যে দানিয়েল ভাই এসে গেছেন। তার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটো কলি গুন গুন করে উঠল। 'এদিন আজি

কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।' পূর্বের দিনের মতো হাততালি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। জানেন দানিয়েল ভাই এই সকালবেলায় আপনি প্রথম মানুষ নন। আপনার আগেও একজন এসেছিলেন, কে বলুন দেখি। আমি বললাম, কেমন করে বলব কে এসেছিল। সে ঠোঁট দুটো একটুখানি ফুলিয়ে বলল, এসেছিল অর্চনাদি। আমি বললাম, এত সকালে অর্চনা কেমন করে এল। তার তো কোনো পাশও ছিলনা। তায়েবা জবাব দিল, অর্চনাদি চাইলে কী না করতে পারে। তার কত প্রভাব প্রতিপত্তি। এই হাসপাতালে ডা. সেনগুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি অর্চনাদির কী ধরনের আত্মীয় হন। ডা. সেনগুপ্তকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি আপনাকে বলেছিলাম না অর্চনাদি খুউব ভালো, আর খুউব রুচিবান মহিলা। দেখুন এই শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেছে। খুব সুন্দর না, আমাকে মানিয়েছে? আমি জিগগেস করলাম, এটা কি নতুন শাড়ি? সে কপট রাগের ভঙ্গি করে বলল। আপনি এখনো পর্যন্ত একটা মিষ্টি কুমড়ো, নতুন শাড়ির সঙ্গে পুরোনো শাড়ির পার্থক্য পর্যন্ত ধরতে পারেন না। এমন রং-কানা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তারপর তায়েবা বলল, অর্চনাদি আমাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে গোসল করিয়েছে। তারপর শাড়ি পরিয়েছে। আমার মুখে ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছে। ভীষণ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আমার অসুখবিসুখ কিছু নেই। অর্চনাদির শাড়িতে আমাকে মানিয়েছে? কই কিছু তো বললেন না? আমি বললাম হ্যাঁ, খুব মানিয়েছে। জানেন দানিয়েল ভাই, জীবনে আমি আপনার মতো বেরসিক মানুষ বেশি দেখিনি। আপনার কোনো ভদ্রতাজ্ঞান নেই। এমন মুখগোমড়া স্বভাবের মানুষকে অর্চনাদির মতো এমন একজন রুচিবান মহিলা কী করে সহ্য করেন, আমি তো ভেবে পাইনে।

তায়েবা কথাটা যত সহজ ভাবেই বলুক, শুনে আমার কেমন জানি লাগল। হাজার হোক মানুষের মন তো। আর কথাটা গায়ে না মেখে আমি বললাম, অর্চনার আমাকে সহ্য করার কী আছে? তাকে আমি আগে থেকে চিনতাম চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। এইতো সম্পর্ক। এ রকম অনেক মানুষই তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল, অর্চনাও তার একজন। আর তা ছাড়া...। তা ছাড়া আর কী। অর্চনা তোমাকে খুবই পছন্দ করে। একথা আমাকে বারবার বলেছে। তায়েবা বলল, অর্চনাদি আপনাকে খুব পছন্দ করে। আপনাকে পছন্দ করে বলেই আমাকে দেখতে আসে। আমার সঙ্গে অর্চনাদির তো সেরকম কোনো পরিচয় ছিল না। আমি বললাম, মানুষ একসূত্রে না একসূত্রে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তোমার সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল না। এখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হল। অর্চনাদি কী সুন্দর আর কী লম্বা আর কত লেখাপড়া জানে। আপনার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে। আমি বললাম, অর্চনা শুধু আমার বন্ধু, আর কিছু বলতে পারব না। এবার তায়েবা কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আপনি দেখতে একটুও সুন্দর নন, তবু এত ভালো মহিলাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হয় কী করে আমি বুঝতে পারিনে।

আমি বললাম, তোমার সঙ্গেও আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এটাকে তুমি কী বলবে ?

তায়েবা তার হাতটা আমার মুখে চাপা দিয়ে বলল, দানিয়েল ভাই, মনে আছে একবার আপনি সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। আপনি শুনেই কারফিউর মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি। পরের দিন সকালবেলা আপনাকে কত জায়গায় খুঁজে শেষ পর্যন্ত ড. মুনির চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, মনে আছে ? আমি বললাম, মনে থাকবে না কেন, ও-সমস্ত ঘটনা কেউ কি ভুলতে পারে। আচ্ছা সেদিন আপনি অমন করে চলে গিয়েছিলেন কেন ? আমি মনে মনে খুবই চেয়েছিলাম, আপনি রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে যাবেন। কোনোদিন বলিনি, আজ বলছি, খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম। আচ্ছা সেদিন থেকে গেলেন না কেন ? আমি বললাম, তুমি থাকতে বললে না কেন আমি বললে আপনি থাকতেন ? অবশ্যই থাকতাম ! আপনাকে থাকতে বলতে হবে কেন, আপনি নিজে থেকে গেলেন না কেন ? সব কথা কি বলতে হয় ?

তারপর তায়েবা আমার হাত ধরে বলল, দানিয়েল ভাই আপনাকে একটা কথা বলব, রাখবেন ? আমি বললাম, বলো। আগে বলুন রাখবেন ? আচ্ছা রাখব, এখন কথাটি বলো। আপনি আমাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে চলুন, চলুন আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। তার কথাটি শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তায়েবা পাগলামি করছে না তো। আমি তাকে কোথায় নিয়ে যাব। আর সে হাসপাতাল থেকে যাবেও বা কেমন করে। জবাব না দিয়ে আমি চুপ করে রইলাম। সে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, কী চুপ করে রইলেন যে ? আমি বললাম, হাসপাতাল থেকে তোমাকে যেতে দেবে ? আমি যদি যেতে চাই হাসপাতাল আমাকে ধরে রাখবে কেমন করে ? সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আপনি আমাকে চেনেন না ? চেনবনা কেন, তায়েবাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে যখন কোনো কিছু করবে ঠিক করে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যেদিন আসাদ মারা যায় সে রিকশা করে হাসপাতাল থেকে আসছিল। হঠাৎ করে মিছিল দেখে বেরিয়ে পড়ে, একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল। আমরা কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারিনি। আমি মনে মনে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। আজকেও যদি সে এরকম একটা কিছু করে বসে। আমি তো জানি তাকে আটকে রাখব এমন ক্ষমতা আমার নেই। আপাতত তাকে একটু শান্ত করার জন্য বললাম, আগে একটু বসো, আলাপ করি কোথায় যেতে চাও। একটা ব্যবস্থা না হয় করা যাবে। সে জেদ ধরে রইল, না আমি ওভাবে পড়ে থাকব না। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন। আমি বললাম, কোথায় নিয়ে যাব আগে বলো, তারপর না হয় যাওয়া যাবে। সে জবাব দিল, আমাকে বলতে হবে কেন, আপনার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান। আমি যদি তোমাকে এ অবস্থায় এখান থেকে নিয়ে যাই, তোমার বোন, মা, ভাই এবং পার্টির লোকেরা আমায় কি আস্ত রাখবে ? কোনো একটা কারণে যদি

তোমার অসুখটা হঠাৎ করে বেড়ে যায়, সকলের কাছে আমি কী জবাব দেব। আমার মা, ভাই, বোন, পার্টির লোক কী মনে করবে, আমি দেখব। আপনি নিয়ে যাবেন কি না বলুন। তুমি তো জান, এখানে আমার নিজের থাকার জায়গাও নেই। তোমাকে আমি কোথায় নিয়ে যেতে পারি ? সে বলল, অন্তত আপনি কোথাও আমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসুন। এই হাসপাতালে থাকতে থাকতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন। এখন কেউ নেই, এই সময়ে বেরিয়ে পড়াই উত্তম। আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু ডা. মাইতির সঙ্গে পরামর্শ করে আসি। তুমি একটুখানি অপেক্ষা করো। ডা. মাইতির কাছে যাবেন কেন ? আপনি যখন অর্চনাদিকে নিয়ে বেড়াতে যান, তখন কি ডা. মাইতির পারমিশন চান ? আমি বললাম, অর্চনাকে নিয়ে কখন আবার বেড়াতে গেলাম। এ উদ্ভট সংবাদ কার কাছে শুনলে ? তায়েবা চোখের রাঙা পুতুলি দুটো দেখিয়ে বলল, ফের মিথ্যে কথা বলছেন, অর্চনাদি আমাকে নিজেই বলেছেন, অর্চনাদিকে নিয়ে আপনি বেলেঘাটা না কোথায় গিয়েছিলেন ? আমি হেসে ফেললাম, ওহ্ সেই কথা বলো। বেলেঘাটাতে তার এক নকশাল বন্ধুর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। অর্চনা আমাকে বাসা চেনাতে নিয়ে গিয়েছিল। তায়েবা বলল, থাক আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আপনাকেও আমার চেনা হয়ে গেছে। তায়েবাকে আমি কোনোদিন সাধারণ মেয়েমানুষের সঙ্গে এক করে দেখিনি। আমি মনে করতাম, সে মেয়েলি ঈর্ষা, বিদ্বেষ এসবের অনেক উর্ধ্বে। আজকে তার অন্য একটা পরিচয় পেলাম। দীর্ঘদিন ধরে আমি মনের মধ্যে একটা সংশয় লালন করে আসছিলাম তায়েবার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেটার ভিত কী ? আমি তার অসুখকে উপলক্ষ করে তার পরিবার এবং পার্টির লোকদের বিরুদ্ধে মনে মনে অসংখ্য অভিযোগের যে খসড়া এঁকেছি তার একটা বাস্তব ভিত্তি পেয়ে গেলাম। আমার নালিশ করার অধিকার আছে, হ্যাঁ আছে, একশোবার আছে। আমার চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। হঠাৎ সে অতিকষ্টে বলে বসল, দানিয়েল ভাই আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেন। আমার কেমন জানি লাগছে। আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তার মুখে কোনো কথা নেই। ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

বার

সেপ্টেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমরা যারা কলকাতা শহরের ভাসমান প্রাণী, দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আড্ডা জমাচ্ছি, নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছি, ঘরেরও না, ঘাটেরও না ; সেই চূড়ান্ত সত্যটা ভুলে থাকার জন্য অষ্টপ্রহর এটা ওটায় ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেই চিকচিহ্নহীন সময়প্রবাহ আমাদের সবাইকে ঠেলে একটা কঠিন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। এতদিন আমরা জানতাম সীমান্তে একটা যুদ্ধ চলছে। ঠিক যুদ্ধটা কোথায়

হচ্ছে, কারা করছে, সে বিষয়ে আমাদের একেবারে যে ধারণা ছিল না সেকথা সত্যি নয়। মাঝেমধ্যে আমরা সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে গিয়েছি। সেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি যেটুকু চলছে নিজেদের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছে। ক্যাম্পগুলোতে ট্রেনিং চলছে ঠিকই, কিন্তু এই ট্রেনিং থেকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে নিরস্তিত্ব করে দিতে পারে এরকম একটা মুক্তিযুদ্ধ জন্ম নিতে পারে সেকথা প্রাণের ভেতর থেকে বিশ্বাস করতে পারিনি। আমাদের কোথাও কিছু নেই, সবকিছুই শূন্যের ওপর ঝুলছে। সবটাতেই ভারতের করুণার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ক্যাম্পে হাজার হাজার তরুণের মৃত্যুর সরল প্রস্তুতি, অফুরন্ত মনোবল, আসন্ন সংগ্রামে সেটাই জাতিগতভাবে আমাদের সত্যিকার বিনিয়োগ। আমাদের ট্রেনিংরত মুক্তিযোদ্ধাদের জয়বাংলা রণধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যখনই ফেটে পড়েছে আমাদের শিরার রক্ত চলকে উঠেছে। সেই প্রেরণাদীপ্ত পরিবেশে যতক্ষণ থেকেছি, সমস্ত জাগতিক হিসেবে-নিকেশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আমরা বিশ্বাস করেছি আমরা জয়ী হব। জয়ী হব এই বিশ্বাসটুকুও যদি না রাখতে পারি, তা হলে আমাদের অস্তিত্বের মূল্য কী ? এই কলকাতা শহরে আমরা কী করতে এসেছি। সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত সংশয়কে সবলে তাড়িয়ে দিয়ে মনের মধ্যে একটা আশাবাদের শিখা প্রাণপণ প্রয়াসে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে রাখতে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। আমরা জয়ী হব, আমাদের জয়লাভ করতে হবে। এই আশাটুকু না রাখতে পারলে মানুষের শরীর ধরে হেঁটে বেড়ানোর কোনো মানে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু একটা হিসেবি মনও তো ছিল। সেটা মাঝে মাঝে ভয়ানকভাবে বেঁকে বসত। ক্যাম্পের বাস্তব অবস্থা দেখে মনটা দমে যেত। পর্যাপ্ত খাবার নেই, গোলাবারুদ নেই। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালে, ক্যাম্পে সে অস্ত্র এসে পৌঁছুতে অনেক সময় সপ্তাহ, পক্ষ এমনকি মাস পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। কোনো সময় আদৌ পৌঁছাত না। নির্দেশনার প্রশ্নে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশী নেতৃত্বের মতবিরোধ লেগেই রয়েছে। থিয়েটার রোডের অস্থায়ী সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে বারবার নালিশ করেও সদুত্তর পাওয়া যেত না। প্রায় সবগুলো ক্যাম্পে একটা যাচ্ছেতাই অবস্থা। তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য অনেক সময় ক্যাম্প কমান্ডারেরা গামছায় কিছু গ্রেনেড বেঁধে দিয়ে বলত, যাও চোরাগোপ্তাভাবে পাকিস্তানি সৈন্যের ওপর আক্রমণ করো, রাজকারদের খতম করো, তারপর ফিরে এসো। এভাবে শুধুমাত্র কিছু গ্রেনেডসহ তরুণ ছেলেদের দেশের ভেতরে পাঠানো যে প্রকারান্তরে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া এ কথা ক্যাম্প কমান্ডারেরাও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাছাড়া উপায় কী ? অতগুলো জোয়ান ছেলে ক্যাম্পে বসে থাকলে এক সময়ে নিষ্ক্রিয়তা এসে ভর করবে। তখন তাদের মধ্যে কোনোরকমের গতি সৃষ্টি করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। তাই যে-কোনো রকমের অ্যাকশনের মধ্যে অন্তত একাংশকে ব্যস্ত না রাখতে পারলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

ক্যাম্পে গেলেই সকলে থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গালাগাল করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গণপ্রতিনিধিদের সংযোগ সমন্বয় খুবই ক্ষীণ। তাঁরা যে ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যান না তাও ঠিক নয়। মাঝে মাঝে সরকারের তরফ থেকে কেউ না কেউ যান। সব সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন না একজন তাঁদের সঙ্গে থাকেন। বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারেন না। ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় পারেন না। তাঁদের অবচেতন মনে সব সময় একটা ভীতি কাজ করে। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন, যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা তাঁদেরকে অন্যরকম কিছু মনে করেন। গণপ্রতিনিধিদের এই আঁটোসাঁটো দায়সারা মনোভাব মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাদের বেশির ভাগই আশা করে তারা যেভাবে প্রাণ দেয়ার জন্য এক পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের যাঁরা নেতা তাদের মধ্যে সেরকম খাঁটি জঙ্গি মনোভাব দেখতে পাবে। তার বদলে যখন নাদুশ-নুদুশ নেতারা স্নো-পাউডারচর্চিত মুখমন্ডল এবং স্নিগ্ধ তেলঢালা শরীর নিয়ে ভারতীয় সোবাহিনীর পেছন পেছন হাজির হয়ে জনসভায় বক্তৃতার ঢঙে হাত উঠিয়ে শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর নকল করে বলতে থাকেন, ভাইসব তোমরা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে। তোমরাই বাংলা জননীকে মুক্ত করবে। সেই দামাল ছেলেরা তখন তাঁদের অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে শালা বানচোত বলে গালাগাল করে। মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং সেক্টরগুলোর কমান্ডারদের মধ্যে সব সময় ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। সর্বাধিনায়ক বুড়ো জেনারেল ওসমানী সত্যিকার যুদ্ধের চাইতে মিলিটারি আদব কায়দার প্রতি অত্যধিক যত্নশীল। যুদ্ধের কাজের অগ্রগতির চাইতে তাঁর হুকুম পালিত হল কি না প্রায় সময়ে সেটাই তাঁর মনোযোগের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সর্বাধিনায়ক এবং সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে মতবিরোধ কোনো কোনো সময়ে এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে ওসমানী সাহেব তাঁর দীর্ঘ গোঁফে তা দেয়া ছাড়া অন্য কিছু করার আছে সেকথা চিন্তা করতে পারেন না। যে যার মতো করে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন, কারো পরিকল্পনার সঙ্গে কারো পরিকল্পনা মিলছে না। প্রায় সময়েই অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতীয়েরা বাংলাদেশ কমান্ডের সঙ্গে কোনোরকমের যোগাযোগ না করেই বাংলাদেশী যুবকদের আলাদাভাবে ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে সমস্ত ক্যাম্পে ক্ষোভ এবং অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। ওটা কেন ঘটছে থিয়েটার রোডে তাজুদ্দীন সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠিয়েও কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

থিয়েটার রোডের অস্থায়ী সরকারের কার্যালয়ে তাজুদ্দীন সাহেব যে খুব সুখে আছেন, সেকথাও ঠিক নয়। আওয়ামী লীগ দলটির মধ্যে কোন্দলের অন্ত নেই। তাজুদ্দীন সাহেব অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আওয়ামী লীগের উচ্চাভিলাষী নেতাদের অনেকেই তাঁর ওপর বিরক্ত। সুযোগ পেলেই তাঁকে ল্যাং মারার তালে আছে। ভারত সরকার তাজুদ্দীন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি যে গোটা পরিস্থিতিটা সামাল দিতে পারবেন, তাঁর ওপর

এই আস্থা স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীরও নেই। ভারত সরকার তাজুদ্দীনবিরোধীদেরও হাতে রাখার চেষ্টা করছে। তাজুদ্দীন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে। নিজের স্বাধীনভাবে কোনোকিছু করার ক্ষমতা বিশেষ নেই। সব সময় ভারত যা বলছে, সায় দিতে হচ্ছে, যা চাপিয়ে দিচ্ছে তাই মেনে নিতে হচ্ছে। ভারতের মাটিতে প্রকাশ্যে তাজুদ্দীনের বিপক্ষে কেউ কিছু বলতে সাহস না করলেও আওয়ামী লীগের একাংশ আমেরিকার মাধ্যমে গোপনে ইয়াহিয়া খানের সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ সালাপ চালাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাদের যুক্তি একটাই ভারত কখনো বাংলাদেশের হয়ে যুদ্ধ করবে না, সুতরাং ছয়দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় আসাই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী করতে যাচ্ছেন কেউ জানে না। ভারতীয় জনমত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুকূলে এবং বেশির ভাগ ভারতীয় জনগণ চায় শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদান করুন। কিন্তু যুদ্ধ করতে বললে তো যুদ্ধ করা যায় না। শ্রীমতী অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছেন। বিশ্বজনমত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতায় শিউরে উঠেছে একথা সত্যি, কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বজনগণের সহানুভূতির ওপর নির্ভর করে শ্রীমতী গান্ধী একটা যুদ্ধ কাঁধে নিতে পারেন না। পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা আছে, আচে চীন। এই দুটো শক্তিশালী দেশ বারবার নালিশ করে আসছে ভারত পাকিস্তানকে ভেঙে দু টুকরো করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একাংশকে তার ভূখন্ডের মধ্যে ডেকে নিয়ে অনর্থক ওই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে তুলেছে। মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশও পাকিস্তানের অবস্থানকে সমর্থন করে। ভারতীয় জনগণের একটা বিরাট অংশ মনে করে চিরশত্রু পাকিস্তানকে চিরদিনের মতো দুর্বল করার এই একটা মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীর অনতিবিলম্বে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া উচিত। আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাসনা থেকে তো আর যুদ্ধ বাধানো যায় না। সত্যি বটে পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কাজে ভারতকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করবে। যদি একটা যুদ্ধ সত্যি সত্যি লাগে পাকিস্তানের মিত্র চীন কিংবা আমেরিকা যদি পাকিস্তানের সমর্থনে এগিয়ে আসে, তা হলে একটা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা এড়ানো অসম্ভব। ভারতবর্ষ কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একটা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি আপন কাঁধে নিতে পারে, বোধ করি শ্রীমতী গান্ধী চাইছিলেন যুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের সংকটের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হোক।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ ভারতে চলে এসেছে। তার মধ্যে প্রায় আশি লক্ষ হিন্দু। যদি তাড়াতাড়ি কিছু একটা সমাধান খুঁজে বের করা না হয়, যে-সকল মুসলমান ভারতে এসেছে তাদের অনেকেরই মনোবল ভেঙ্গে যাবে। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে শরণার্থীদের ডাকছে তোমরা ফিরে এসো। কোনো ভয় নেই। একটা সময় আসতে পারে মুসলমানদের

একটা বিরাট অংশ দেশে ফেরত চলে যেতে চাইবে। তখন ভারত অনেক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে। যা-কিছু করার তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। যদি ভারত একটা যুদ্ধ মাথায় নেয় চীন আমেরিকা যে পাকিস্তানের সপক্ষে ছুটে আসবে না, সে ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। একটা পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানের বন্ধুদের চাপে যদি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হয়, ভারতের লোকসান হবে অনেক বেশি। তখন পাকিস্তান এই আশি লক্ষের মতো হিন্দুকে ফেরত নিতে চাইবে না। আশি লক্ষ বাড়তি মানুষের চাপ সহ্য করতে গিয়ে ভারতের দম বেরিয়ে যাবে। শ্রীমতী গান্ধী একটা বিরাট মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন, যদিও তাঁর আচার-আচরণে সেকথা বোঝার উপায় নেই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বৃহত্তর শক্তির চাপে যদি মাঝপথে থামিয়ে দিতে বাধ্য হতে হয়, সবদিক দিয়ে ভারতের ক্ষতি হবে সবচাইতে বেশি। তখন এক পাকিস্তানের বদলে দুই পাকিস্তানের সৃষ্টি হবে। পূর্ব পাকিস্তানে একজনও হিন্দু অধিবাসী থাকবে না। ভারতের হাজার সমস্যা। তার ওপর যদি ওই আশি লক্ষ মানুষের বোঝা তার ওপর চাপে, ওই বাড়তি জনসংখ্যার চাপে ভারত থেঁতলে যাবে।

ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের লোকদের সঙ্গে যদি একটি সমঝোতায় এসে শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করতেন, শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতেন, মানে মানে সমস্ত শরণার্থীকে ফেরত নিতেন, তা হলে সবদিক দিয়ে সেটাই হত উত্তম। ভারত ঘাড়ে একটা যুদ্ধ তুলে নেয়ার গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। শ্রীমতী গান্ধীর জানার বাকি নেই, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসায় এলেও পাকিস্তান একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে নিষ্ঠুর নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে, যে রক্তস্রোত বইয়েছে, যেভাবে অগ্নিসংযোগ এবং নরহত্যার আয়োজন করেছে, তাতে করে দু অংশের জনগণের মধ্যে আস্থা এবং বিশ্বাসের শেষ সম্ভাবনাটুকু চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে আসন্ন সংকট হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান কখনো ভারতের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ভারত একটি দুর্বল পাকিস্তান চায়। বিনাযুদ্ধে যদি সে-উদ্দেশ্য পূরণ হয়, যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি খুঁজে পান না। তার পরেও শ্রীমতী গান্ধীর মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আশি লক্ষ হিন্দু পাকিস্তানি সৈন্যের বর্বর আক্রমণের মুখে সব খুইয়ে প্রাণমাত্র সম্বল করে ভারতে পালিয়ে এসেছে, তারা নিরাপদে বসবাস করার নিশ্চিত নিরাপত্তা না পেলে কি পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যেতে চাইবে? যে-কোনো রাজনৈতিক সমাধান তাদের নিরাপদে দেশে ফেরার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা কি দিতে পারে? সে ক্ষেত্রে তারা ভারতের মাটি থেকে কোনোক্রমেই দেশে ফিরতে চাইবে না। ভারত জোর করে তো হিন্দুদের ঠেলে দেশে পাঠাতে পারবে না। শ্রীমতী গান্ধী চোখ বুজলেই দেখতে পান একটি যুদ্ধ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে। এই

যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার যত বিপদ সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিপদ তার চাইতে অনেক কম। তিনি অনুভব করছিলেন, বল এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কোর্টে। ইয়াহিয়া খানের মাথায় যদি সুবুদ্ধির উদয় হয়, তা হলে হয়তো যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া আর কোনো বিকল্প তো তিনি দেখেন না।

ইসলামাবাদে বসে ইয়াহিয়া খান হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম চিন্তা করছিলেন। কার্যকারণ সবকিছু মিলিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কেননা তিনি সব সময় মদের নেশায় বিভোর থাকেন। সুন্দরী নারী এবং নর্তকী গায়িকা ছাড়া আর কারো কাছে স্বচ্ছন্দ হওয়ার ক্ষমতা তিনি ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছেন। যেটুকু চিন্তা করার ক্ষমতা এখনো অবশিষ্ট আছে, তাই দিয়ে মনে করেন তিনি একটা মরদের মতো কাজ করে ফেলেছেন। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যে কাজটি করতে পারেননি তিনি একাই সে-কাজটি করে ফেলতে পেরেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার এমন সরল সমাধানের কথা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো রাষ্ট্রপ্রধান চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেননি। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে এক কোটিরও বেশি হিন্দু বসবাস করে, সেটাই পূর্ব পাকিস্তানের আসল সমস্যা। এই হিন্দুদের প্ররোচনাতেই বিচ্ছিন্নতাবাদ সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছে। অস্ত্রের মুখে তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে ভারতে ঠেলে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল তিনি চিরদিনের মতো উৎপাটন করে ফেলেছেন। হিন্দুরা যখন নেই, আস্তে আস্তে পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামি পরিবেশ ফিরে আসবে। তিনি মনে করেন আরো একটি গ্রন্থিল এবং জটিল সমস্যার সমাধান তিনি প্রায় করে এনেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সবসময় আন্দোলন করে, কারণ সেখানে অনেক মানুষ। এই চিলতে একটু মাটি। সেখানে বসবাস করে, কোটি কোটি মানুষ, পিঁপড়ের মতো পিলপিল করছে মানুষের সারি। প্রায় এক কোটি মানুষকে তিনি অস্ত্রের মুখে সরিয়ে দিতে পেরেছেন। এই এক কোটি মানুষের বাড়িঘর, জমিজমা ব্যবসায় বাণিজ্য সব অন্যদের দখলে চলে যাবে। তাদের গায়েগতরে একটু হাওয়া লাগবে। তারা হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারবে। এই বাড়তি জমি বাড়ি ঘর পাওয়ার পর তাদের অসন্তোষ অনেক কমে আসবে। পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের প্রতি তাঁর মায়া হয়। তিনি মিছিমিছি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হাতের কাছে এমন সহজ সমধান থাকা সত্ত্বেও আয়ুব খান সাহেব কেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে বাগে আনতে পারলেন না, তিনি বুঝতে পারেন না। মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবেন কী বোকাই না ছিলেন আয়ুব খান। অথচ তিনি কত সহজে সব সঙ্কটের সমাধান প্রায় করে এনেছেন।

ইয়াহিয়া খান মাতাল হলেও তাঁর হিসেব খুবই পরিষ্কার। শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি কারাগারে পুরেছেন। থাকুক আরো কিছুদিন। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। যদি ইয়াহিয়া খানের কথা মানতে রাজি হন, ছেড়ে দেবেন। আর যদি বেঁকে বসেন দেশদ্রোহী হিসেবে ফাঁসিতে লটকে দেবেন। আওয়ামী

লীগের যে অংশটা দেশের মধ্যে আছে, তার একটা অংশকে খুন করা হয়েছে, একটা অংশকে জেলে পোরা হয়েছে এবং আর একটা অংশকে একেবারে সরাসরি তাঁবেদারে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং দল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া আওয়ামী লীগের কাছে যে সমস্ত দল সত্তুরের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল তাদের সবাইকে সাহস দিয়ে তিনি চাঙ্গা করে তুলেছেন। জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি সমস্ত দক্ষিণপন্থী দল পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে উঠে পড়ে লেগেছে। শিগগির আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতারা ভারতে চলে যাওয়ার পর যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা তারা পূরণ করতে পারবে। তা ছাড়া পৃথিবীর মানুষকে দেখাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান তিনি করেছেন।

এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পৃথিবীর মানুষের কাছে সাক্ষ্য দিলেন ইয়াহিয়া খান সাহেব দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করার স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে উদ্ধার করেছেন। সামরিক একনায়ক হিসেবে কারো তাঁকে দূষতে পারা উচিত নয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই বললেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী উঠিয়ে নিলে ভারত থেকে আগত দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে জনগণের জানমাল রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ইয়াহিয়া খান গ্লাসের পর গ্লাস শ্যাম্পেন খালি করছেন। আর ভাবছেন তাঁর মতো সুদক্ষ জেনারেল এবং প্রতিভাবান নেতা পৃথিবীতে বেশি নেই। তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ, তিনি বোতলের পর বোতল নিঃশেষ করে ফেলত পারেন। তাঁর সমস্ত জাগতিক বিষয়ে সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পরেও একটা জিনিস মনের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো জ্বলতে থাকে। ভারত যে-সকল তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা পূর্ব পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে, যারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে সৈন্যদের হত্যা করছে, পাকিস্তানের প্রেমিকদের বাড়িঘরে গ্রেনেড ছুড়ছে, ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস করছে, পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে রাজাকার, আলবদর এবং আলশামস বাহিনী গঠন করেছেন। তারা এখন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মাঠে নেমেছে এবং পাহারা দিচ্ছে। ভারত যত ইচ্ছা মুক্তিযোদ্ধা পাঠাতে থাকুক, জান নিয়ে কেউ ফেরত যেতে পারবে না।

হ্যাঁ পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা টেলিভিশন, রেডিওতে বিপুল পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানীদের ভারতে পালিয়ে যাবার কথা বলছে। এক কোটির মতো মানুষ গেছে। সুতরাং এই ধরনের কিছু কথা তো উঠবেই। কিন্তু ভারতে কারা গিয়েছে সেটা তো দেখতে হবে। ভারতে যারা চলে গেছে, তাদের তো শতকরা পঁচাশি ভাগ হিন্দু। হিন্দুদের ভারত ডেকে নিয়ে গেছে। কেননা এই হিন্দুদের ডেকে নিয়ে ভারত পাকিস্তানের অখণ্ডতা ধ্বংস করতে চায়। বাকি পনেরো ভাগ মুসলমান যারা ভারতে গিয়েছে, তাদের অধিকাংশই ভারতের অনুচর। আর কিছু সংখ্যক বিপথগামী।

তথাপি পৃথিবীর মানুষ যদি বলে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিক। ইয়াহিয়া খান বলবেন, তারা ফিরে আসুক, যাদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজের কোনো প্রমাণ নেই, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন। কোনো ভয় নেই, শরণার্থীরা তাদের বাড়িঘরে ফিরে আসুক। ইয়াহিয়া খান সীমান্তের চৌকিগুলোর কাছাকাছি তাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলবেন। তিনি জানেন হিন্দুরা ফিরবে না। আর মুসলমান যারা গিয়েছে যদি ফিরে আসে খান সাহেবের তো আরো সুবিধে। তিনি পৃথিবীর মানুষদের সামনে দেখাতে পারবেন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু এবং ভারত সরকার মিলে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ভাঙার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। অন্যরা আসুক না-আসুক কিছু যায় আসে না। কিন্তু হিন্দুরা যে ফিরে আসবে না এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান সুনিশ্চিত। তিনি নতুন বোতলের সুরা গলধঃকরণ করতে করতে ভাবেন এক ঢিলে তিন পাখি মেরে ফেলেছি। আমি আশি লাখ হিন্দুকে ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছি। তিনি ভাবেন আয়ুব খানের মাথায় এ বুদ্ধি আসেনি কেন। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু না থাকলে আর কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দেবে না। ভারত সব সময়ে পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চেয়েছে। তার বদলে ইয়াহিয়া খান ভারতের ঘাড়ে এমন এক জনসংখ্যার বোঝা চাপিয়ে দিতে যাচ্ছেন, সে অর্থনৈতিকভাবে আর কখনো মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। মাঝে মাঝে তিনি অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। আর ভারত যদি যুদ্ধ করে সেখানেই তো আসল মজা। পাকিস্তানের বন্ধু আমেরিকা আছে, চীন আছে। তারা মদদ দিতে ছুটে আসবে। তবে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার খুব দহরম মহরম চলছে। ভাবে গতিকে মনে হচ্ছে যদি যুদ্ধ লাগে রাশিয়া ভারতকে সমর্থন করবে। তা করুক। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপার নিয়ে দুনিয়ার বড় বড় দেশগুলো একটা বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেবে ইয়াহিয়া খান সাহেবের সেকথা বিশ্বাস হতে চায় না। ভারত-পাকিস্তানে একটি যুদ্ধ যদি লেগেই যায় বৃহৎ শক্তিগুলোর চাপে অল্পদিনের মধ্যেই থামিয়ে ফেলতে হবে। সে যুদ্ধে পাকিস্তান যদি বিশেষ সুবিধে করতে নাও পারে ইয়াহিয়া খান সাহেবের বিশেষ দুশ্চিন্তা নেই। তখন তিনি ভারতের সঙ্গে অস্ত্রবিরতি করবেন। মধ্যস্থতা করতে আমেরিকা ছুটে আসবে। তথাকথিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটির কোনো গুরুত্বই থাকবে না। বাংলাদেশ বলে কিছু আছে নাকি ? গোটা ব্যাপারটাই ঘটছে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে। মাঝখান থেকে বাংলাদেশের প্রশ্ন উঠবে কেমন করে ? ভারত, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসকল হিন্দুকে দেশের অখণ্ডতা ধ্বংস করার জন্য তার ভূখণ্ডে ডেকে নিয়েছে পাকিস্তান কস্মিনকালেও তাদের আর ফেরত নেবে না। আর যেসকল মুসলমান চলে গিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসতে চায় আসুক। ইয়াহিয়া খান সাহেব তাদের কথাটা ভেবে দেখবেন। তিনি গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন আর মাঝে মাঝে অট্টহাস্য করে উঠছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, হ্যাঁ সেই মেয়েমানুষটি। আমাকে ল্যাং মারতে চায় ? তার লড়াই করার খায়েশ হয়েছে ? আচ্ছা ঠিক হ্যায়, নজদিগ মে এক জঙ আগ্যায়া। ময়দান মে মোলাকাত হোগা।

মাঝখানে পরিস্থিতি একেবারে থিতিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। এভাবেই সবকিছু চলতে থাকবে। যেখানেই যাই, সর্বত্র থমথমে পরিবেশ, কী ঘটবে, কী ঘটতে যাচ্ছে কেউ কিছু বলতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে যতই হতাশা বাড়ছে, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দলাদলি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ওর বিরুদ্ধে বলছে, অমুক অমুকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। কলকাতার মানুষেরা আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আর কত ! বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, পার্কে, মাঠে, ময়দানে সর্বত্র জয় বাংলার মানুষ দেখে দেখে তাদের চোখ পচে গেছে। আমরা আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে ভীষণ সংকুচিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি। মানবিক মর্যাদা বোধটুকুও আস্তে আস্তে আমাদের লোপ পেতে বসেছে। লোহালক্কর ফেলে রাখলে যেমন মরচে ধরে আমাদের মধ্যেও তেমনি স্তরে স্তরে হতাশা জমে ক্রমাগত অমানুষ হয়ে উঠছি। আমরা বৌবাজারের হোস্টেলটিতে আট দশজন মানুষ থাকি। যখন এসেছিলাম, সকলের মধ্যে প্রাণখোলা সম্পর্ক ছিল। যতই দিন যাচ্ছে আমরা আর স্বাভাবিক থাকতে পারছিনে। তুচ্ছ সিগারেট নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। বালিশ, বিছানা, মশারি নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আমরাও দুতিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের এসব খুনসুটি দেখে হোস্টেলের ছাত্ররা হাসে। প্রকাশ্যে খারাপ মন্তব্য কারতেও কেউ ছাড়ে না। অথচ আমরা যখন অভুক্ত অবস্থায় মুখে সাত পাঁচ দিনের আকামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে এসেছিলাম, সকলে আমাদের বীরের সম্বর্ধনা দিয়েছিল। বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমাদের শরীরে ময়লা ছিল, জামাকাপড়ের যা অবস্থা ছিল বলার মতো নয়। কত মানুষ যেচে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে, কত বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। এখন কলকাতার জলহাওয়া লেগে আমাদের শরীরে লাবণ্য ফিরে এসেছে। অনেকেই ছিমছাম জামাকাপড় পরি। তথাপি কলকাতা শহরের মানুষ আমাদের প্লেগের জীবাণুর মতো এড়িয়ে চলে। কলকাতার জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তার জন্য আমরা দায়ী। ট্রাম, বাস, ট্রেনে অস্বাভাবিক ভিড় বাড়ছে, সে জন্যও আমরা দায়ী। পার্ক মাঠ ময়দানের নির্জনতা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সর্বত্র জয় বাংলার মানুষ গিসগিস করছে। কর্মহীন স্বপ্নহীন উদ্যমহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে আমরা একে অন্যের ওপর ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। প্রতি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একই লোকের চেহারা দেখে দেখে ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠেছি। একজনের মনের ময়লা অন্যজনের মনে লেগে লেগে স্রোতহীন বদ্ধকুয়োর পানির মতো আমাদের মনগুলোও দূষিত হয়ে পড়েছে। কলকাতা শহর যেন একটা উন্মুক্ত কারাগার। তার ভেতরে আমরা ছেড়ে দেয়া কয়েদির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা সকালে কোথায় যাব, বিকেলে কোথায় কাটাব, সব একটা ছকের মধ্যে পড়ে গেছে। তবু আমাদের খুঁজে খুঁজে বাংলাদেশের মানুষদের কাছে যেতে হয়। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাবে না তো কোথায় যাবে? যেখানেই থাকিনে কেন, সন্ধেবেলা পানের দোকানের সম্মুখে, ছোট ছোট রেস্টুরেন্টের দোরগোড়ায়

স্বাধীন বাংলা বেতারে এম. আর. আখতার মুকুলের চরমপত্র পাঠ শোনার জন্য দাঁড়িয়ে যাই। কলকাতার মানুষ, ভাণু বন্দ্যোপাধ্যায় কিম্বা নবদ্বীপ হালদারের কমিক শুনে যে রকম মজা পায়, এম. আর. আখতার মুকুলের গলার আওয়াজ, বাংলা ভাষার রসিকতা, কথা বলার ভঙ্গি সবকিছু তেমনি উপভোগ করে। কিন্তু আমাদের কাছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এম. আর. আখতার মুকুলের চরমপত্রের আবেদন ভিন্নরকম। বাংলাদেশের ব্যাপারে সকলের উদাসীনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তথাপি এম. আর. আখতার মুকুল যখন স্বাধীন বাংলা বেতরের অনুষ্ঠানে চরমপত্র পাঠ করেন তখন দোকানের সামনে আস্তে আস্তে লোক জমতে থাকে, তখন দোকানির আওয়াজটা বাড়িয়ে না দিয়ে উপায় থাকে না। লোকজন শোনে আর মুকুলের কড়া রসিকতা চিবিয়ে চিবিয়ে উপভোগ করে। এম. আর. আখতার মুকুল ট্যাঙ্ক ধ্বংস করছেন, গানবোট ডোবাচ্ছেন, সৈন্যভর্তি ট্রেনসহ ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছেন, সেনা ছাউনিতে ছাউনিতে ত্রাসের সঞ্চার করছেন। এ পর্যন্ত তিনি যত পাকিস্তানি সৈন্য খুন করেছেন, যত জখম করেছেন, যত ট্যাঙ্ক অচল করেছেন, যত কনভয় ধ্বংস করেছেন, সব মিলিয়ে যোগ করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়াবে, তাতে করে একজনও পাকিস্তানি সৈন্য বাংলার মাটিতে থাকার কথা নয়। তার পরদিন সন্ধেবেলা আবার সৈন্য মারতে আসেন। আমরা অবাক হয়ে ভাবি এত সৈন্য তিনি কোথায় পান। আমরা জানতাম, এম. আর. আখতার সাহেব যা বলছেন, তার দু শতাংশও যদি সত্য হত, তাহলেও আমাদের যুদ্ধের পরিস্থিতি এরকম হওয়ার কথা নয়। সব মিথ্যে জেনেও আমরা পরের দিনের চরমপত্র পাঠ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আর কোথাও তো কেউ কিছু করতে পারছে না। অন্তত একজন মানুষ আছেন, যিনি কল্পনায়ও পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা করতে পারেন, ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিতে পারেন, বাক্যের মন্ত্রশক্তিতে বাংলার সপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য খরস্রোতা নদী, সুন্দরবনের বাঘ, বিষাক্ত সাপ, ঝাঁক বাঁধা মশা, ভাটি অঞ্চলের প্যাঁক কাদা, পশুপক্ষী সবকিছুকে প্রতিরোধ সংগ্রামের ভূমিকায় শরিক করে নিতে পারেন। কার্যক্রম যতই অপ্রতুল হোক না কেন, এম. আর. আখতারের কণ্ঠ শুনে মনে একটা বিশ্বাস ঘনিয়ে উঠত। আমাদের প্রকৃতি, আমাদের নদী, আমাদের বনাঞ্চল, আমাদের বাঘ, সাপ, আমাদের প্যাঁক কাদা পাকিস্তানি সৈন্য ধ্বংস করার অলৌকিক ক্ষমতা রাখে। কোথাও যখন কিছু ঘটছে না, কেউ কিছু করছে না আমরা এম. আর. আখতার মুকুলের ওপর ভরসা ছাড়তাম না। আগামীকাল তিনি নতুন আক্রমণ এবং নতুন বিজয়ের কথা শোনাবেন। ডুবন্ত মানুষ তো প্রাণপণ শক্তিতে ভাসমান তৃণখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে।

হঠাৎ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে একটা গতির সঞ্চার হল। কথাটা বোধ হয় সঠিক বললাম না। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের একটা নতুন মোড় নিল। ভারতের দূত ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করল। পাকিস্তানও বসে নেই। ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি ইউরোপীয় দেশগুলোতে টহল

দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং পাকিস্তানের অবস্থান সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ নয়াদিল্লিতে ঘনঘন যাওয়া আসা করছেন। বৈঠক করছেন। পত্র-পত্রিকায় সেসকল সংবাদ ছাপা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বোধ করি মনস্থির করে ফেলেছেন, তাঁকে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাঁর কথাবার্তা, বিবৃতি, ভাষণের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য পরিষ্কার ফুটে উঠছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের বেগও তীব্র হয়ে উঠেছে। কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলো খবর দিতে আরম্ভ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। পাউরুটির ভেতর ছুরির মতো পাকিস্তানি সৈন্যের বেষ্টনী ভেদ করে তারা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তান রেডিও এ-কথা স্বীকার করে নিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ছদ্মবেশে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করে নাশকতামূলক কাজকর্ম করে পালিয়ে যাচ্ছে। বি. বি. সি. এবং ভয়েস অব আমেরিকাও বলতে আরম্ভ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা সত্যি সত্যি দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে এখানে সেখানে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। আইয়ুব খানের সময়ের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানকে মুক্তিযোদ্ধারা বাড়িতে ঢুকে গ্রেনেড ছুড়ে হত্যা করেছে। ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, রংপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা, বরিশাল এসকল অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছে। টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী পিছু হটে এসেছে। বি. বি. সি.-র সংবাদদাতা আরো খবর দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যভর্তি লরিগুলো দিনেরাতে সীমান্ত অভিমুখে ছুটছে। সৈন্যরা সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় বাঙ্কার নির্মাণ করছে এবং ট্রেঞ্চ কাটছে।

এরই মধ্যে একদিন শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েত রাশিয়া সফরে গেলেন। ভারত এবং রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেছে সেটা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। রাশিয়ার কথাবার্তার মধ্যেও ভিন্ন একটা সুর লক্ষ করা যাচ্ছিল। বাংলাদেশের ব্যাপারে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং প্রেসিডেন্ট পদগর্নি সব সময়ে ইয়াহিয়া খানকে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার অনুরোধ করে আসছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর রাশিয়া সফরের পর থেকে রাশিয়ান নেতাদের মন্তব্যের ধরনও বেশ পাল্টে গেল। ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা বন্ধুত্বচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। দুই দেশের যে যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রথম বারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পূর্ব বাংলা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাশিয়া থেকে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিক্সনের সঙ্গে দেখা করলেন, বিশেষ সুবিধে করতে পেরেছেন বলে মনে হল না। নিক্সন প্রশাসনের কাছ থেকে কোনোরকম ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করলেন। নানা জায়গায় বক্তৃতা দিলেন। পত্রপত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসে তিনি পশ্চিম জার্মানি সফর করলেন।

তারপর ফ্রান্স এবং সবশেষে ইংল্যান্ড। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বচুক্তির পরও শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন কেন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে তার কারণ অস্পষ্ট রইল না। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করে পশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কিছু করতে যাচ্ছেন না সে আশ্বাসটা ওসকল দেশের সরকার এবং জনগণের সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানও বসে নেই। ইয়াহিয়া খান চীন-মার্কিন সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে দূতিয়ালি করছেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে উড়ে বেইজিং-এ পৌঁছেছেন। সেখানে চৌ এন লাই এবং মাও সেতুঙের সঙ্গে চীন-মার্কিন সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বিষয়টি পাকাপাকি করে ফেলেছেন। ইয়াহিয়া খান ধরে নিয়েছেন চীন-মার্কিন সম্পর্কোন্নয়নে ইয়াহিয়া খান যেহেতু মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেছেন, তাই পাকিস্তানের বিপদের দিনে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার বরাবর পাকিস্তানি অবস্থানের পক্ষেই কথা বলে আসছিলেন। আর চীন তো খোলাখুলি ভারতকে আক্রমণকারী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে অনেকদিন থেকেই ধমক দিয়ে আসছে। তবে একটা মজার ব্যাপার চীনা ড্রাগন শুধু লম্ফঝম্ফ করে, গর্জন করে কিন্তু সরাসরি কামড় দিতে ছুটে আসে না।

ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেবের নেতৃত্বে চীনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। চীনা নেতারা ভোজসভায় অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন। খোদ চৌ এন লাই আশ্বাস দিয়েছেন পাকিস্তান যদি ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হয় চীন পাশে এসে দাঁড়াবে। ভুট্টো সাহেব দেশে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেছেন তাঁর চীন সফর শতকরা একশো ভাগ ফলপ্রসূ হয়েছে।

ভারত পাকিস্তানে সাজো সাজো রব চলছে। বাংলাদেশ ভারতের নৌকায় পা রেখেছে। সুতরাং ভারত যা করে বাংলাদেশকে অম্লানবদনে মেনে নিতে হবে। তার পরেও ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত একটি যুদ্ধ ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে। ভারতের স্বার্থ থাকে থাকুক। কিন্তু আমরা আমাদের দেশে ফিরে যেতে চাই এবং মাতৃভূমিকে স্বাধীন দেখতে চাই। তার পরেও একটা প্রশ্ন যখন মন-ফুঁড়ে জেগে উঠে, নিজের কাছেই নিজে বেসামাল হয়ে পড়ি। বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উনিশশো আটচল্লিশ থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। আসন্ন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধটিই কি বাঙালি জাতির বিগত বাইশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের একমাত্র ফলাফল ? এই যুদ্ধে হয়তো ভারত জয়লাভ করবে এবং ভারতের সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হব। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এই পরিণতি। এটাই কি আমরা চেয়েছিলাম ? কী জানি, ইতিহাস কোন দিকে মোড় নিচ্ছে ! আমাদের বাবারা পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন, আর আমরা পাকিস্তান ভাঙছি। এই যুদ্ধ সংঘাত রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাস কোন ভবিষ্যতের পানে পাড়ি দিচ্ছে ? কে জানে !

তের

মাঝখানে তিনদিন হাসপাতালে যেতে পারিনি। ভেতর বাইরের চাপে একরকম হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। চারদিনের দিন হাসপাতালে যেয়ে যা শুনলাম তাতে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। এই তিনদিনে তায়েবার অসুখ বাড়াবাড়ি রকমের বেড়ে গিয়েছিল। পরশুদিন তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে যেতে হয়েছে। ডাক্তারেরা কাউকে দেখা করতে দিচ্ছেন না। হাসপাতালের সামনে সেই মহানিম গাছের চারপাশের বাঁধানো গোলাকার চক্রটিতে সবাই বসে আছে। জাহিদুল, ডোরা, দোলা, হেনাভাই আরো দু-চারজন আত্মীয়স্বজন। দূরে একাকী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তায়েবার মা। এই বর্ষীয়সী মহিলাকে এইভাবে ভিড় থেকে দূরে একেবারে একাকী বজ্রাহত তরুর মতো বসে থাকতে দেখে আমার বুকটা আশঙ্কায় ধুকপুক করে উঠল। আমি পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মহিলা আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখের কোনায় অশ্রুরেখা। আঁচলে মুছে নিয়ে বললেন, এই তিনদিনে তুমি একবারও হাসপাতালে আসনি। তোমার কি জ্বরজারি কিছু একটা হয়েছিল ? আমি না বলতে যেয়েও পারলাম না। আমার অসুখবিসুখ হয়নি অথচ আমি আসিনি জানালে মহিলা ব্যথিত হবেন। তাই বললাম, আমার জ্বর হয়েছিল। মহিলা কিছু বললেন না। আমি তাঁর পায়ের কাছে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম।

একটু একটু শীত করছিল। হাসপাতালের লোকজন কমে আসতে শুরু করেছে। সন্ধেবেলা আলো জ্বলে উঠেছে। আমরা বাইরে বসে আছি, কী করব জানিনে। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন ভূতুলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তায়েবাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। সকলেই জেনে গেছে তার আর বেশি সময় নেই। আমি দুহাতে মাথা ঢেকে তায়েবার এই পরিণতির জন্য কে দায়ী চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম। তায়েবার এই অকালমৃত্যুর জন্য আমি জাহিদুলকে মনে মনে দায়ী করলাম। পরক্ষণে ভাবলাম জাহিদুল দায়ী হতে যাবেন কেন ? জাহিদুলের দোষ কী ? জাহিদুল ডোরাকে বিয়ে করেছেন বলে তায়েবাকে মরতে হবে এটা কেমন করে হয়। তা হলে ডোরাই কি দায়ী ? বিচার করে দেখলাম, ডোরারওবা কসুর কী ? সে তো কাউকে না কাউকে বিয়ে করতই। জাহিদুলকে বিয়ে করে অন্যায়টা কী করেছে। তার ফলে তায়েবা মরতে যাবে কেন ? হেনাভাই তায়েবার খোঁজখবর না নিয়ে নিজে একটা বিয়ে করেছেন বলেই কি তায়েবা মরতে বসেছে ? হেনাভাই বিয়েটা না করলে তায়েবা বেঁচে থাকত তার নিশ্চয়তা কি ? তা হলে তায়েবার মা-ই কি তার মৃত্যুর কারণ ? খুব খুঁটিয়ে চিন্তা করার পর একটি জিনিস আবিষ্কার করলাম, মহিলা তায়েবার ঘাড়ে অত্যধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়েছিলেন, তাই বলে কি তায়েবাকে মরতে হবে ? তা হলে দায়ী কে ? তায়েবা কলকাতা এসেছিল, তাই কি তাকে মরতে হচ্ছে ? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু না হলে তাকে কলকাতা আসতে হত না। এই স্বাধীনতা সংগ্রামই কি তায়েবার মৃত্যু ঘটাতে

যাচ্ছে ? আমি স্বাধীনতা সংগ্রামকেও বা কেমন করে দায়ী করি ? তা হলে তায়েবার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ? তায়েবার মৃত্যুর জন্য কেউ না কেউ একজন তো দায়ী হবে। কাউকে দায়ী না করে আমার মন শান্তি পাচ্ছিল না। তখনই আমার মনে পড়ে গেল, তায়েবা নিজের মুখে বলেছে, সে আমাকে ভালোবাসে, তাহলে আমিই কি তায়েবার মৃত্যুর জন্য দায়ী ?

হাসপাতালের সামনের রাস্তায় হঠাৎ আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে তাকালাম। চারজন মানুষ একখানি খাটিয়ায় করে একটা সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলে একসঙ্গে হরিবোল বলে চিৎকার করছে। এই দৃশ্যটা দেখে আমার মধ্যে একটা দার্শনিক নির্লিপ্ততা জন্ম নিল। মানুষের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যটা আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। মৃত্যু সর্বব্যাপী ওত পেতে রয়েছে। কেউ কারও জন্য দায়ী নয়। আমি পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলাম, হেনাভাই এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর ডাকলেন, দানিয়েল এদিকে এসো। তিনি আমাকে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে বসালেন। বললেন, চা খাও। কাপে যেই চুমুক দিয়েছি, হেনাভাই বললেন, দেখি তোমার একটা চারমিনার দাও। সিগারেটটা ধরিয়ে বললেন, শোনো দানিয়েল আজ তোমাকে একটা কথা বলব। আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, আগে চা-টা শেষ করো। আমি যখন সিগারেট ধরিয়েছি, তিনি বললেন, শোনো তিনদিন তুমি হাসপাতালে আসনি। এই তিনদিন তায়েবার কী কষ্ট হয়েছে সে আমি বলতে পারব না। গত পরশুদিন রাতে সে তিনবার জ্ঞান হারিয়েছিল। প্রতিবারই জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে তোমার কথা জিগগেস করেছে। তুমি বোধহয় এরই মধ্যে জেনে গেছো আমার বোনটি বাঁচবে না। তোমাকে যে-কথাটি আমি বলার জন্য ডেকেছি, তিনি একটুখানি ইতস্তত করলেন। হাতের পোড়া সিগারেটটি ফেলে দিয়ে আমার কাছ থেকে আরেকটি সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরালেন। তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে কোনো গোপন কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বললেন, আমার বোনটি তোমাকে খুবই ভালোবাসে। আমার কাঁধে হাত রাখলেন, ভাবতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সে আর বাঁচবেনা। তাঁর চোখের কোনে অশ্রু চিকচিক করে উঠল। আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না।

আমরা হাসপাতালে ফিরে এলাম। এসে দেখি সে মহানিম গাছটির গোড়ায় কেউ নেই। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ওরা সব গেল কোথায়। এই যে দানিয়েল সাহেব এইদিকে আসুন। লাল কংক্রিট বিছানো পথ বেয়ে ডা. মাইতি হাসপাতালের গেটের দিকে যাচ্ছেন। আমি পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, চলুন, আপনাকে খুঁজছিলাম। আমি ডা. মাইতির পেছন পেছন তাঁর কোয়ার্টারে গেলাম। তিনি ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর স্টেথিসকোপ রাখলেন। তারপর বললেন, দানিয়েল সাহেব বসুন, আজকে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি। তিন-চারদিন থেকে আপনার দেখা নেই। আমি তাঁর উল্টোদিকের সোফায় গিয়ে

বসলাম। তিনি বললেন, দিন দেখি আপনার একটা চারমিনার। আপনার সঙ্গে দেখা হলেই আমার সিগারেটের নেশা চেপে যায়। আমি প্যাকেটটা বের করে দিলাম। তিনি একটা ধরিয়ে খকখক কাশলেন এবং গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বলুন, আপনাদের যুদ্ধের সংবাদ। সহসা ডা. মাইতির কথার কোনো জবাব দিতে পারলাম না। তাই ফ্যালফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, আপনাদের যুদ্ধের সংবাদ আমার কাছ থেকে শুনুন। আপনারা খুব শিগগির দেশে চলে যাবেন এবং আপনাদের দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। এখন বলুন, আপনার আনন্দ হচ্ছে কি না। আমি বললাম, আমাদের দেশ স্বাধীন হবে এবং আমরা দেশে ফিরে যাব। তিনি বললেন, এটাই তো আপনারা চেয়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, ডা. মাইতি অন্য কিছু একটা বলতে চান, যুদ্ধসংক্রান্ত কথাগুলো ভণিতা মাত্র। আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমাকে অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত দুঃখের কোনো কিছু হয়তো বলবেন। আমার বর্তমান যা মানসিক অবস্থা কেউ যদি বলে আগামীকাল সূর্য নিভে যাবে বোধহয় কোনো ভাবান্তর ঘটবে না। আমি মনে মনে বিরক্তি অনুভব করছিলাম। ডা. মাইতি আমাকে আসল কথাটি না বলে ধানাইপানাই করছেন কেন। আমি জিগগেস করলাম, আপনি তায়েবার ব্যাপারে কিছু বলবেন ? ইনটেনসিভ কেয়ারে সে কেমন আছে ? ডা. মাইতি টেবিল থেকে পেপারওয়েটটি উঠিয়ে নিয়ে ঘুরাতে থাকলেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট তাই করে গেলেন। তারপর টেবিলের ওপর রেখে সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, কোনো মূল্যবান জিনিস পেতে হলে দাম দিতে হয়, একথা আপনি বিশ্বাস করেন ? আমি বললাম, অবশ্যই বিশ্বাস করি। সুতরাং আপনাকেও দাম দিতে হবে, মনে মনে প্রস্তুত হোন। আমি বললাম, একটু বুঝিয়ে বলুন, আমি এমন মূল্যবান কী বস্তু পেতে যাচ্ছি, যার জন্য দাম দিতে আগেভাগে প্রস্তুত হতে হবে। ডা. মাইতি বললেন, ওই যে বললাম, আপনারা স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছেন। আমি জবাব দিলাম, আমরা কি দাম দেইনি ? তিনি বললেন, আপনার দেশের মানুষ দাম দিয়েছে, আপনি এখনো কোনো দাম দেননি। শুধু কলকাতা এসেছেন। আপনার কোনো পার্সোনাল ট্র্যাজেডি নেই। আপনার পার্সোনাল কন্ট্রিবিউশনের কোটা শূন্য। এইবার ঈশ্বর আপনাকে সে লজ্জা, সে অপমান থেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছেন।

ডা. মাইতির কথায় আমি চমকে উঠলাম। না না ডা. মাইতি অমন করে বলবেন না। আপনি অনুগ্রহ করে তায়েবা কেমন আছে, সেটা বলুন। অত উতলা হচ্ছেন কেন, আপনাকে তায়েবার কথা বলার জন্যই তো ডেকে এনেছি। একটু ধৈর্য ধরুন। বি, এ-ম্যান। তায়েবার অবস্থা এখন একটু ভালো। তাকে একটু আগে ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সেই ব্রিদিং ট্রাবলটা এখন অনেক কন্ট্রোলড কিন্তু এটা স্থায়ী হবে না। অ্যাট এনি মোমেন্ট শি ক্যান গেট ব্যাক টু হার প্রিভিয়াস পজিশন। ইউ আর এ সিরয়াস পার্সন এন্ড আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ সিরিয়াসলি। আপনাকে একজন বন্ধু মনে করি। তাই বলছি, শি উইল নট লাস্ট ভেরি লং। বাট

উই প্রে টু লর্ড সো দ্যাট হি গ্রান্টস হার লংজিবিটি টিল দ্যা ফ্রিডম অব বাংলাদেশ ইজ অ্যাচিভড। ডা. মাইতি উঠে দাঁড়ালেন। আপনাকে চা দিতে বলি। আমি কাপড় ছাড়ি। আমি বললাম ডা. মাইতি এখন চায়ের ঝামেলা করে লাভ নেই। আমি যাই। অলরাইট আসুন। কিন্তু তিনি সাবধান করে দিলেন, বাট ইউ শুড নট ভিজিট হার টু ফ্রিকোয়েন্টলি, আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব ইমোশনাল। শি নিডস কমপ্লিট রেস্ট অ্যান্ড ফুল ট্রাঙ্কুয়িলিটি। সো টেক কেয়ার। অ্যাট দিজ স্টেজ ইউ আর এ লায়াবলিটি টু হার।

ডা. মাইতির কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি এরই মধ্যে নিজে কতটুকু বদলে যাচ্ছি সেকথা চিন্তা করে দেখলাম। তাঁর মুখে তায়েবার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে সে সংবাদটি শুনেছি। এত বড় একটা দুঃসংবাদ শোনার পরও আমার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হল না। আমি দিব্যি হাঁটাচলা করতে পারছি। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু সামাল দিতে পারছি। আমার মানসিক ধৈর্য দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এই যুদ্ধ তলায় তলায় আমাকে কতটুকু বদলে দিয়েছে। সেই নিভৃত পথটুকু অতিক্রম করার সময় আমার চেতনায় ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজতে থাকল, তায়েবার মৃত্যুদণ্ড তো ঘোষণা হয়ে গেছে। কিন্তু চূড়ান্ত ঘটনাটি কখন ঘটবে সেই তারিখটা জানায়নি। আমার মন বলল, ওয়েল ইট ক্যান হ্যাপেন এ্যাট এনি মোমেন্ট। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো আমি সেই নির্জন পারিবারিক রাস্তাটুকু অতিক্রম করে কখন বড় রাস্তায় এসে পড়েছি খেয়াল করতে পারিনি। আমার পেছনে হঠাৎ ঘটাং করে একখানা গাড়ি ব্রেক করল। ট্যাক্সি থেকে শিখ ড্রাইভার নেমে এসে দুটি সবল লোমশ হাতে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে বলতে গেলে একেবারে রাস্তার ওপর ছুড়ে দিল। তারপর গালাগালি দিতে থাকল, শালে লোক মরনেকা আওর কুয়ি মওকা নেহি মিলা। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সর্দারজি তার হাতের একটা প্রবল থাবা আমার কাঁধে বসিয়ে পুনরায় গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেল। গাড়িটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আমার চেতনা হল, আমি এই গাড়ির তলায় চাপা পড়তে যাচ্ছিলাম। সর্দারজির কৃপায় এযাত্রা বেঁচে গেছি। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এড়িয়ে আসার পরও আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারলাম না।

আমি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকলাম, এখন আমার কী করা উচিত। এই অবস্থায় আমি কী করব, কোথায় যেতে পারি। সমস্ত চিন্তা ভাবনা তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত চেতনায় ঘণ্টারোলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আজ তায়েবার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। কিন্তু কখন কার্যকর হবে তারিখটি আমি জানিনে। একজন মহিলা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। আধো আলো আধো অন্ধকারে আমি ঠিক চিনতে পারলামনা কে হতে পারে। গলার আওয়াজ শুনে বুঝলাম অর্চনা। তাকে কোনো জবাব দেবার আগে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, অর্চনা এখানে কেন? সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল এবং বলল, দানিয়েল তোমার

হয়েছে কী ? একটু আগে তুমি গাড়িচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছ। আর তায়েবাদির এখানেও তুমি তিনদিন আসনি। তোমাকে এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে কেন ? আমি স্বগতোক্তির মতো করে বললাম, অর্চনা তায়েবার মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাচ্ছে, আমরা কোনদিন কার্যকর হবে তারিখটি জানিনে। কী সব অলক্ষুণে কথা বলছ, তোমার মাথার কোনো ঠিক নেই। আমি বললাম, জান অর্চনা, আমাকে ডা. মাইতি বাড়িতে ডেকে নিয়ে সব বলেছেন। কী বলেছেন ? বলেছেন কোনো আশা নেই। এখন শুধু খাঁচা ছেড়ে পাখির উড়াল দেয়া বাকি। অর্চনা বলল, দানিয়েল এই সময়ে তোমার মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুবই প্রয়োজন। তায়েবাদির মা খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন। আমার তো ভয় হচ্ছে। মহিলা কেমন জানি হয়ে গেছেন। যেখানে বসেন, বসে থাকেন, ওঠার কথা ভুলে যান। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না। এই তিনদিন জল ছাড়া কিছুই মুখে দেননি। আমি জিগগেস করলাম, এসব তুমি জানলে কেমন করে ? অর্চনা বলল, দানিয়েল তুমি বোকার মতো কথা বলছ। এই তিনদিন আমি দুবেলা তায়েবাদিকে দেখতে এসেছি। যখন বাড়াবাড়িটা শুরু হল সকলে তো ভয়েই অস্থির। ভাগ্যিস মনীষদা কলকাতায় ছিলেন। পি. জি.-র ডিরেক্টর তাঁর বন্ধু এবং একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। তাঁকে ধরে কোনরকমে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাবার সুযোগটা পাওয়া গিয়েছিল। আপাতত তায়েবাদি বিপদমুক্ত। কিন্তু এটা স্থায়ী কিছু না। লুকোছাপা করে তো লাভ নেই। ক্যান্সারের রোগীর শেষ পরিণতি তোমারও তো অজানা থাকার কথা নয়। আরেকটা দরকারি কথা বলি মনে রাখবে। এখন তায়েবাদিকে ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। খুবই ভাল্‌নার‍্যাব্‌ল অবস্থা। সকলকে বলতে শুনলাম, তোমাকে দেখলে তায়েবাদি ভয়ঙ্কর আপসেট হয়ে পড়েন। সুতরাং তুমি হুট করে কেবিনে ঢুকে পড়ার আগে একটু খোঁজ খবর নিয়ো।

অর্চনার কথা শুনে হাজার দুঃখের মধ্যেও আমার কৌতুকবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি যে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, তায়েবার এই মৃত্যুর জন্য আমি একাই দায়ী। সকলে এই কথাটি বুঝে গিয়ে আমাকে সঠিক শনাক্ত করে ফেলেছে। আমি হো হো করে হেসে উঠতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। অর্চনা বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? আমি বললাম পাগল হয়ে যেতে পারলে ভালো হত। আর রাখো তোমার যত্তসব+...। আমি বললাম, অর্চনা এটা একটা চমৎকার নাটক, আমরা সকলে মিলে ঘটিয়ে তুলেছি। এখন শেষ অঙ্কে কী ঘটে দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সকলে প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু আমি তোমাকে একটি সহজ কথা জিগগেস করব। জবাব দেবে ? বলো তোমার সহজ কথাটা, যদি জানা থাকে জবাব দেব। আমি বললাম, আমি দেখতে পাচ্ছি এই নাটকে তুমিও একটা চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছ, এটা কী করে সম্ভব হল আমাকে বুঝিয়ে বলবে ? দানিয়েল আসলে তুমি একটা সিনিক। সব ব্যাপারে ঠাট্টা করার স্বভাবটি তোমার মজ্জাগত। ঠিক বলেছ অর্চনা ওই সিনিসিজমটা এখনো আমার মধ্যে আছে বলেই হাঁটাচলা করতে পারছি। কিন্তু

সেটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়। তখন অর্চনা বলল, তুমি সত্যি একটা অদ্ভুত মানুষ। তবু তোমার একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে, সেকথা আমি অস্বীকার করবনা, তোমার আর তায়েবাদির সম্পর্কের একটি ইন্টারেস্টিং দিক আছে। সেটাই আমাকে ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছিল গোড়ার দিকে। তুমি যখন কোনোকিছু গম্ভীরভাবে পর্যাবেক্ষণ করতে থাক, কখনও জাননা নিজেই সে জিনিসটির অংশ হয়ে গেছ। এই ব্যাপারটা অল্পবিস্তর আমার ক্ষেত্রেও ঘটে যাচ্ছে। এমনিতে আমি রোগী-টোগী দেখতে পারিনে। কিন্তু তায়েবাদির মধ্যে আমি অন্যরকম একটা কিছু দেখেছিলাম, যা সচরাচর দেখা যায় না। সেটাই আমাকে টেনেছিল। তুমি যাই বল দানিয়েল তায়েবাদি একটা অসাধারণ মেয়ে। এমন আশ্চর্য হৃদয়ের মহিলা জীবনে আর একটিও দেখিনি। তায়েবাদিকে দেখলে ভালোবাসতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়। আমি বললাম, অর্চনা সেসব কথা থাকুক। আমি এসব আর সহ্য করতে পারছিনে, তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে? সে এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল। তারপর ঘড়ি দেখল। তুমি একথা বলে খুবই ভালো করেছ। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম আজকে মহানগর নারী সংঘ রবীন্দ্রসদনে তোমাদের ঢাকার বীরাঙ্গনা শহীদ রওশন আরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রওশনআরা রজনী উদযাপন করছে। আমার মেজদি মহানগর নারী সংঘের একজন নেত্রী। তিনি আমাকে দু খানা টিকিট দিয়েছিলেন। সেগুলো ব্যাগের মধ্যেই পড়ে আছে। এখন মাত্র সাড়ে আটটা বাজে। অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলবে। চলো ওই তো রবীন্দ্রসদন। বড়জোর পাঁচ মিনিট। আমি ক্লান্ত ছিলাম, কথা বলার প্রবৃত্তি হলনা। অর্চনার পেছন পেছন রবীন্দ্রসদনে এসে হাজির হলাম।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে দশ পনেরো মিনিট আগে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া উপাচার্যার (নামটা মনে আসছেনা) উদ্বোধনী ভাষণটি শোনা হয়নি। আমরা যখন প্রবেশ করলাম রওশন আরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কলকাতার একজন গুণী শিল্পী একটি গান পরিবেশন করছিলেন। গানের কথাগুলো ভারি সুন্দর। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে গাইছিলেন—

'শহীদ লক্ষ ভাই ভগিনী শহীদ রোশোনারা
তোমরাতো সব প্রাণের আগুন চোখের ধ্রুবতারা
রোশোনারা বোনটি আমার কোন গাঁয়ে যে ছিল তোমার ঘর
সেথায় কি আজ বুটের তলে আকাশ বাতাস রৌদ্রজলে
ধুধু করে পদ্মা নদীর চর।'

শিল্পীর কণ্ঠে গানটি যেই শেষ হল, এই বীরাঙ্গনা তরুণীর স্মৃতির প্রতি অপার সমবেদনায় উপস্থিত দর্শকদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। এই কল্পকন্যাটির প্রতি মমতায় আমার মনটাও মেদুর হয়ে উঠল। গানের পর কলকাতার সবচেয়ে খ্যাতিমান আবৃত্তিকার বিখ্যাত কবি এবং সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর সুললিত ছন্দে

লেখা একটি সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করলেন। তারপরে একজন মাঝবয়েসী মহিলা মঞ্চে এলেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে রওশন আরা সম্পর্কিত এপর্যন্ত যে সব সংবাদ তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, একটা লিখিত বিবরণ পাঠ করলেন। রওশন আরার বাড়ি রাজশাহী জেলার নাটোর। তার বাবা পেশায় একজন পুলিশ অফিসার। এবং সম্পর্কে সে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয়া। পড়াশোনা করত ঢাকার ইডেন কলেজে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন পঁচিশে মার্চ তারিখে ঘুমন্ত ঢাকা নগরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, সে তখন নাটোরেই ছিল। তারপর উত্তরবঙ্গে যখন প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয় রওশন আরা একক প্রচেষ্টায় একটি মহিলা ব্রিগেড গঠন করে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি কাজ করতে থাকে। এক রাতে ঘর্ঘর বিকট আওয়াজ শুনে রওশন আরার ঘুম ভেঙে যায়। সে তার গুপ্ত আস্তানার মহিলা কর্মীদের জাগিয়ে তোলে। সর্বনাশ, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাঙ্ক নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজশাহীর দিকে এগিয়ে আসছে। এখন যদি কোনোরকম বাধা না দেয়া যায়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রতিরোধ সংগ্রাম তছনছ হয়ে যাবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা একজন মুক্তিসেনাকেও জীবিত থাকতে দেবেনা। ট্যাঙ্কের গতি কীভাবে রোধ করা যায়। মহিলা ব্রিগেডের কর্মীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। তারপর রওশন আরা এগিয়ে এসে সাথি মহিলাদের উদ্দেশে বলল, পাকিস্তানি ট্যাঙ্কের গতি কী করে থামিয়ে দিতে হয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মাথার ওড়ানাটা খুলে নিয়ে ভালো করে বুকের সঙ্গে তিনটা মাইন শক্ত করে বেঁধে নিল। সাথি মহিলারা অবাক দৃষ্টিতে রওশন আরার কার্যকলাপ দেখতে থাকে। কারো মুখে একটিও শব্দ নেই। প্রস্তুত নেয়া শেষ হলে, তার প্রাণের বান্ধবী শিরিনকে জড়িয়ে ধরে বলল, শিরিন আমার মাকে বলিস। মুহূর্তের জন্য তার দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। পরক্ষণেই সামনে গিয়ে একমিনিট চুপ করে কী যেন ভেবেছিল। তারপর প্রাণপণ চীৎকারে জয় বাংলা ধ্বনি উচ্চারণ করে, সারা শরীর ট্যাঙ্কের তলায় ছুড়ে দিয়েছিল...

এটুকু পর্যন্ত পাঠ করার পর হলের মধ্যে আহা উহু আফসোস ধ্বনি শোনা যেতে থাকল। কোনো কোনো মহিলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে উঠলেন। শোকের মাতম থিতেয়ে আসতে কমসে কম পাঁচ মিনিট সময় লেগে গেল। যিনি পাঠ করছিলেন, ধৈর্য ধরে সে সময়টুকু অপেক্ষা করলেন। ধীরে ধীরে হল শান্ত হয়ে এলে মহিলা জানালেন, সে রাতে রওশন আরা একটি ট্যাঙ্ক পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছিল। ট্যাঙ্কে যে তিনজন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তাদের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেদন পাঠিকা ভদ্রমহিলা একেবারে শেষ পর্যায়ে জানালেন, রওশন আরার ছিন্নবিচ্ছিন্ন সালোয়ার কামিজের রক্তরঞ্জিত অংশগুলো উদ্ধার করে মহিলা ব্রিগেড তাদের পতাকা বানিয়েছে। বিদেয় নেয়ার আগে মহিলা ডান হাতের মুঠি উর্ধ্বে তুলে উচ্চারণ করলেন, জয় বাংলা। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে জয় বাংলা, জয় বাংলা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

তারপর এলেন আরো এক মহিলা। তিনি এপর্যন্ত ভারতবর্ষের নারীসমাজ রওশন আরার আত্মদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তার একটা আনুষ্ঠানিক বিবরণ দাখিল করলেন। দিল্লিতে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির নেতৃত্বে একটি রওশন আরা ব্রিগেড গঠিত হয়েছে। তাঁরা পায়ে হেঁটে আগ্রা অবধি মার্চ করে গেছেন এবং বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সাড়ে পাঁচলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন। পাটনায় রওশন আরা ব্রিগেডের কর্মীরা নিজের হাতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আড়াই হাজার উলের সুয়েটার বুনে দিয়েছে। এইভাবে এলাহাবাদ, বেনারস, জলন্ধর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, দিল্লির রওশন আরা ব্রিগেডের কর্মীদের বিস্তারিত কর্মসূচির বর্ণনা দিলেন। খোদ কলকাতা শহরে রওশন আরার নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বুঝলাম রওশন আরা নামটি সমগ্র ভারতে, বিশেষ করে ভারতীয় নারীসমাজে উদ্দীপনার একটি শিখা হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছে। যে মেয়ে নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বুকে মাইন বেঁধে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতি দিয়ে দুনিয়ার নারীসমাজে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তাঁর নামে কিছু করতে পারাটা নারীজন্মের এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার, একথা কে অস্বীকার করবে।

তারপর যখন ঘোষিকা জানালেন, এখন কলকাতার একটি নামকরা নাট্য প্রতিষ্ঠান রওশন আরার আত্মদানের ঘটনাটি অবলম্বনে রচিত একটি একাঙ্কিকা পরিবেশন করবে। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। আমি পাশে বসা অর্চনাকে কানে কানে জানালাম, আমাকে এবার যেতে হবে। অর্চনা বলল, চলে যাবে ? আমি বললাম, ভীষণ খারাপ লাগছে। সে বলল, যাও, আমি মেজদির সঙ্গে যাব।

যখন রবীন্দ্রসদন থেকে বেরিয়ে এলাম, প্রায় দশটা বেজে গেছে। ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও একা একা হাঁটতে থাকলাম। সমগ্র ভারতে রওশন আরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম থেকে এইরকম রওশন আরার মতো বীরকন্যা যদি সত্যি সত্যি জন্ম নিত, তা হলে আমাদের সংগ্রামের অবস্থা কী দাঁড়াত মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। আমার বন্ধু আগরতলার অধ্যাপক বিজন চৌধুরীর ছোট ভাই বিকচ চৌধুরীর তেজোদ্দীপ্ত চেহারাটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিকচের প্রকাণ্ড কল্পনা করার ক্ষমতা সঠিক খাতে প্রবাহিত হলেও উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে কী অঘটনই না ঘটিয়ে তুলতে পারত। আগরতলা এম. বি. বি. কলেজের গ্র্যাজুয়েট বিকচ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভৌমিক চৌধুরীর জেন্টস পকেট রুমালের মতো দৈনিক পত্রিকাটিতে উর্বরা কল্পনাশক্তিপ্রসূত নতুন নতুন কল্পকাহিনীর জন্ম দিয়ে যাচ্ছে এখনো।

আমার এখনো সে সন্ধেটির কথা মনে আছে। সারাদিন খুব বিষ্টি ছিল। বিকচ প্রতিদিন সীমান্তে যেয়ে এটা সেটা সংবাদ এনে পেছনের চারটি কলাম ভরাট করত। বিকচের মতো মানুষেরও মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য আগরতলা

সীমান্তে যেতে হত। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কারণ বিকচ নিউজপ্রিন্টের প্যাড নিয়ে বসলেই গানবোট ডুবত, কনভয়ের পর কনভয় সৈন্য ধ্বংস হয়ে যেত ; ট্রেন লাইন উড়ে যেত। তথাপি বিকচ সাইকেলটাতে প্যাডেল ঘুরিয়ে সীমান্ত অবধি যেত, কারণ প্রতিদিন যেতে যেতে ওটা তার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিকচ তার ছোট্ট পত্রিকার পাতায় এত সৈন্য মেরেছে, এত ট্যাঙ্ক ছারখার করেছে, এত কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার বন্দি করেছে, আগরতলার মানুষ তার মারণক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে পাকিস্তানি সৈন্যের যম টাইটেল দিয়েছে। এপ্রিলের শেষের বৃষ্টিমুখর দিনটিতে, আধভেজা অবস্থায় অফিসে এসে দেয়ালে সাইকেলটি ঠেকিয়েই ঘোষণা দিয়ে বলল, এ বিষ্টিতে কোথাও যেতেটেতে পারবনা। ধ্যাননেত্রে আগে একটু দেখে নেই, বাংলাদেশে আবার নতুন কী ঘটল। হাতের সিগারেটটি আমাকে দিয়ে বলল, ততোক্ষণে তুমি এটা টানতে থাক। আমি একটু চোখ বুজে দেখি। সত্যি সত্যি কয়েক মিনিট চোখ বুজে রইল। চোখ খুলে আমাকে জিগগেস করল, সিগারেট কি সত্যি সত্যি শেষ করে ফেলেছ। আমি বললাম, তুমি সবটা পুড়িয়েই আমাকে দিয়েছিলে, একটান দিতেই সব শেষ। যাও দিপুকে দিয়ে মনার দোকান থেকে আমার নাম করে পাঁচটা চারমিনার আনতে বলো। সিগারেট এলে একটাতে অগ্নি সংযোগ করে লম্বা লম্বা কটা টান মেরে, নিউজপ্রিন্টের প্যাডে পুরো খবরটা সে রচনা করেছিল। বয়ান এ রকম ফুলজান নাম্নী এক যুবতী বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তানি সৈন্যের একটা আস্ত ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে দেখিয়ে বলল, দেখ তো খবরটা কেমন হয়েছে। আমি বললাম, দ্যা আইডিয়া ইজ গ্র্যান্ড। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এরকম একটা বীরকন্যা জন্মাতে পারলে খুব ভালো হয়। বিকচ আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, আমরা যদি না লিখি তা হলে জন্মাবে কেমন করে। 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে'। সে বাঁ চোখটা টিপে একটু হেসেছিল। আমি বললাম যে এ ক্ষেত্রে একটা সেকেন্ড থট দিতে হবে।

যে কোনো সংবাদ—কী, কেন, কোথায়, কখন, কীভাবে এই এতগুলো কেনর জবাব দিতে না পারলে বিশ্বেসযোগ্য হয়ে ওঠে না। তোমার গল্প সেই শর্তগুলো পূরণ করেনি। ধরো নাম নির্বাচনের বিষয়টি। তুমি বলেছ ফুলজান। এই নামটি একেবারেই চলতে পারে না। বাঙালি মুসলমানের নাম সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তাই ফুলজান শব্দটি তোমার কলমের মুখে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে ফুলজান যাদের নাম, তারা বড়জোর হাঁড়িপাতিল ঘষে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতি দিতে পারে না। সুতরাং একটা যুতসই নাম দাও, যাতে শুনলে মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগবে। রওশন আরা নামটি মন্দ কী। বঙ্কিম এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন। নামের তো একটি মহাত্ম্য আছেই। রওশন আরা নাম যে মেয়ের, সে যেমন হৃদয়াবেগের আহবানে সাড়া দিয়ে জয়সিংহের ভালো বাসতে পারে তেমনি দেশজননীর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতিও দিতে পারে। নামটা মনে ধরেছিল বিকচের। তারপর গল্পের নিয়মেই

বাকি ব্যাপারগুলো বেরিয়ে এসেছিল। তার বাড়ি নাটোর। তার বাবা পুলিশ অফিসার। সে ইডেনে পড়ত এবং শেখ মুজিবের আত্মীয়া ইত্যাদি। বিকচ যদি রওশন আরার বাবার মর্যাদা পায় আমাকে কাকা টাকা কিছু একটা বলতেই হবে। সংবাদটি সামনের পাতায় বক্স করে আগরতলার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভৌমিক চৌধুরীর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আগরতলার মানুষ এটাকেও আরেকটা বিকচীয় উদ্ভাবন ধরে নিয়েছিলেন। কেউ হ্যাঁচ্ছোটিও করেননি।

মাসখানেক বাদে আমি যখন কলকাতায় এলাম অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই কলকাতা শহরে বিকচের কল্পকন্যাটির নবজন্ম ঘটে গেছে। আকাশবাণীর দেব-দুলাল বাবুর কল্যাণে রওশন আরার পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। রওশন আরার আত্মীয়স্বজনরা রেডিয়োতে সাজানো সাক্ষাৎকার দিতে আরম্ভ করেছেন।

তার পর থেকে ভারতের পত্রপত্রিকাসমূহ রওশন আরাকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। আনন্দবাজার যদি হেডলাইন করে, যুগান্তর ছাপাচ্ছে জীবনবৃত্তান্ত। অমৃতবাজার উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করছে। মিতভাষী বলে স্টেটসম্যানের সুনাম আছে। এই সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্রটি সম্পাদকীয় কলামে রওশন আরার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিল। পত্রপত্রিকার প্রচার একটু থিতিয়ে এলেই রওশন আরাকে নিয়ে কবি মশায়েরা কবিতা লিখতে এলেন। শিল্পীরা গান গাইতে থাকলেন। নাট্যদল নাটক করতে এগিয়ে এল। প্রথম প্রথম ওসব দেখে আমার ভীষণ মজা লাগত। যুদ্ধের প্রথম বলিই তো সত্য। কিন্তু আমি বা বিকচ ইচ্ছে করলেই রওশন আরাকে আবার নিরস্তিত্ব করতে পারিনে। আমরা যদি হলপ করেও বলি, না, ঘটনাটি সত্যি নয়, রওশন আরা বলতে কেউ নেই, সবটাই আমাদের কল্পনা—লোকজন আমাদের পাকিস্তানি স্পাই আখ্যা দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য ছুটে আসবে। এই সময়ের মধ্যে রওশন আরার ভীষণ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। সি. পি. আই. যদি করে রওশনআরা দিবস, কংগ্রেস পালন করছে রওশনআরা রজনী। আমাদের কী ক্ষমতা রওশন আরার অস্তিত্ব ধ্বংস করি।

আজকে ওই রওশন আরার ওপর অনুষ্ঠানটি লেখার পর আমার মনে একটা চোট লাগল। তায়েবা ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় আসাদ হত্যার দিনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পত্রপত্রিকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সবগুলো কাগজে পুরোপৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছিল। আজ সে কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রহর গুনছে আর অলীক রওশন আরার ভাবমূর্তি ভারতীয় জনমনে অক্ষয় আসন দখল করে আছে। হায়রে তায়েবা তোমার জন্য অশ্রু। হায়রে বাংলাদেশ তোমার জন্য বেদনা। কেন এরকম ভাবলাম বলতে পারব না। হয়তো ভাবলাম, একারণে যে যার অস্তিত্ব কস্মিনকালেও ছিল না, সেই রওশন আরার ভাবমূর্তি আকাশপ্রমাণ উঁচু হয়ে উঠেছে। আর তায়েবা, একসময়ে যে বাংলাদেশে সংগ্রামের উষ্ণ নিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, আজ কলকাতার হাসপাতালে সকলের অগোচরে মারা যাচ্ছে।

চৌদ্দ

তায়েবার কথা প্রায় শেষ। একটি নারী দিনে দিনে নীরবে নিভৃতে কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে একটি কেবিনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা জানতাম সে মারা যাবেই। মারা যাবার জন্যই সে কলকাতা এসেছে। যুদ্ধ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী, আর তায়েবাকে এখানে রেখে যেতে হবে। তায়েবা অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। স্বাভাবিক মানুষ যেমন করে জীবনের কর্তব্যগুলো পালন করার জন্য নিতান্ত সহজভাবে সংকল্প গ্রহণ করে, সেও তেমন আসন্ন মৃত্যুর কাছে মন প্রাণ সবকিছু সমর্পণ করে প্রতীক্ষা করছিল।

তায়েবার প্রাক-মৃত্যুকালীন আনুষ্ঠানিকতা—অর্থাৎ একজন ক্যান্সার রোগীকে শেষ মুহূর্তে যে ধরনের চিকিৎসা করা হয়, ডাক্তারেরা করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তায়েবাকে একজন সাধারণ রোগীর চাইতে অধিক ভালোবাসতেন। তাই সকলে মিলে চেষ্টা করছিলেন, তার কষ্টটা যেন কম হয়। কিন্তু ডাক্তারেরা হাজার চেষ্টা করেও তায়েবার কষ্ট কমাতে পারেনি। মৃত্যুর তিনদিন আগেই তাকে শুনতে হয়েছে, ফ্রি স্কুলের চাচার বাড়িতেই তার মা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছেন। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। যে বাড়ির মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে যৌবন ছিনে প্রাণপণ প্রয়াসে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আজ প্রায় দু যুগেরও বেশি পরে, সেই একই বাড়িতে তিনি একখণ্ড জড় পদার্থের মতো পড়ে আছেন।

ডিসেম্বরের চার তারিখ ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐদিন সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত গোটা কলকাতা শহরে বিমান হামলার ভয়ে কোনো আলো জ্বলেনি। সেই ব্ল্যাক আউটের রাতে তায়েবার কাছে কোনো ডাক্তার আসতে পারেনি। কোনো আত্মীয়স্বজন পাশে ছিলনা। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে যে অন্ধকার কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে তায়েবা আত্মবিসর্জন করল।

অলাতচক্র

[রচনাকাল-১৯৮৫]

আদিরূপ

অলাহুত চক্রমধ্যে প্রেমের অঙ্কুর
রূপ রস বাক্যযোগে সৃজিল প্রচুর।

— পদ্মাবতী কাব্য : মহাকবি আলাওল

এক

আমি যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছলাম, বেলা পশ্চিমে চলেছে। মনুমেন্টের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতরো হয়ে নামছে। রবীন্দ্রসদনের এদিকটাতে মানুষজন গাড়ীঘোড়ার উৎপাত অধিক নয়। মহানগর কোলকাতা এদিকটাতে নম্র, শান্ত। বিশেষ করে এই ক্ষণটিতে যখন গোধূলির আলোর সঙ্গে বিদ্যুতের আলোর দৃষ্টি বিনিময় হয়।

ঝাকড়া গাছগুলোর ছায়া রাস্তার ওপর বাঁকা হয়ে পড়েছে। এখানে সেখানে নগরকাকের কয়েকটি জলসা চোখে পড়লো। পরিবেশের প্রভাব বলতে হবে। সমবেত কণ্ঠের কাংস্যধ্বনিও একটুখানি মোলায়েম মনে হলো। ট্রাফিকের মোড়টা বাঁয়ে রেখে পিজি হাসপাতালে ঢোকার পর মনে হলো, লাল ইটের তৈরী কমপ্লেক্স বিল্ডিংটা আমাকে আস্ত গিলে খাওয়ার জন্য যেনো উদ্যত হয়ে রয়েছে।

হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ারের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। মানুষজন চলে যেতে শুরু করেছে। এখন আমার কর্তব্য কি ঠিক করতে না পেরে কম্পাউন্ডের প্রাচীরঘেঁষা নিমগাছটির তলায় দাঁড়িয়ে একটা চারমিনার জ্বালালাম। মনের প্রবল উৎকণ্ঠা দমন করার জন্য আরো একটা সিগারেট জ্বালালাম। হাসপাতালে একজনের খোঁজ করতে এসে কাউকে কিছু জিগগেস করার সাহস না থাকায় ধূমপান করে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ কাজ মনে হলো।

এই যে দাদা আগুনটা দেবেন? হাসপাতালের উর্দিপরা একজন মানুষ আমার সঙ্গে কথা বললো। মনে হলো অকূলে কূল পেয়ে গেলাম। চেয়ে দেখলাম লম্বাটে একটা মানুষ। বাঁ চোখটা ট্যারা। দারোয়ান হতে পারে, ওয়ার্ডবয় হতে পারে, আবার মেল নার্স হলেও অবাক হবার কিছু নেই। আমি ম্যাচ জ্বালতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিলো লোকটি। আহা শুধু শুধু একটা কাঠি নষ্ট করবেন কেনো? দিন না সিগারেটটা। আধপোড়া সিগারেটটি নিয়ে লোকটি নিজের সিগারেট জ্বালালো।

ভাগ্যটা যে খুব ফর্সা একথা বলতেই হবে। একেবারে হাসপাতালের একটা মানুষ না চাইতে পেয়ে যাওয়া, রাজবাড়ীতে এসে রাজার প্রধান খানসামার নেকনজরে পড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। আমি জিগগেস করলাম, দাদা আপনি কি এই হাসপাতালের লোক? নাকে মুখে প্রচুর ধূম্ররাশি উদ্গিরণ করে জানালো, আমি এই হাসপাতালে চৌদ্দ নম্বর ফিমেল ওয়ার্ডে চাকরী করি। তারপর আমার দিকে

খুব তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে আপাদমস্তক ভালো করে দেখে বলে বসলো, আপনি বুঝি জয়বাংলার লোক?

আমার জবাব দেবার প্রয়োজন ছিলো না, কাপড়চোপড়, মুখভর্তি দাড়ি—এসব আমার পরিচয়পত্রের কাজ করলো। লোকটা এরই মধ্যে হাতের সিগারেট শেষ করে একটুখানি আমার কাছে ঘেঁষে এলো। তারপর নিজে নিজে বলতে থাকলো, মশায়, আজ সারাদিন কি হ্যাঙ্গামটাই না পোহাতে হলো। তিন তিন বেটা অ্যাবসেন্ট। ডবল ডবল ডিউটি করতে হচ্ছে, দিন আপনার একখানা চারমিনার। এখুনি আবার ডাক পড়বে।

এরকম একটা সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম। পারলে গোটা প্যাকেটটাই আমি দিয়ে ফেলি। আপাতত সে রকম কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ায় একটি শলাকায় আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। লোকটার সিগারেট খাওয়ার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। অসন্তুষ্ট বিরক্ত শিশু মাতৃস্তনে মুখ লাগিয়ে যেমন গিসগিসিয়ে টান মারে সেরকম একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। কপালের বলিরেখাগুলো জেগে ওঠে, চোখের মণি দুটো বেরিয়ে আসতে চায়। আমাকে খুশী করার জন্যই বললো, জানেন দাদা, আমাদের ওয়ার্ডে আপনাদের জয়বাংলার একটা ফিমেল পেসেন্ট ভর্তি হয়েছে।

লোকটা এ পর্যন্ত দু'দুবার জয়বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করলো। কোলকাতা শহরের লোকদের মুখে জয়বাংলা শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনলে ইদানীং আমার অস্তিত্বটা কেমন জানি কুঁকড়ে আসতে চায়। শেয়ালদার মোড়ে সবচেয়ে সস্তা সবচেয়ে ঠুনকো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের নাম জয়বাংলা স্যান্ডেল। একহপ্তার মধ্যে যে গেঞ্জী শরীরের মায়া ত্যাগ করে তার নাম জয়বাংলা গেঞ্জী। জয়বাংলা সাবান, জয়বাংলা ছাতা, কতো কিছু বাজারে বের করেছে কোলকাতার মানুষ। দামে সস্তা, টেকার বেলায়ও তেমন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ট্যাকের কথা চিন্তা করে এ সকল পণ্য বাজারে ছেড়েছে। কিছুদিন আগে যে চোখওঠা রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো কোলকাতার মানুষ মমতাবশত তার নামও রেখেছিলো জয়বাংলা। এই সকল কারণে খুব ভদ্র অর্থেও কেউ যখন জয়বাংলার মানুষ বলে চিহ্নিত করে, আমাদের অল্পস্বল্প বিব্রত না হয়ে উপায় থাকে না।

সে যাকগে। আমি জিগগেস করলাম, আপনার ওয়ার্ডে বাংলাদেশের পেসেন্টটির নাম কি জানেন? নামটাম আমি জানিনে, উনি আছেন উনত্রিশ নম্বর বেডে। আমি বললাম, আমি এসেছি একজন রোগিনীর খোঁজে। কি অসুখ, কোথায় ভর্তি হয়েছে কিছুই বলতে পারবো না। আপনি কি এ ব্যাপারে কোনো উপকার করতে পারেন? চারমিনারের প্যাকেটে যে ক'টা সিগারেট অবশিষ্ট ছিলো তার হাতে তুলে দিলাম। লোকটা এবার আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, চলুন না চৌদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে, উনত্রিশের পেসেন্টটি যদি হয়ে যায়, তাহলে তো পেয়েই গেলেন। উনত্রিশের পেসেন্ট জয়বাংলার। অন্য কোনো পেসেন্ট থাকলে সে খবরও জানতে পারে।

পিছে পিছে এল টাইপের একতলা বিল্ডিংটির লনের কাছে এলাম। লোকটি বললো, একটু দাঁড়ান, দেখি জিগগেস করে। চার পাঁচটি মহিলা লনে পায়চারী

করছে, সেদিকে তাকিয়ে হাঁক দিলো, এই যে জয়বাংলার দিদিমণি, এদিকে এসে একটু দেখুন। আপনাদের জয়বাংলার এক ভদ্দরলোক একটা ফিমেল পেসেন্টের তালাশ করছে। দেখুন তো আপনি চিনতে পারেন কিনা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কপালের দিকে সরে আসা চুলের গোছাটি সরাতে সরাতে তনু সুরকী বিছানো পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে ডাকছো নাকি গোবিন্দদা? আজ্ঞে দিদিমণি, আপনাদের জয়বাংলার এক ভদ্দরলোক একজন ফিমেল পেসেন্ট খুঁজছে। দেখুন তো আপনি চিনতে পারেন কিনা।

এতোক্ষণে জানা গেলো লোকটির নাম গোবিন্দ। তনু তার সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি এরই মধ্যে এখানেও চালু করে ফেলছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই আনন্দে তনুর চোখজোড়া চকচক করে উঠলো। পিঠের উপর ঢলের মতো নেমে পড়া ছড়ানো চুলের রাশিতে একটা কাঁপন জাগিয়ে বললো, একে কোথায় পেলে গোবিন্দদা?

দিদিমণি, আপনার অতোসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না, আমি চললাম। ওয়ার্ডে এসে আমাকে না পেলে ড. মাইতি একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। ড. মাইতির কাঁচা খাওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই গোবিন্দ চলে গেলো।

তনুকে দেখাচ্ছে বেশ সুন্দর। এই ক'মাসে তার চেহারায় একটা বাড়তি লাবণ্য ফুটছে। তার পিঠঝাপা অবাধ্য চুলের রাশি না দেখলে তাকে চিনে নিতে নিশ্চয়ই কয়েক মিনিট সময় নিতো। তনুর এমন সুন্দর সুঠাম সুগঠন শরীরের কোথায় রোগ ঢুকে তাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে, ভেবে ঠিক করতে পারিনে। আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে সে জিগগেস করলো, দানিয়েল ভাই, এ্যাতোদিন আসেননি কেনো? কি, কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন যে, যান আপনার সঙ্গে কোনো কথা নেই। যান, চলে যান। পরক্ষণে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। এই যে আরতিদি, শিপ্রা, মঞ্জুলিকা, উৎপলা, দেখে যাও কে এসেছে।

তনুকে কোনোদিন বুঝতে পারিনি। সে প্রয়াসেও ক্ষান্ত দিয়েছি। পায়ে পায়ে চারজন সুবেশ সুন্দরী নারীমূর্তি এগিয়ে আসতে দেখে আমার মনে একটা খারাপ চিন্তা জন্ম নিলো। এই সমস্ত মহিলা হাসপাতালে বিউটি কম্পিটিশন করতে এসেছে, না রোগ সারাতে এসেছে!

তনু বললো, এই যে আরতিদি, আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন দানিয়েল ভাই, এসএসসি হতে এমএ পর্যন্ত সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছেন। স্কলারশীপ নিয়ে বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাও পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিলো। মাঝখানে সংগ্রাম শুরু হলো, তাই...।

আর ইনি হচ্ছেন আরতিদি, আগে বাড়ী ছিলো আপনাদের চাটগাঁয়ের পটিয়ায়। আমার পাশের রুমে থাকেন। এই হচ্ছে শিপ্রা গুহঠাকুরতা, বরিশালের বানরীপাড়ার গুহঠাকুরতা পরিবারের মেয়ে। অবশ্য পার্টিশনের বহু পূর্ব থেকে এরা

কোলকাতায় সেটেলড। আপনার তো একজন প্রফেসরের নামও গুহঠাকুরতা। পুরো নামটি কি যেনো?

নীরবে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। জ্যোতির্ময়বাবুকে পঁচিশে মার্চের রাতেই পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁর কোয়ার্টারে গুলী করে হত্যা করেছে। সংবাদটা তনুর অজানা ছিলো তেমন হতে পারে না। হয়তো স্মৃতির বিভ্রম ঘটেছিলো। সেও একটুখানি চুপ করলো।

এই যে মঞ্জুলাকে দেখছেন তারও আসল বাড়ী ছিলো বাংলাদেশে। ময়মনসিংহ জেলায়। পোড়ারমুখী তিন বছর থেকে এই হাসপাতালে ডেরা পেতে রয়েছে। অবশ্য মাঝে মাঝে নাইয়র যায়। হাসপাতালের ডাক পড়লে আবার ছুটে আসতে হয়।

সবশেষে উৎপলার হাত ধরে বললো, এর পরিচয় আপনি জানতে পারবেন না। এর সাতপুরুষের কেউ কস্মিনকালেও পদ্মার হে পারে যায়নি। একেবারে জাত ঘটি। ঘোরতরো ব্রাহ্মণকন্যা। এখন ঠেকায় পড়ে এই ম্লেচ্ছনির সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হচ্ছে।

রাত্রিবাস শব্দটি তনু এমন এক বিশেষ ভঙ্গীতে উচ্চারণ করলো, সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। এই সবিস্তার পরিচয়পর্বটা আমার যে ভালো লাগেনি, তনুর তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ছোটো তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসকে বড়ো করে দেখাবার বেলায় তার যে জুড়ি মেলে না সেকথা বলাই বাহুল্য। আমি মনে মনে বোধ করতে লাগলাম, আজকের তার এই মহৎ উদ্যোগটি সমস্ত শালীনতা এবং বিশেষ যোগ্যতার সীমানা অনেকদূর ছাড়িয়ে গিয়েছে।

জীবনে আমি ফার্স্ট, সেকেন্ড কিছুই হইনি। একবার উত্তীর্ণ ছাত্রমণ্ডলীর তালিকায় উপরের দিক থেকে লাস্ট এবং নীচের দিক থেকে ফার্স্ট হয়েছিলাম। গোটা ছাত্রজীবনে সেবারের মতো অতো কড়াকড়িভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে এই ধারাটি আমি মেনে চলে আসছি। এজন্য আমার আক্ষেপও নেই। বরঞ্চ পরীক্ষায় যারা ভালোটালো করে, তাদের প্রতি আমার মজ্জাগত সীমাহীন অবজ্ঞা।

মুখে সাত আট দিনের না কামানো দাড়ি, পরনে জয়বাংলা চপ্পল, জয়বাংলা সার্ট, জয়বাংলা প্যান্ট, অনাহার অর্ধাহার অনিদ্রার ছাপ চোখেমুখে ধারণ করে আমি জয়বাংলার মূর্তিমান শিলাস্তম্ভে পরিণত হয়েছি। এটাই আমার বর্তমান, এটাই আমার অস্তিত্ব।

এই কোলকাতা শহরে অনেক মানুষ আমাদের অবজ্ঞা করেছে, হেলাফেলা করেছে, খারাপ লাগলেও বিশেষ কিছু মনে করিনি। কারণ, ধরে নিয়েছিলাম ওটাই আমাদের প্রাপ্য। অনেকে অবশ্য এনিয়ে এন্তার বাড়াবাড়ি করেছে। সেগুলোকে করুণাজীবী ভিখিরির আন্দোলনের অধিক কিছুই মনে হয়নি আমার। কিন্তু আজকে তনু যে কাজটা করলো, প্রায় একটা বনের শিম্পাঞ্জীকে তার হাসপাতালনিবাসী বান্ধবীদের কাছে অক্সফোর্ডের র‍্যাংলার বলে পরিচয় দিলো, এটা কি তারা বিশ্বাস করেছে? এটা কি তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে?

প্রায় সাত মাস পরে তনুর সঙ্গে আমার দেখা। কি চমৎকার অভ্যর্থনা না সে আমাকে জানালো! তার ঠিকানা সংগ্রহ করে এই হাসপাতালে এসে পৌঁছুতে আমাকে কি কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে? পারলে তার মুখে একটা চড় বসিয়ে পা ঘুরিয়ে সোজা ফেরত চলে আসতাম। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল ছিলো না। তাছাড়া শরীর মনে এতোদূর বিপর্যস্ত ছিলাম যে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায়, এরকমের আনকোরা একটি অভাবিত নাটক জমিয়ে তোলা সম্ভব ছিলো না।

তনু আমাকে তার রুমে নিয়ে গেলো। দুটো মাত্র বেড। পানির বোতল গ্লাস ইত্যাদি রাখার একটি করে কাঠের স্ট্যান্ড, স্টীলের একটা ছোট্ট মিটসেফ জাতীয় বাক্স, যেখানে প্রয়োজন মতো কাপড়চোপড় ওষুধপথ্যাদি রাখা যায় এবং ভিজিটরদের জন্য একটি করে টুল—এই হলো আসবাবপত্তর।

তনু বিছানায় উঠে বালিশটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে আমাকে টুল দেখিয়ে বললো, জানেন তো ভিজিটরদের রোগীর বিছানায় বসতে নেই। তাছাড়া আপনার পায়ে কতো রাজ্যের ময়লা থাকে। কোনো সুস্থ মানুষও যদি আপনাকে বিছানায় বসায় তাহলে তাকে পরে পস্তাতে হবে। একথা সত্যি। কোনোদিন তনুরা তাদের গেন্ডারিয়ার বাসায় সরাসরি বিছানায় বসতে দেয়নি আমাকে। আমি গেলে আগেভাগে একটা আধময়লা চাদর বিছিয়ে তার ওপর বসতে দিতো। এভাবে খাটজোড়া ধবধবে সাদা চাদর অকলঙ্ক শুভ্রতা রক্ষা করতো।

এই সময়ে হাসপাতালের শেষ ঘণ্টা বেজে গেলো। না চাইতেই একটা সুযোগ আমার হাতে এসে গেলো। আমতা আমতা করে বললাম, জায়গাটি তো চেনা হলো। আরেকদিন না হয় আসা যাবে। আজ চলি। যতোই মৃদুভাবে বলি না কেনো আমার কথাগুলোতে রাগ ছিলো, ঝাঁঝ ছিলো। এটুকু না বুঝতে পারার মতো বোকা নিশ্চয়ই তনু নয়। সে শশব্যস্তে বললো, সে কি, কতোদিন পর এলেন, এখনই চলে যাবেন! একটু বসুন দু'চারটা কথাবার্তা বলি। আমি অপারগতার কথা জানিয়ে বললাম, ঘণ্টা বেজে গেলো, এখন যাওয়াই উত্তম। আরে সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আমি মাইতিদাকে বলে সব ম্যানেজ করে নেবো। জিগগেস করলাম মাইতিদাটি কে? জবাবে জানালো মাইতিদা হলেন আমার ডাক্তার ড. মাইতি। বাইরে ভদ্রলোক খুব কড়া, কিন্তু মনটা অসম্ভব রকমের সুন্দর। একটু পরে আসবেন। আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন, দেবতার মতো কি রকম সুন্দর মন।

তার একথায় আমি স্প্রীংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলাম, দোহাই, দোহাই তনু, উদ্ধার করো। দিদিমণিদের সামনে তুমি একটা সার্কাস দেখিয়ে ফেলেছো। আরেকটা সার্কাস যদি তুমি তোমার মাইতিদার সামনে দেখাবে বলে মনস্থ করে থাকো, আমি তাতে রাজী হতে পারবো না। বরঞ্চ আমি চলি, তোমার দেবদুর্লভ চরিত্রের মানুষদের গুণপনা এই সময়ে তো সারা কোলকাতা জেনে ফেলেছে। দেবচরিত্রে আর আমার অধিক আগ্রহ নেই।

তনু এবার ফোঁস করে উঠলো, আপনি আমার অসুখের সংবাদ নিতে এসেছেন, নাকি যেসব কথা শুনে শুনে আমার কানে পোকা ধরে গেছে সেগুলো

আবার বলতে এসেছেন? চলে যান, চলে যান, আপনাকে ডাকতে গিয়েছিলো কে? যান, একখানা লাউডস্পীকার ভাড়া করেন, কোলকাতা শহরে আমার লোকদের যে কথা রাষ্ট্র হয়েছে ঘটা করে প্রচার করুন। ভাড়ার টাকা আমি দেবো।

তনুর এই আচমকা বিস্ফোরণে আমি দমে গেলাম। টুলের ওপর বসে বললাম, তুমি এই মহিলাদের সামনে আমাকে এমনভাবে অপমানটা করলে কেনো? কই অপমান করলাম, কোথায় অপমান করলাম! মনটা আপনার অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই যে বললে আমি প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে আসছি। বা রে, অন্যায় কি বলেছি, আপনি তো অনেক কাজ করে পড়াশোনা করেন; তাই, সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে মন লাগিয়ে পড়াশোনা করলে আপনিও ফার্স্ট টার্স্ট কিছু একটা হতেন। আর যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হয় তারা আপনার চাইতে ভালো কিসে?

নিজের প্লাস পয়েন্টগুলো অন্যের মুখে উচ্চারিত হলে কার না ভালো লাগে? আমি হাসিমুখে বললাম, আর বিলেত যাওয়ার ব্যাপারটি? আরে, দূর দূর, ওটা একটা ব্যাপার নাকি? আজকাল কুকুর বেড়ালেরাও বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে। আপনিও যেতে চাইলে অবশ্যই যেতে পারবেন। তাছাড়া...

আমি বললাম, তাছাড়া আর কি? সে বললো, আপনি একটা গেঁয়ো ভূত, খেতের মিষ্টিকুমড়ো। আমি বললাম, সে ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে বিলেত যাওয়াটা তুমি কেমন করে জড়াচ্ছ? আপনি সব কথার কুষ্ঠিনামা বের করতে চান। চাল বোঝেন, চাল? ঐসব মেয়েরা প্রতিদিন আমার সঙ্গে নানা রকম চাল মারে, আজ না হয় আমিও একটা চাল মারলাম। আপনি এটুকু বোঝেন না?

তুমি তো পরিচয় করিয়ে দিলে তোমার দিদি, তোমার সই, তোমার বন্ধু— এখন বলছো সব চালবাজ। আমার দিদি, আমার সই, আমার বন্ধু ঠিক আছে, কিন্তু চাল মারতে অসুবিধা কোথায়? আপনি মেয়েদের সম্পর্কে জানেন কচু। সে বুড়ো আঙ্গুলটি উঠিয়ে দেখালো।

শুনেন দানিয়েল ভাই, তনু ঝলমল করে উঠলো, সেদিন হাসপাতালে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। ধনীঘরের এক ভদ্রমহিলা বিউটি পারলারে গিয়ে ছাতার মতো বড়ো এক মস্ত খোঁপা তৈরী করিয়ে আসে। বাড়ী আসার পরে মহিলার মনে হতে থাকে তার মগজের ভেতর কিছু একটা নড়ছে, লাফ দিচ্ছে। এরকম একটা আজগুবী অসুখের কথা শুনে সকলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। অনেক ডাক্তার কবরেজ ডাকা হলো, কেউ কিছু করতে পারলো না। মহিলাকে নাকি স্যার নীলরতন হাসপাতালে নেয়া হয়েছিলো। সেখানেও নাকি ডাক্তারেরা রোগের উপসর্গ নির্ণয় করতে পারেননি। অবশেষে মহিলাকে একরকম ফেন্ট অবস্থায় এ হাসপাতালে আনা হয়। ডাক্তাররা স্থির করেন, খোঁপাটি খুলে ফেলে যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখতে হবে, মগজের মধ্যে কি ঘটনা ঘটছে।

সত্যি সত্যি যখন নার্সরা মহিলার শখের খোঁপাটি খুলতে লেগে গেলো, মহিলা ফেন্ট অবস্থাতেও দুহাত দিয়ে খোঁপা খুলতে বাধা দিয়েছে। পরে খোলা হলে দেখা গেলো এক টিকটিকি টিকটিক করে লেজ দুলিয়ে দেয়ালের দিকে লাফ

দিলো টিকটিকি বাহাদুর খোঁপা বাঁধার কোন ফাঁকে আটকা পড়ে গেছে কেউ টের পায়নি সেই থেকে যতোই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, মহিলার মনে হয়েছে খুলি ফেটে তার মাথার মগজ বেরিয়ে আসতে চাইছে। সত্যি ঘটনা, বুঝলেন মেয়েরা কেমন হয়?

আমি বললাম, যতোদূর জানি তুমিও তো একজন মেয়ে, তোমার বিষয়ে এর অন্যথা হবে কেনো? সে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বললো, আপনি এখনো খেতের মিষ্টিকুমড়ো রয়ে গেছেন, কিছুই শিখলেন না। এই সময়ে ডানহাতে স্টেথেসকোপ দোলাতে দোলাতে এক ভদ্রলোক তনুর কক্ষে উঁকি দিলেন। বয়েস খুব বেশী হবে না, ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের কোটায়।

চোখের দৃষ্টি অসম্ভব রকম ধারালো। চেকন করে কাটা একজোড়া শাণিত গোঁফ। ধারালো চিবুক। একহারা গড়নের চেহারাখানা ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে খোলা তলোয়ারের মতো ঝকঝক করছে, সন্ধ্যার এ আলো-আঁধারিতেও তা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই যে, এদিকে আসুন তো। তার সামনে এলে তিনি বেশ কড়াভাবে জিগগেস করলেন, কি, বেলের আওয়াজ শুনতে পাননি? আমি মৃদুস্বরে বললাম, পেয়েছি। পেয়েছেন তো হাসপাতালে বসে আছেন কেনো? আপনাদের ঘাড় ধরে বের করে না দিলে দেখছি শিক্ষা হবে না।

এই যে মাইতিদা, থামুন, থামুন। আমাদের দুজনের মাঝখানে তনু এসে দাঁড়িয়েছে। আপনার বাক্যবাণগুলো আপাতত তুলেটুলে রাখুন। আমি কতো বলে কয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য দানিয়েল ভাইকে কখন সেই বিকেল থেকে আটকে রেখেছি, এদিকে আপনি তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছেন।

ড. মাইতি স্মিত হেসে বললেন, এই তোমার দানিয়েল ভাই যিনি ফার্স্ট ছাড়া কিছুই হননি! মশায়, আপনার অসাধারণ কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের তো পাগল হবার উপক্রম। আমরা অধীর আগ্রহে দিন গুনছি, কখন এসে দর্শনটা দেবেন। শুনেছি মশায়ের কোলকাতা আগমনও ঘটেছে তনুর আগে। যাক যাক, ভাগ্যে ছিলো তাই দেখা হলো। তিনি আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করলেন। তারপর বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওয়ার্ডে একটা চক্কর দিয়ে আসি।

উৎপলা এখনও বাহির থেকে ফেরেনি। রুমে আমরা দুজন। এই ফাঁকে আমি জিগগেস করলাম, তনু তোমার শরীর কেমন? কেমন আছো? রোগের অবস্থা কি? তনু মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বললো, ওসব কথা থাক। আমার শরীর ভালো, আমি ভালো আছি। আমি বললাম, আগরতলা চলে আসার সময় তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা। তোমরা তো আমার সঙ্গে এলে না। কোলকাতা এসে খবর পেলাম তোমরাও আগরতলা এসে একটা ক্যাম্পে উঠেছো। কোলকাতায় নানাজনের কাছ থেকে নানাভাবে তোমার খবর পেয়েছি একজন বললো, তোমাকে তিন দিন পার্ক সার্কাসের কাছে রাস্তা পার হতে দেখেছে। আরেকজন বললো, তুমি সকাল বিকেল তিনটি করে টিউশনি করছো। নির্মল শেষ পর্যন্ত একদিন এসে জানালো, তোমাকে

হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। কোন হাসপাতাল, কি রোগ, অধিক কিছুই জানাতে পারেনি। তোমার ঠিকানা যোগাড় করতে গিয়ে প্রায় একটা খুনখারাবী করতে হচ্ছিলো। তোমার লোকেরা তো আর ঠিকানা দিতে চায় না।

তনু বললো, সে সব কথাও থাক। আপনার খবর বলুন, কোথায় আছেন? দুবেলা চলছে কেমন করে, বাড়ীঘরের খবর পেয়েছেন? আপনার মা বোন এবং ভায়ের ছেলেরা কেমন আছে?

আমার তো কোনো বলবার মতো খবর নেই। তনুকে জানাবো কি? কোলকাতা শহরে আমরা কচুরীপানার মতো ভেসে ভেসে কাটাচ্ছি—বিশেষ করে মুসলমান ছেলেরা। আমাদের সঙ্গে মা ভাই পরিবার কেউ আসেনি। সে কারণে শরণার্থী শিবিরে আমাদের ঠাঁই হয়নি। আমরাও শিবিরের মানুষের প্রাণান্তকর কষ্ট দেখে নিজেদেরকে আলাদা একটা শ্রেণী মনে করে শহরের দিকে ছিটকে পড়েছি। বরং যুদ্ধে চলে গেলে ভালো হতো। দেশোদ্ধার কতোটুকু করতে পারতাম জানি না, তবে বেঁচে থাকবার একটা উদ্দেশ্য অন্তত চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম।

আমার যুদ্ধে যাওয়া হয়নি। আমি যুদ্ধকে ভয় করি বলে নয়। আমাদের দেশের যে সকল মানুষের হাতে যুদ্ধের দায়দায়িত্ব, তারা আমাকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠাবার মতো যথেষ্ট নিরাপদ বিবেচনা করতে পারেনি। তিন তিনবার চেষ্টা করেছি। কোনোবারই এই মহাপুরুষদের দৃষ্টি ফাঁকি দেয়ার কাজে আমি কৃতকার্য হতে পারিনি। অবশ্য কর্তারা আমাকে মিষ্টিকথায় বুঝিয়েছেন যে আপনি যুদ্ধে যাবেন কেনো? আপনার মতো ক্রিয়েটিভ মানুষের কতো ইউজফুল কাজ করবার আছে। যান কোলকাতায় যান।

সেই থেকে কোলকাতায় আছি। হাঁটতে বসতে চলতে ফিরতে আমার ক্রমাগত মনে হয়, আমি শূন্যের ওপর ঝুলে রয়েছি। এসব কথা তনুকে জানিয়ে লাভ কি? কোন বাস্তব অবস্থার ভেতর দিয়ে তাকে এই হাসপাতাল অবধি আসতে হয়েছে তার সবটা না হলেও অনেকটা আমি জানি। তাকে খুশী করার জন্য বললাম, আমরা বারো চৌদ্দজন বাংলাদেশের ছেলে বৌবাজারের কাছে একটা হোস্টেলে খুব ভালোভাবে আছি। তুমি তো দাড়িঅলা নরেশদাকে চিনতে। এই হোস্টেলে তার তিনভাই আগে থেকে থাকতো। আমাদের অসুবিধে দেখে দুটো আস্তরুম আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। আমরা নিজেদের রান্না নিজেরা করি। আমি এখানকার একটা সাপ্তাহিক কাগজে কলাম লিখেছি। আরো দু'তিনটি কাগজের সঙ্গে লেখার কথা হয়েছে। নরেশদা একটা কলেজে কাজ পেতে যাচ্ছেন শিগগির। সব মিলিয়ে আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়াদের সংসার একরকম চলে যাচ্ছে। শুনেছি বাড়ীর সকলে বেঁচে আছে।

তনু আমার হাতে হাত রেখে বললো, আমি নিশ্চিত জানতাম দানিয়েল ভাই, আপনি একটা পথ করে নেবেন।

এরই মধ্যে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেলো। তনু অবলীলায় বলে দিলো, ওই যে মাইতিদা আসছেন সত্যি সত্যি ড. মাইতি এসে রুমে ঢুকলেন। তিনি

আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, দানিয়েল সাহেব আমি রসকষহীন মানুষ। রোগী ঠেঙ্গিয়ে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করি শুনেছি আপনি একজন জিনিয়স, আপনার সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করা যায়, তা ভেবে ঠিক করে একদিন জানাবো। আজ আমি ভয়ানক ব্যস্ত। আমাকে আজ ক্ষমা করতেই হবে। এখনই আমি উঠবো।

তনু বিছানা থেকে তড়াক করে নেমে ড. মাইতির ঝোলানো স্টেথেসকোপটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, মাইতিদা আপনাকে দু'মিনিট বসতে হবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, দানিয়েল ভাই, কালও কি আপনি হাসপাতালে আসবেন? আমি মাথা নাড়লাম। তাহলে আমার জন্য অল্প ক'টা ভাত আর সামান্য ছোট্ট মাছের তরকারী রান্না করে নিয়ে আসবেন। মরিচ দেবেন না তরকারীতে, কেবল জিরা আর হলুদ দেবেন। উ! কতোদিন ভাত খাইনি।

ছোট্ট মেয়েটির মতো আবদেরে গলায় বললো, মাইতিদা আগামীকাল আমাকে ভাত খেতে না দিলে আমি আপনাদের কথামতো ইঞ্জেকশন দিতে দেবো না, ক্যাপসুল খাবো না। হেন টেস্ট তেন টেস্ট কিছুই করতে দেবো না। ড. মাইতির হাত ধরে বললো, আপনি হাঁ বলুন মাইতিদা। ড. মাইতি বেশ শান্তগলায় বললেন, বেশ তো দানিয়েল সাহেব, কালকে ভাতমাছ রান্না করে নিয়ে আসুন। বললাম, আমি ভাবছি পুরুষ মানুষের অনভ্যস্ত হাতের রান্না তোমার মুখে রুচবে কিনা। তনু বললো, রুচবে, খুবই রুচবে। দানিয়েল ভাই, ট্যাংড়া মাছ পান কিনা দেখবেন। ড. মাইতি ঘড়ি দেখলেন। এবার আমি উঠবো। দানিয়েল সাহেব আপনাকেও উঠতে হবে। স্কলার মানুষ বলে আপনাকে অনেক কনসেশন দেয়া হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এরকমটি আর ঘটবে না।

তনুর রুম থেকে বেরিয়ে এসে পেছন দিয়ে একবার হাসপাতাল বিল্ডিংটার দিকে তাকালাম। গোটা বাড়ীটা যেনো নিস্তব্ধতার প্রতিমূর্তি। মৃত্যু এবং জীবনের অনায়াস সহাবস্থান বাড়ীটার অবয়বে একপোঁচ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য মাখিয়ে দিয়েছে। হাসপাতাল কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডের পথ ধরলাম। এসপ্ল্যানেড থেকে আমাকে পনেরো নম্বর ট্রাম ধরে বৌবাজারে নামতে হবে। উল্টাপাল্টা কতো রকমের চিন্তা মনের মধ্যে ঢেউ তুলছিলো।

তনুর অসুখটা কি খুব সিরিয়স? তার মা কি দিনাজপুর থেকে কোলকাতা আসতে পেরেছে? হেলেন শেষ পর্যন্ত এমন দুর্ঘটনাটা ঘটালো? জাহিদ নামের যে মানুষটি হেলেনের সঙ্গে...। এ কাণ্ডের পরেও হুলো বেড়ালের মতো গোঁফজোড়া বাগিয়ে কি এখনো তনুর সঙ্গে দেখা করতে আসে সে?

একটি পনেরো নম্বরের ট্রামকে দাঁড়াতে দেখে তাড়াতাড়ি দৌড়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় পিঠের ওপর কার করস্পর্শ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি ড. মাইতি। তিনি বললেন, দানিয়েল সাহেব একটা কথা বলতে এলাম, মাছ রান্না করার সময় একটুও লবণ দেবেন না। আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন, গেন্ডারিয়ার বাসাতেও তনু কখনো লবণ খেতো না। তিনি জানতে চাইলেন, আপনি

কতোদিন থেকে তনুকে চেনেন? আমি বললাম, তা বছর চারেক তো হবেই তিনি আমাকে জেরা করার ভঙ্গীতে বললেন, তার কি রোগ আপনি জানেন?

মাঝে মাঝে দেখতাম নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। কিছুদিনের জন্য হাসপাতাল যেতো আবার ভালো হয়ে ফিরে আসতো। শুধু এটুকু জানি, সে লবণ খেতো না, আর চাটা ঠাণ্ডা করে খেতো। তিনি বললেন, এর বেশী আপনি কিছু জানেন না? বললাম, বা রে, জানবো কি করে, মহিলাদের রোগের কি কোনো সীমাসংখ্যা আছে? তাছাড়া তনু আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি, তার অসুখটা সত্যি সত্যি কি। তিনি বললেন, উচিত কাজ করেছে, এসব আপনার পোষাবে না। আপনি ভাবুক মানুষ। শুনুন ভাত তরকারী আনার সময় একেবারে লুকিয়ে আনবেন। ড. ভট্টাচার্যি জানতে পেলে তনুকে হাসপাতালে থাকতে দেবেন না। এটুকু মনে থাকে যেনো। তারপর নিজে বিড়বিড় করে বললেন, মেয়েটা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে, যা খেতে চায় খেয়ে নিক।

ড. মাইতি একটা চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমার বুকটা ভয়ে আশঙ্কায় গুড়গুড় করে উঠলো। ড. মাইতি বললেন, আপনার ট্রাম, আমি চলি।

দুই

বৌবাজারের স্টপেজে ট্রাম থামতেই লোডশেডিং শুরু হয়ে গেলো। এটা কোলকাতার নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে আমাদের ঠিক গা সওয়া হয়ে ওঠেনি। অনেক কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দেখি দারোয়ান পাঁড়েজী কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে কম্বলের ওপর দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। বিরাট উদরটা আস্ত একখানা ছোট্ট টিলার মতো নিঃশ্বাসের সাথে ওঠানামা করছে। নাক দিয়ে মেঘ ডাকার মতো শব্দ নির্গত হচ্ছে।

সকালবেলা বেরুবার সময় পাঁড়েজীকে টিকিতে একটা টকটকে লাল জবাফুল গুঁজে কপালে চন্দন মেখে সুর করে হিন্দীতে তুলসিদাসী রামায়ণ পড়তে দেখেছি। তার ভুঁড়িটা যে এতো প্রকাণ্ড হতে পারে, তখন কল্পনাও করতে পারিনি। সিঁড়িতে আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ধড়মড় করে পাঁড়েজী ঘুম থেকে জেগে উঠে হাঁক দিলো, কৌন? আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালে, চোখ রগড়াতে রগড়াতে একটুখানি হেসে বললো, আমি ভাবলাম কৌন না কৌন আদমী, আপনি তো জয়বাংলার বাবু আছেন, যাইয়ে।

দোতলায় পা দিতেই আমরা যে রুমে থাকি, সেদিক থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেলো। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, এ লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনে বচসা, ঝগড়া এসবই আমরা নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমার শরীরটা ভয়ানক ক্লান্ত। মনটা ততোধিক। ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকবো। কিছুক্ষণ একা একা থাকা আমার বড়ো প্রয়োজন। বাইরে পার্কে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে আসবো কিনা মনে মনে

ভাবাগোনা করছি, এমন সময়ে আলো জ্বলে উঠলো একবার গেলে এতো কম সময়ের মধ্যে ফিরে আসে সেটা একরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার বাইরে না গিয়ে রুমের দিকে পা বাড়ালাম

গিয়ে দেখি মেঝের ওপর পাতা আমাদের ঢালাও বিছানার ওপর নরেশদা গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর বিপরীত দিকে দুজন অচেনা তরুণ। দুজনেরই মাথার চুল লম্বা হয়ে ঘাড়ের উপর নেমে এসেছে। মুখে দাড়িগোঁপের জঙ্গল। মোটা কাপড়ের জামা একজনের হাতা কনুই অবধি গুটানো। জামার রং বাদামী ধরনের, তবে ঠিক বাদামী নয়। বুঝলাম এরা কোনো ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসে থাকবে।

হাতাগুটানো তরুণের গায়ের রং এক সময়ে হয়তো উজ্জ্বল ফর্সা ছিলো, এখন তামাটে হয়ে গেছে আরেকজনের একেবারে কুচকুচে কালো। নরেশদা বললেন, এসো দানিয়েল, পরিচয় করিয়ে দেই। ফর্সা তরুণটির দিকে আঙ্গুলি বাড়িয়ে বললেন, ও হচ্ছে আমার ছাত্র। নাম আজহার। আর ও হচ্ছে তার বন্ধু হিরন্ময়। দুজনেই জলাঙ্গী ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসেছে। আজ সাড়ে বারোটার ট্রেনে ট্রেনিং নেয়ার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে এরাও দেরাদুন যাচ্ছে।

নরেশদা জিগগেস করলেন, আজহার, তোমরা কিছু খেয়েছো? হাঁ স্যার, খেয়ে নিয়েই তো আপনার কাছে এলাম। আগে আমরা ফিরে আসি তখন দেখবেন স্যার, এই থিয়েটার রোড, আর প্রিন্সেপ স্ট্রীটের হারামজাদাদের কি কঠিন শিক্ষাটা না দেই। খাচ্ছেদাচ্ছে, ফূর্তি করছে, চেহারার চেকনাই বাড়াচ্ছে। আর ওদিকে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোর অবস্থা যদি দেখেন স্যার, কি বলবো! হাজার তরুণ খোলা আকাশের নীচে ঘুমোতে বাধ্য হচ্ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে, রোদে পুড়ছে। কারো যদি অসুখ বিসুখ হয়, কি করুণ অবস্থা দাঁড়ায়, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না, স্যার।

আমরা কোলকাতা এসেছি চারদিন হলো। এই সময়ের মধ্যে বলতে গেলে অনেক কিছুই দেখে ফেলেছি। একদল লোক এখানে ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে জামাই আদরে দিন কাটাচ্ছে। তাদের খাওয়া দাওয়া, ফূর্তি করা কোনো কিছুর অভাব নেই। আরেক দল বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক থেকে রিজার্ভড গোল্ড লুট করে নিয়ে এসেছে, বিহারীদের পুঁজিপাট্টা হাতিয়ে নিয়ে এই কোলকাতা শহরে উঠে এসেছে।

স্যার, আপনি কোলকাতার সবগুলো বার, নাইট ক্লাবে খোঁজ করে দেখুন। দেখতে পাবেন, ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশের মানুষ দুহাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। এদের সঙ্গে থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের কোনো যোগাযোগ নেই—একথা কি আপনি বলতে পারেন? স্যার, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটা সিগারেট খাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তোমাকে আমারই অফার করা উচিত ছিলো। কিন্তু...

আজহার একটা সিগারেট ধরালো। এই ফাঁকে হিরন্ময় মুখ খুললো। স্যার, আমি একটা গল্প শুনেছি। গল্পটা অতো ভালো নয়, আপনি যদি বেয়াদবী না ধরেন

বলতে পারি। বেয়াদবী ধরার কি আছে? বলে যাও—এই যুদ্ধ সমস্ত মান অপমানের বোধ, সমস্ত ন্যায় অন্যায়, সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যে সমস্ত লোককে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম, কোলকাতায় এসে তাদের আচার আচরণ দেখে যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তাই হয়ে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে এখনো স্যার ডাকছো, তার বদলে শালা বললেও অবাক হবার কিছু ছিলো না অতএব বিনা দ্বিধায় বলে যাও তোমার গল্প।

ঠিক গল্প নয় স্যার, কোলকাতার অনেকগুলো সাপ্তাহিক কাগজে ঘটনাটা ছাপা হয়েছে। এখানে ওখানে নানা জায়গায় লোককে বলাবলি করতেও শুনেছি। বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী সোনাগাছিতে গিয়ে লালবাজার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। চেনেন তো স্যার, সোনাগাছি কি জন্য বিখ্যাত?

নরেশদা দাড়িতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বললো, আর কিছু বলতে না পারলেও এই নিরীহ মাস্টার সোনাগাছি কি জন্য বিখ্যাত তা বলতে পারে। কেননা কোলকাতা আসার ঢের ঢের আগে তাকে প্রেমেন মিত্তিরের অনেকগুলো ছোট গল্প পড়তে হয়েছে। তা তোমার গল্পটা বলো।

হিরন্ময়ও একটা সিগারেট জ্বালালো, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, লালবাজারের পুলিশ অফিসারের জেরার মুখে ভদ্রলোককে স্বীকার করতেই হলো যে তিনি ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী। পুলিশ অফিসার তখন বললেন, তাহলে স্যারের গুড নেমটা বলতে হয়। মন্ত্রী নিজের নামটা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে ভেরিফাই করে নিলেন। মন্ত্রী মহোদয়ের স্টেটমেন্ট সঠিক। পুলিশ অফিসারটি দাঁতে জিভ কেটে বললেন, স্যার কেনো মিছেমিছি সোনাগাছির মতো খারাপ জায়গায় গিয়ে নাহক ঝুটঝামেলার মধ্যে পড়বেন, আর ভারত সরকারের আতিথেয়তার নিন্দে করবেন? আগেভাগে আমাদের একটু স্মরণ করলে পারতেন। আমরা ভিআইপির উপযুক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিতাম। ঠিক আছে স্যার, এখখুনি আপনাকে বালিগঞ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

নরেশদা বললেন, চারদিকে কতো কিছু ঘটছে নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি। ওসব শোনারও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। এই তোমরা আসার একটু আগে আমি বনগাঁ থেকে ফিরলাম। বাংলাদেশের মানুষ কি অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে নিজের চোখেই তো দেখে এলাম। ওপরের দিকে কিছু মানুষ কি করছে না করছে সেটা আমার কাছে এখন কোনো বিষয়ই নয়। শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানুষের কি অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট! এই বিজলীর আলোজ্বলা কোলকাতা শহরে বসে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতিদিন বিশ পঁচিশজন করে মারা যাচ্ছে। বেশীর ভাগ মরছে শিশু এবং বৃদ্ধ। সরকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বনগাঁ থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনে তুমি বাংলাদেশের লোকদের দেখা পাবে। খোলা আসমানের তলায় কি চমৎকার সংসারই না পেতেছে তারা। পুরুষেরা সব বসে আছে নির্বিকার। তাদের চোখের দৃষ্টি মরে গেছে। চিন্তা করবার, ভাবনা করবার,

স্বপ্ন দেখবার কিছু নেই। সকলেরই একমাত্র চিন্তা আজকের দিনটি কেমন করে কাটে। তাও কি সকলের কাটে?

মরণ যখন কাউকে করুণা করে, তার পরিবারের লোক ছাড়া, অন্য কারো মনে সামান্য রেখাপাত পর্যন্ত করে না। মৃতদেহ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে তেমনি পড়ে থাকে অথচ দেখবে পাশে আরেকটি পরিবার এলুমিনিয়মের থালায় মরিচ দিয়ে বাসী ভাত খাচ্ছে। এমন অনুভূতিহীন মানুষের কথা আগে তুমি কখনো কল্পনা করতে পেরেছো?

মেয়েগুলোকে দেখো। সকলের পরনে এক একখানি তেনা। মাথার চুলে জট বেঁধেছে। পুষ্টির অভাবে সারা শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এদের অনেকে জীবনে কোনদিন রেলগাড়ী দেখেছে কিনা সন্দেহ। এখান সাধ মিটিয়ে রেলগাড়ীর চলাচলের পথের ধারে তাদের অচল জীবন কাটাচ্ছে।

আজহার জিগগেস করলো, স্যার, বনগাঁ কেনো গিয়েছিলেন? নরেশদা জবাবে বললেন, আমার বুড়ো মা এবং বাবা কয়েকজন আত্মীয়স্বজনসহ আজকে বনগাঁ শরণার্থী শিবিরে এসে পৌঁছানোর কথা। গিয়েছিলাম একটু খোঁজখবর করতে, পৌঁছেছেন কিনা। বনগাঁর আশেপাশে যে ক'টা শরণার্থী শিবির আছে, সবগুলোতে তালাশ করলাম। পরিচিত আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু মা-বাবার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। হয়তো এসে পড়বেন দুয়েক দিনের মধ্যে। না হলে ।

নরেশদা চুপ করে গেলেন। কথাটার অশুভ ইঙ্গিত সকলকেই স্পর্শ করলো। তার অর্থ এই যে, পথে যদি পাকিস্তানী সৈন্য তাদের চলার গতি চিরতরে থামিয়ে দেয়, তা হলেও তার করার কিছু থাকবে না।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। হাতের আধপোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো আজহার। আপনার এই মানসিক অবস্থায় বিরক্ত করার জন্য আমি ভয়ানক লজ্জিত। আসলে প্রথমেই আমার আপনার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের খবর নেয়া উচিত ছিলো। আমরা মুসলমান ছেলেদের বেশীর ভাগই একা একা এসেছি কিনা, তাই পরিবারের কথাটা মনে আসেই না। সেজন্য এমনটি ঘটেছে। আমি আশা করছি, অবশ্যই তারা দু'চারদিনের মধ্যে এসে পড়বেন। আপনি চিন্তাভাবনা করবেন না স্যার। আমি দেরাদুনে পৌঁছে আপনাকে চিঠি লিখবো। আপনি আমাকে অবশ্য অবশ্যই জানাবেন, তারা পৌঁছুলেন কিনা।

আজহার ঘড়ি দেখে প্রায় একরকম লাফিয়ে উঠলো। স্যার, আমাদের উঠতে হয়। মেজর হরদয়াল সিংহের কাছে হাজিরা দিতে হবে। অনেকগুলো ফর্মালিটি পালন করতে হবে। তারপর কাঁটায় কাঁটায় বারোটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে রিপোর্ট করতে হবে। আজহার এবং হিরন্ময় উঠে দাঁড়ালো। তাদের পিছু পিছু আমি এবং নরেশদা বিদেয় জানাতে নীচতলার গেট পর্যন্ত এলাম। আজহার নত হয়ে নরেশদার পা ছুঁয়ে সালাম করে হু হু করে কেঁদে ফেললো। নরেশদা মমতা মেশানো গলায় বললো, ও কি আজহার, বাবা, কাঁদো কেনো? ছি ছি! এবার

আজহার কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বললো, স্যার, আমার দু'ভাই পাকিস্তানের মারীতে আটকা পড়ে আছে। এক বোন এবং ভগ্নিপতি লাহোরে। এতোদিন মনেই পড়েনি। আপনার মা-বাবার কথা শুনে তাদের কথা মনে পড়ে গেলো। জানি না, আর কোনোদিন দেখা হবে কিনা। রাস্তার ফুটপাথ ধরে দুজনে হনহন করে চলে গেলো। আমরা দুজনে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলাম। আমাদের সকলেরই এক একটা করুণ কাহিনী রয়েছে।

নরেশদা বললেন, দানিয়েল, তুমি খেয়েছো? আমি মাথা নাড়লাম। চল, ওপরে উঠে কাজ নেই, একেবারে খেয়েই আসি আমি বললাম, চলুন। তিনি জিগগেস করলেন, কোথায় যাবে? আমার অতো বেশী খাওয়ার ইচ্ছে নেই। যেখানেই হোক, চলুন। নরেশদা বললেন, চারদিকে এতো বেদনা, এতো দুঃখ, চলো আজ মাছভাত খাই। মাদ্রাজী দোসা খেতে খেতে পেটের তলা জাম ধরে গেলো। জীবনে কোনোদিন নেশা করিনি। আজ আমার একটুখানি নেশা করতে ইচ্ছে করছে।

নরেশদা এমনিতে বেশ হাসিখুশী ভোজনবিলাসী মানুষ। কিন্তু পয়সার অভাবে আমাদের সঙ্গে তাকেও প্রায়ই দুবেলা মাদ্রাজী দোকানে দোসা খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। বাঙালী দোকানে সামান্য পরিমাণ মাছ, ডাল এবং ভাত খেতে কম করে হলেও চার টাকা লেগে যায়। সেখানে মাদ্রাজী দোকানে এক দেড় টাকার মধ্যে আহারপর্ব একরকম সমাধা করা যায়।

ভীমনাগের মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে আমরা রাস্তা পার হলাম। আশুতোষ মুখার্জীর ছবিটাতে কড়া আলো পড়েছে। আশুতোষ মুখার্জী ভীমনাগের মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচার করার জন্যই ভীমনাগ স্যার আশুতোষের পোর্ট্রেটটা ঝুলিয়েছে। কিন্তু আমার চোখে তার অন্যরকম একটা অর্থ ধরা পড়লো। ভীমনাগের দোকানে স্যার আশুতোষের পোর্ট্রেট দেখে এ ধারণা হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক যে ভীমনাগের মিষ্টির গুণেই স্যার আশুতোষ এতো বৃহদায়তন ভুঁড়ির অধিকারী হতে পেরেছেন। অতএব যারা ভুঁড়ির আয়তন বড়ো করতে চান, পত্রপাঠ ভীমনাগের দোকানে চলে আসুন।

আমরা দুজন সামান্য একটু ডাইনে হেঁটে বঙ্গলক্ষ্মী হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলে খদ্দেরের ভীড় একেবারে হালকা হয়ে এসেছে। আমরা একটা টেবিলের দুপাশে বসলাম। নরেশদা বললেন, চল আজ মাংস খাওয়া যাক। আমি জিগগেস করলাম, পয়সা আছে? তিনি টেবিলের ওপর টোকা দিয়ে বললেন, হাঁ, আজ কিছু পয়সা পাওয়া গেছে।

এটা তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলেন নাকি? রাস্তায় কি আর টাকাপয়সা কুড়িয়ে পাওয়া যায়? মাদারীপুরের এক ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে শ'তিনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। আজকে বনগাঁ স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা। অবশ্য তিনি জীপে চড়ে রিফিউজী ক্যাম্পে দর্শন দিতে গিয়েছিলেন, সরকারের তরফ থেকে। তার হাতে এখন অনেক ক্ষমতা, অনেক টাকা। মাদারীপুরের

ব্যাংকলুটের টাকাও নাকি তার হাত দিয়ে বিলিবণ্টন হয়েছে সুতরাং ভাবলাম এই সময়ে পাওয়া টাকাটা দাবী না করাই হবে বোকামো।

আমি তার জীপের সামনে দাঁড়াতেই তিনি ঘটা করে জীপ থেকে নেমে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কতো কি জিগগেস করলেন, কিন্তু আমি আসল উদ্দেশ্যটা ভুলে যাইনি আমাদের দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে শুনেই তিনি পকেট থেকে একটি নোটের তোড়া অন্য কেউ দেখতে না পায় এমনভাবে বের করে সেখান থেকে পাঁচশো টাকার একখানি নোট আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি তো বিপদে পড়ে গেলাম। খুচরো কোথায় পাই? তাই পুনরায় তার শরণাপন্ন হয়ে বললাম, আপনি বরং তিনশো টাকাই দিন। আমার তো খুচরো করার কোনো উপায় নেই। তিনি বললেন, রাখুন প্রফেসরবাবু, আপনার খুচরো, সে পরে দেখা যাবে। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে অন্যান্যদেরসহ বারাসত রিফিউজী ক্যাম্পে ভিজিট করতে চলে গেলেন। বেয়ারা এলে তিনি পাঁঠার মাংস, ভাত ডাল দিতে বলে দিলেন।

ভাত খেতে খেতে আমি জিগগেস করলাম, মা-বাবার কোনো খবর পেলেন? খবর তো পাচ্ছি রোজ, পথে আছেন, পথে আছেন, কিন্তু কোন পথে সেটা তো ভেবে স্থির করতে পারছিনে। আজই তো এসে যাওয়ার কথা ছিলো। সারাদিন অপেক্ষা করলাম, কিন্তু অপেক্ষাই সার। বুড়ো মানুষ... হঠাৎ করে নরেশদার হিক্কা উঠলো। প্রাণপণ সংযমে হিক্কার বেগটা দমন করে নরেশদা আবার খেতে লেগে গেলেন। আমি ফের জানতে চাইলাম, কল্যাণীরও কোনো খবর পাওয়া গেলো না? হাঁ, তার একটা খবর আছে বটে। তবে সত্যমিথ্যে বলতে পারবো না। সে নাকি কিভাবে পশ্চিম দিনাজপুরে তার এক আত্মীয়বাড়ীতে এসে উঠেছে। ঠিকানা পেয়েছেন? নরেশদা বললেন, হাঁ। আমি বললাম, দুয়েক দিনের মধ্যে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসুন। অথবা ক্ষীতিশকে পাঠিয়ে দিন। নরেশদা আমাকে ধমক মারলেন, আরে, রাখো তোমার পশ্চিম দিনাজপুর। যাওয়া আসার খরচ কতো জানো?

এই কল্যাণীর সঙ্গে নরেশদার বিয়ে স্থির হয়েছিলো এপ্রিলের একুশ তারিখ। এরই মধ্যে পঁচিশে মার্চের রাতে তো পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণই করে বসলো। খরচ যতোই হোক ম্যানেজ করা যাবে, আপনি ঘুরে আসুন। সেকথা এখন রাখো। তোমার খবর বলো, কোথায় কি করলে? সকাল থেকে কোথায় কোথায় গেলে? গোটা দিনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে একরকম ভুলেই ছিলাম। নরেশদার কথায় সমস্ত দিনের ঘটনারাজি একটার পর একটা বায়স্কোপের ছবির মতো প্রাণবান হয়ে উঠলো। আমি বললাম, সকাল দশটার দিকে তো গেলাম লেনিন সরণীতে। তিনি জানতে চাইলেন, লেনিন সরণীতে কেনো? আমি বললাম, জাহিদুল হকের কাছে তনুর ঠিকানা চাইতে। জাহিদুল হক তোমাকে তনুর ঠিকানা দিলো?—তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন। দিতে কি চায়, শেষ পর্যন্ত দিতে বাধ্য করা হলো। কি করে, তিনি জানতে চাইলেন।

জবাবে বললাম, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখি একেবারে সিঁড়ির গোড়ার রুমটিতে বিছানো ফরাশের ওপর জাহিদুল হক মটকার পাঞ্জাবী পরে বসে আছে।

হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা ইত্যাদি এক পাশে। একটা রিহার্সাল জাতীয় কিছু হয়ে গেছে অথবা হবে জাহিদুল হকের সঙ্গে আরো চার পাঁচজন মানুষ। একজন বাংলাদেশের, বাকীরা স্থানীয় আপনি তো জানেন জাহিদুল হক ন্যাকা ন্যাকা ভাষায় চমৎকার গল্প বলতে জানে। সেরকম একটা কিছু বোধ হয় করছিলো। পেছনে আরো তিনটি মহিলার মধ্যে হেলেনকে দেখলাম মুখখানি বড়ো ম্লান। দাঁতে নখ খুঁটছে। কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে সেটি বোধ হয় উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে। জানেন তো হেলেনটা বরাবর বোকা এবং পরনির্ভরশীল। নিশ্চয়ই জাহিদুলের মধ্যে একটা নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছে। জাহিদুল হক সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে মেয়েটাকে একেবারে নিকে করে ফেলেছে।

জানেন তো জাহিদুলের প্রেয়সীর সংবাদ? শশীভূষণ তার মেয়েটির ট্যুইশনি করতো না? আমিই তো ঠিক করে দিয়েছিলাম। জাহিদুলকে একটা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে শশীকে বগলদাবা করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শিল্পতীর্থ এবং প্রেমপ্রীতির আধুনিক বৃন্দাবন শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিয়েছে। তুমি কোন শশীর কথা বলছো, আমাদের জগন্নাথ হলের ছোট্ট সুন্দর ছেলেটি নয়তো? সে তো অত্যন্ত সুশীল ছেলে, ও কেনো যাবে রাশেদা খাতুনের সঙ্গে? রাশেদা খাতুনেরও তো সুনাম শুনেছি। উনি কেনো এ জাতীয় অপকর্ম করতে যাবেন?

নরেশদার মাথাটা আস্তে আস্তে কাজ করে। তাই বিরক্ত না হয়েই বললাম, 'যুদ্ধস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন ধনমান'। আমি আর আপনি করলে যা হয়ে ওঠে অপকর্ম, মহাপুরুষেরা করলেই সেসব লীলা হয়ে দাঁড়ায়। নরেশদা বললেন, ওসব কথা রাখো, তোমার খবর বলো। আমি বিনীতভাবে জানালাম, সবটা না শুনলে আমার খবরটা যে জানানো হয় না। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, যাও বলে যাও।

রাশেদা খাতুন যখন শশীকে ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর পুরে বিশ্বকবির প্রেম পারাবারের দিকে যাত্রা করলেন, জাহিদুল ভেবে দেখল, সে যদি একটা কিছু করে না বসে, লোকে তাকে মরদ বলবে না। তাই কালবিলম্ব না করে হেলেনকে নিকে করে বসলো। তাতে তার কোনোই বেগ পেতে হয়নি। সে তো ওদেরই অভিভাবক ছিলো—'আপনা উদ্যান ফল, তাতে কিবা বলাবল'। স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত সংগ্রামে হেলেনকে বলি হতে হয়েছে। সবচেয়ে সর্বনাশ হয়েছে তনুর। সে ছোটো বোনটাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতো আর জাহিদুল হককে বাবার চাইতে অধিক বিশ্বেস করতো। তনুর সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মানসিক আশ্রয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। আমি তো মনে করি, ওটাই তার অসুখ গুরুতর হয়ে ওঠার মুখ্য কারণ। নরেশদা কিছুক্ষণের জন্য মুখের ভেতর পুরে দেয়া গ্রাসটা চিবুতে পারলেন না। দু'মিনিটের মতো ঝিম মেরে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার ঠিকানা সংগ্রহের বৃত্তান্তটা বলো

আমি শুরু করলাম। জাহিদুল এবং হেলেন আমাকে দেখে একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো জানেন নরেশদা, জাহিদুল হককে এখন বেশ স্লিম

দেখায় তার ভুঁড়িটা কোথায় আত্মগোপন করেছে, গোঁফজোড়া এমনভাবে ছেটেছে যে কাছে থেকে না দেখলে পাকনা অংশ চোখেই পড়ে না।

তুমি আবার আজে বাজে কথা বলছো, কি ঘটেছে সেটাই বলো, নরেশদা আমাকে সতর্ক করে দিলেন। আমি বলতে থাকলাম।

জাহিদুল হককে বললাম, আপনি একটু বাইরে আসবেন? উঠে এলে আমি তাকে সিঁড়ির গোড়ায় ডেকে নিয়ে বললাম, আপনার কাছ থেকে আমি তনু কোথায় আছে, সে ঠিকানাটি সংগ্রহ করতে এসেছি। তিনি বেশ ঝাঁঝে এবং উষ্মার সঙ্গে জবাব দিলেন, আমি কি সবাইকে দেয়ার জন্য পকেটে ঠিকানা বয়ে বেড়াই নাকি? আমি তাঁর চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলাম, আপনার কাছে আমি তনুর ঠিকানা নিতে এসেছি এবং আপনি জানেন তার ঠিকানা। ভালোয় ভালোয় যদি না দিন চীৎকার করবো, চেঁচামেচি করবো। একেবারে বিফল হলে আপনাকে ছুরি মারবো। আমি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে লম্বা চ্যাপ্টা জিনিসটির অস্তিত্ব তাকে বুঝিয়ে দিলাম। তিনি ধমকের মতো সুরে বললেন, এখানে এক মিনিট দাঁড়াও।

আমি তো ভয়ে অস্থির। এই বুঝি পুলিশের কাছে টেলিফোন করে বলবেন, পাকিস্তানী গুপ্তচর পকেটে ছুরি নিয়ে বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা শিল্পীকে হত্যা করতে এসেছে। তিনি কিছুই করলেন না। সিঁড়ি থেকে একটা পরিত্যক্ত সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে ভেতরের কাগজটা বের করে নিলেন এবং সেটা দেয়ালে ঠেকিয়ে তনুর হাসপাতালের নাম, এবং ওয়ার্ড এবং বেড নম্বর লিখে আমার হাতে দিলেন। আমাদের দুজনের খাওয়া শেষ হয়েছে। নরেশদা হাত ধুয়ে বিল মিটিয়ে দিলেন।

আমরা যখন নীচে নামলাম, তখন বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কোলকাতা শহরের যন্ত্রযানের চলাচল একেবারে কমে এসেছে। তথাপি একথা বলা চলে না যে কোলকাতা শহর বিশ্রাম নিচ্ছে। নোংরা গেঁয়ো রাস্তা, মান্ধাতার আমলের পাতা ট্রামলাইন, উন্মুক্ত ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষজনের গাদাগাদি, ঠেসাঠেসি ভীড় দেখলে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে এই নগরী রাতের বেলায় বিশ্রাম নেয় না, বিশ্রাম নিতে জানে না, শুধু যন্ত্রণায় কঁকায়। আচমকা ছুটে চলা নৈশ ট্যাক্সীগুলোর আওয়াজ শুনলে একথাই মনে হয়।

ডানদিকের উঁচু বিল্ডিংটির ফাঁকে একখানি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশে জমা পানিতে সে চাঁদের ছায়াটিই দেখা যাচ্ছে। আহা তাহলে কোলকাতা শহরেও চাঁদ ওঠে। নরেশদা একটা পানের দোকান থেকে পান এবং সিগারেট কিনলেন। পকেটে পয়সা থাকলে যা কিছু ভালো এবং সুস্বাদু কিনতে তার জুড়ি নেই। আমার হাতে একটা তবক দেয়া পানের খিলি তুলে দিয়ে বললেন, নাও, খাও। তারপর আপন মনে ওমর খৈয়াম আবৃত্তি করতে লাগলেন—'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শূন্য থাক।'

আমরা যখন হোস্টেলের গেটে এসে হাজির হলাম, দারোয়ান গেট বন্ধ করবার উপক্রম করছে। সেই আগের দারোয়ানটিই বললো, বাবুজী, আওর একটু দেরী করলে তো অসুবিধে হোয়ে যেতো আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওপরে এলাম

আজ হোস্টেলটা একেবারে ফাঁকা। আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের যে ছেলেরা থাকে, তারা বারাসত রিফিউজী ক্যাম্পে নাটক করতে গেছে। নরেশদার ভাই দুজনও বাংলাদেশের ছেলেদের সঙ্গে গেছে। ইচ্ছে করলে আমরা দুজন দু'রুমে কাটাতে পারি আজ রাত। প্রতিদিন যে প্রাইভেসির অভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি, আজ সেই প্রাইভেসিই বড়ো রকমের একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। আমি আর নরেশদা দুজন দুজনকে এতো ভালোভাবে চিনি যে হাঁ করলে একে অপরের আলাজিভ পর্যন্ত দেখে ফেলি।

নরেশদা বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ে পুরোনা কথার খেই ধরে জিগগেস করলেন, তনুকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তা তুমি দেখতে গিয়েছিলে? আমি বললাম, তাকে ভর্তি করানো হয়েছে পিজি হাসপাতালে। গিয়েছিলাম, দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। দেখে তো ভালোই মনে হলো। কিন্তু তার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে মনে হলো অসুখটা খুবই সিরিয়াস। আমার তো ভয় ঢুকে গেছে।

নরেশদা বললেন, ডাক্তার কি রোগ বললেন? আমি বললাম, উল্টো ডাক্তারই আমাকে জিগগেস করলেন, তনুর কি রোগ হয়েছে আমি জানি নাকি। আমি জবাব দিয়েছি, আমি কেমন করে জানবো, তনু কি কখনো আমাকে তার রোগের কথা বলেছে?

আমি তো কারণ খুঁজে পাইনে, কেনো ডাক্তার তোমার কাছে তনুর রোগের বিষয়ে জানতে চাইবে? এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। আমি বললাম, রহস্য টহস্য কিছু নেই। তাহলে গোটা ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি।

তনু আমাকে বলেছে আগামীকাল যদি আমি তাকে দেখতে হাসপাতালে যাই, তাহলে যেনো তার জন্য কিছু ভাত এবং ছোট মাছ মরিচ না দিয়ে শুধু জিরা আর হলুদ সহকারে রান্না করে নিয়ে যাই। তাকে নাকি একমাস থেকে ভাত খেতে দেয়া হয়নি। আমি ভাত রেঁধে দিলে সেটা সে খাবে, এ ব্যাপারে ড. মাইতির কাছে আবদার ধরেছিলো। ড. মাইতি রাজী হয়েছেন। কিন্তু আমাকে ট্রাম স্টপেজের গোড়ায় এসে বলে দিয়েছেন, ভাত তরকারী রান্না করে আমি যেনো খুব লুকিয়ে চুকিয়ে কেউ টের না পায় মতো করে নিয়ে যাই। ড. ভট্টাচার্য জানতে পেলে তাকে একদিনও হাসপাতালে থাকতে দেবেন না।

পরে অবশ্য তাকে আপন মনে স্বগতোক্তি করতে শুনেছি, মেয়েটা তো শেষই হয়ে যাচ্ছে, যা খেতে চায় খেয়ে নিক না। তারপর তিনি কথায় কথায় আমাকে জিগগেস করেছিলেন, তনুর কি রোগ, আমি জানি নাকি। কিন্তু নরেশদা, ড. মাইতির শেষের কথাটি শুনে আমার ভয়ানক ভয় ধরে গেছে। তনুর যদি কিছু হয়, সে যদি আর না বাঁচে!

নরেশদা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ধমক দিলেন, কি সব আবোল-তাবোল বকছো! বাঁচবে না কেনো, চুপ করো। মরণ কি খেলা নাকি! পাকিস্তানী সৈন্যদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এতোদূর যখন আসতে পেরেছে, দেখবে ভালো হয়ে উঠবে। না হয় একটু সময় নেবে। এই যে, ভাত আর মাছ রান্নার ব্যাপারটি নিয়ে কিছু ভেবেছো কি? না এখনো ভেবে কিছু ঠিক করতে পারিনি। আপনি বনগাঁ থেকে ফেরার পরই তো আমি এলাম। সারাক্ষণ হাসপাতালেই ছিলাম। পথে কোথাও যাইনি সত্যিই তো, রান্না করাটাও দেখছি একটা অসম্ভব ব্যাপার। আচ্ছা নরেশদা, একটা কাজ করলে হয় না? আমার বান্ধবী নিরুপমা আছে না? গোল পার্কের কাছে যার বাসা। সে বাসায় তো আপনিও গিয়েছেন। তাকে গিয়ে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বললে হয় না, ভাবছি কাল সকালে তার বাসায় যাব। নরেশদা বললেন, সকালে তো তিনি স্কুলে যান। দেখা করবে কেমন করে? আর যদি স্কুল থেকে কোনো বান্ধবীর বাসায় চলে যায় এবং বাড়ী ফেরে একেবারে সন্ধ্যেবেলায়, তখন কি করবে? একেবারে ফাঁকার ওপর লাফ দেয়া যায় নাকি?

সত্যিই তো এরকম ঘটতে পারে। আমি মাথা চুলকে বললাম, আমার মাথায় এবার সত্যি সত্যি ভালো একটা আইডিয়া এসেছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে কাকাবাবু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছে যাবো। তিনি তো আমাকে খুবই স্নেহ করেন। তার কাছে সব খুলেটুলে বললে তিনি একটা উপায় অবশ্যই করে দেবেন। তোমার মাথায় যতোসব উদ্ভট জিনিস জট পাকিয়ে রয়েছে। কাকাবাবু অসুস্থ মানুষ। নিজে নিজে বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারেন না। তার কাছে ভাত আর ছোটমাছের আবদার করতে যাবে। তোমার বয়েস বাড়ছে না কমছে! বললাম, আমি তো কোনো পথ দেখছিনে। কি করবো আপনিই না হয় বলুন।

একটু অপেক্ষা করো। হোস্টেলের রান্নাঘরের কাছে গিয়ে নরেশদা কয়েকবার চিত্ত চিত্ত করে ডাকলেন। যাই বাবু, অতো চীৎকার করবেন না—রাত বাজে বারোটা, এখনো রান্নাঘর ধোয়া শেষ করতে পারিনি। নরেশদা বললেন, বাবা, কোনো কাজ নয়, এই তোমার সঙ্গে শুধু দুটো কথা বলতে চাই। রান্নাঘর থেকে কালিঝুলিমাখা অবস্থায় চিত্ত আমাদের রুমে এসে বললো, আজ্ঞে বাবু, বলুন। নরেশদা বললেন, বাবা কালকে তিনটের মধ্যে একপোয়া সরু চাল এবং কিছু ছোটো মাছ মরিচ না দিয়ে হলুদ জিরা দিয়ে রান্না করে দিতে পারবে? একটা রোগীর জন্য প্রয়োজন। তুমি না পারলে অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখবো। তা বাবু পারবো, বাজারটা আমি করবো না আপনারা করবেন? তাও তোমাকেই করতে হবে। ট্যাংড়া মাছ পাও কিনা দেখবে। এই নাও বাবা—নরেশদা আস্ত একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট চিত্তের হাতে তুলে দিলেন। চিত্তের বদনমণ্ডলে প্রফুল্লতার ছোঁয়া দেখা দিলো।

নরেশদা আমাকে বললেন, ঘুমোবে? আমি বললাম, ঘুম যে আসতে চাইছে না চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকো। একসময় আসবে তিনি বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়লেন একটু পরে নাক ডাকতে আরম্ভ করলেন আমি চেষ্টা করছি কিন্তু দুচোখের পাতা জোড়া লাগাতে পারছিনে কোথায় একটা মস্তবড়ো

গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তনু, হেলেন, জাহিদুল, আমি, নরেশদা—আমাদের সকলেরই জীবন অন্যরকম ছিলো এবং অন্যরকম হতে পারতো। মাঝখানে যুদ্ধটা এসে সবকিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেলো।

যতোই চিন্তা করি একটা প্রেক্ষাপট তৈরী করতে পারিনে আমি আগামীকাল কি করবো সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না। তনু যদি মারা যায়, কি করবো জানি না। বেঁচে যদি ওঠে তাহলে কি করতে হবে তাও জানিনে। আমার মা বেঁচে আছে কিনা জানিনে। আমার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত যা কিছু সব ব্যাপারে যে দিক থেকেই চিন্তা করিনে কেনো একটা বিরাট নাসূচক অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হচ্ছে। সব ব্যাপারে না না। এতোগুলো না নিয়ে মানুষ বাঁচে কেমন করে!

ভীষণ গরম লাগছে। সাবধানে উঠে বাতি না জ্বালিয়ে কুঁজো থেকে একগ্লাস পানি গড়িয়ে নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নিলাম। একটা ট্যাক্সি ঘটাং ঘটাং করে শেয়ালদার দিকে ছুটে গেলো। আমি সন্তর্পণে দরোজা খুলে ব্যালকনিতে চলে এলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে থাকা নক্ষত্ররাজি, এদের কি আমি আগে কখনো দেখেছি! ছায়াপথে ফুটে থাকা অজস্র তারকারাজির মধ্যে আমার প্রিয় এবং পরিচিত তারকাগুলো কি রয়েছে?

তিন

পরের দিন সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙলো অনেক দেরীতে। ঘড়িতে বেলা সাড়ে দশটা বাজে। আমাদের ছেলেরা বারাসত শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে এসেছে। তাদের চীৎকার কোলাহলই বলতে গেলে ঘুম থেকে টেনে উঠিয়েছে আমাকে। নইলে আমি আরো ঘুমোতে পারতাম।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখি একটাও সিগারেট নেই। মাসুমের দিকে তাকিয়ে বললাম, দাও তো মাসুম, একটা সিগারেট। সে নীরবে একটা সিগারেট আমার হাতে তুলে দিলো। সিগারেটটা জ্বালিয়ে একটা টান দিতেই আমার চোখের দৃষ্টিটা সতেজ হয়ে উঠলো। আমি মাসুমকে জিগগেস করলাম, কখন এলে, অন্যেরা কোথায়—কেমন নাটক করলে?

আমার মনে হলো সে কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলো। বোঝা গেলো নরেশদার সঙ্গে গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা বলে বিশেষ যুত করতে পারেনি। কারণ তিনি বরাবর ঠাণ্ডা মানুষ। হঠাৎ করে কোনো ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করতে পারেন না। মাসুম বললো, আপনি থাকলে বুঝতে পারতেন কি ট্রিমেন্ডাস সাকসেস হয়েছে। আমরা ক্যারেকটরদের মুখ দিয়ে 'এহিয়া-ইন্দিরা এক হ্যায়'—এ শ্লোগান পর্যন্ত বলেছি। আর শ্রোতারা কি পরিমাণ হাততালি দিয়েছে সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না

আমি জানতে চাইলাম, অন্যান্যরা কোথায়? মাসুম বললো, ক্ষীতিশ আর অতীশ টিফিন করেই কলেজে চলে গেছে। বিপ্লব গেছে তার বোন শিখা দীপাকে

মামার বাসায় রেখে আসতে। সালামটা তো পেটুক এক সঙ্গে টিফিন করার পরও ফের খাবারের লোভে একজন সিপিএম কর্মীর সঙ্গে তার বাসায় গেছে। সঙ্গে করে জহিরকেও নিয়ে গেছে।

আমি বললাম, ওরা ফিরে এসেছে একথা আমার বিশ্বেস হতে চাইছে না কেনো আপনি ওকথা বলছেন, সকলে একসঙ্গে এসেছি, সবাই দেখেছে। বললাম, আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে বারাসতের লোকেরা সবাইকে একসঙ্গে খুন করে মাটির নীচে পুঁতে রেখে দিয়েছে।

মাসুম বললো, কেনো, খুন করবে কেনো, আমরা কি দোষ করেছি! আমি জবাব দিলাম, যদি খুন না করে থাকে এবং তোমরা নিরাপদে ফিরে এসে থাকো তাহলে ধরে নিতে হবে, ওরা পাগলটাগল ঠাউরে নিয়েছিলো। সেজন্য কোনো কিছু করা অনাবশ্যক বিবেচনা করেছে। মাসুম বললো, অতো সোজা নয় খুন করা। আমরা তো রিফিউজী ক্যাম্পের ভেতরে নাটক করিনি। কে না জানে সেখানে কংগ্রেসের রাজত্ব? আমরা নাটক করেছি ক্যাম্প থেকে একটু দূরে। সিপিএমের তৈরী করা স্টেজে। অথচ শরণার্থী শিবিরের সমস্ত লোক নাটক দেখতে এসেছে।

নাটক চলছিলো। চরমতম মুহূর্তটির দিকে যখন এগুচ্ছিলো একজন সিপিএম পরামর্শ দিলেন, দাদা এই জায়গায় একটু প্রম্পট করে দিন, 'এহিয়া-ইন্দিরা এক হ্যায়'। তাই দিলাম। কথাটা যখন চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হলো, সেকি তুমুল করতালি আর গোটা মাঠভর্তি মানুষের মধ্যে কি তীব্র উত্তেজনা! জানেন তো বারাসত হলো সিপিএমের সবচেয়ে মজবুত ঘাঁটির একটি। কংগ্রেসের মাস্তানেরা এসে যদি কোনো উৎপাতের চেষ্টা করতো জান নিয়ে ফেরত যেতে পারতো না। সব ক'টার কালোমাথা পড়ে থাকতো।

এরই মধ্যে মাসুমের উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কথা বলার সময় কোলকাতার লোকের মতো টানটোন লাগাবার চেষ্টা করছে। উত্তেজনার তোড়ে জগটা মুখে দিয়েই ঢকঢক করে অনেকখানি পানি খেয়ে নিলো। তারপর বাঁ হাতে মুখটা মুছে বললো, ইয়াহিয়া-ইন্দিরার মধ্যে কি কোনো বেশকম আছে? ইয়াহিয়া খানের লোকেরা বন্দুকের মুখে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মানুষদের দেশের বের করে দিচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী বর্ডার খুলে দিয়েছেন, শরণার্থী শিবির করেছেন। দেখে আসুন সেখানে বাংলাদেশের মানুষের কি অবস্থা। দুবেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে একথা ঠিক। ডাল বলে যে বস্তু পরিবেশন করা হয়, তার চেহারা দেখতে আমাশয় রোগীর মলের মতো। ঘেন্নায় বমি আসতে চায়। ভাত নাকের কাছে ধরা যায় না এমন দুর্গন্ধ। অথচ তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীর নামে দেশবিদেশ থেকে সাহায্য এনে গুদামজাত করছেন। যতো পচা দুর্গন্ধময় চাল ডাল আটা বহুদিন ধরে সরকারী গুদামে পড়েছিলো, সেগুলোই শরণার্থী শিবিরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রমাণের জন্য আপনাকে বেশী দূর যেতে হবে না। ময়দানের কাছেই দেখতে পাবেন, সার বেঁধে দু'হাজারের মতো নতুন ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

ওগুলো বাংলাদেশের বাস্তুহারা মানুষকে সাহায্য করার জন্য দান করেছে জাপান দিনের পর দিন যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষদের জন্য কিছুই করছে না ভারত এবং ভবিষ্যতেও কিছু করবে না ইন্দিরাজী বাংলাদেশের লোকদের নিয়ে শুধু খেলছেন, এতে তারই লাভ। বিরোধী দলগুলোকে কাবু করে রাখার এমন সুযোগ কি তিনি জীবনে আর কোনোদিন পেয়েছেন? এখন নকশাল তৎপরতা কোথায়? কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বোমা ফোটে না কেনো?

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার জনগণের যে জাগ্রত সহানুভূতি, ইন্দিরাজী সেটাকেই নিজের দলের আখের গোছাবার ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছেন। এতোকাল সিপিএম বলতো, শাসক কংগ্রেস বাংলাদেশের মানুষকে ধাপ্পা দিচ্ছে, তাদের দেশে ফেরার ব্যাপারে কোনো বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করছে না। যুগান্তরের মতো কংগ্রেস সমর্থক পত্রিকায়ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ সাংবাদিক লিখেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা তুঙ্গে উঠেছে, আর ওদিকে শ্রীমতি ইউরোপ আমেরিকায় বাবু ধরে বেড়াচ্ছেন।

মাসুমের কোলকাতায় এসে অনেক উন্নতি হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো জিভের আগাটা একেবারে পরিষ্কার এবং ধারালো হয়েছে। এখন যে কোনো সভাসমিতিতে দাঁড় করিয়ে দিলে ঝাড়া দু'ঘণ্টা লেকচার ঝাড়তে পারবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তোমার এই মূল্যবান বক্তৃতার বাকী অংশ না হয় আরেকদিন শোনা যাবে। আজকে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। এখনো দাঁত মাজিনি, বাথরুমে যাইনি। কিছু মুখেও তো দিতে হবে। খালি পেটে কি আর লেকচার ভালো লাগে?

স্পষ্টতই মাসুম বিরক্ত হলো। যতো বড়ো বড়ো কথাই বলুন না কেনো আসলে আপনারা এক একটি পেটিবুর্জোয়া। আমি বললাম, তোমার এই শ্রেণী নির্ধারণের কাজটিও ভবিষ্যতের জন্য রেখে দাও। আপাতত আমাকে নরেশদা কোথায় আছেন খবরটা জানিয়ে বাধিত করো। কি জানি এখন কোথায় আছেন, কিছুক্ষণ আগে তো দেখলাম রান্নাঘরে রাঁধুনি চিত্তের সঙ্গে ঘুটুর ঘুটুর করে কি সব কথাবার্তা বলছেন। দানিয়েল ভাই, জানেন, এই নরেশদা লোকটার ওপর আমার এক এক সময় ভয়ানক রাগ হয়, আপনার সঙ্গে তবু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যায়, নরেশদা গাছের মতো মানুষ, কোনো ব্যাপারেই কোনো রিঅ্যাকশন নেই।

আমি গামছাটা কাঁধে দুলিয়ে দাঁত ঘষতে বেরিয়ে গেলাম। চাপা কলের গোড়ায় গিয়ে দেখি কোনো ভীড় নেই। দুটি মাত্র চাপা কল; একশো দেড়শোজন ছাত্রের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয় গোসলের সময়টিতে একটা তীব্র কম্পিটিশন লেগে যায় প্রথম এখানে গোসল করতে আসতে অত্যন্ত ভয় পেতাম। কারণ ছাত্রদের অনেকেই পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। কারো কারো মা ভাই আত্মীয়স্বজন এখনো বাংলাদেশে রয়েছে।

তবে একথা সত্য যে, সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের অত্যাচারে এদের দেশ ছাড়তে হয়েছে অনেকের গায়ে টোকা দিলেই গোপালগঞ্জ,

ফরিদপুর, বরিশাল, ঝিনাইদহ, চর এলাকার মাটির গন্ধ পাওয়া যাবে। জীবন্ত ছাগল থেকে চামড়া তুলে নিলে যে অবস্থা হয় এদের দশাও অনেকটা সেরকম। কোলকাতা শহরে থাকে বটে কিন্তু মনের ভেতর ঢেউ খেলছে পূর্ববাংলার দীঘল বাঁকের নদী, আঁকাবাঁকা মেঠোপথ, হাটঘাট, ক্ষেতফসল, গরুবাছুর।

সবাই জেনে গেছে আমি মুসলমান। তাই গোসল করতে গেলেই একজন বলাবলি করতো, কিভাবে তার বোনকে মুসলমান চেয়ারম্যানের ছেলে অপমান করেছে। অন্যজন বলতো কিভাবে পাশের গাঁয়ের মুসলমানেরা দলবেঁধে একরাতের মধ্যে খেতের সব ফসল কেটে নিয়েছে। ছোটোখাটো একটি ছেলে তো প্রায় প্রত্যেক দিন উর্দু পড়াবার মৌলবীকে নিয়ে নতুন নতুন কৌতুক রচনা করতো। ভাবতাম, আমাকে নেহায়েত কষ্ট দেয়ার জন্যেই এরা এসব বলাবলি করছে। অথচ মনে মনে প্রতিবাদ করারও কিচ্ছু নেই। প্রায় প্রতিটি ঘটনাই সত্য। উ! সংখ্যালঘু হওয়ার কি যে যন্ত্রণা!

কিন্তু এদের কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হতো সুলতান মাহমুদ, আলাউদ্দিন খিলজী থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত যে সব অত্যাচার হিন্দুদের ওপর হয়েছে তার জন্য একমাত্র আমাকেই শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে ধরে নিয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবতাম বার্মা কিংবা আফগানিস্তান কোথাও কি চলে যাওয়া যায় না?

এখন আমাকে কেউ কিছু বলে না বরং সকলে সমাদরই করে। আমি অসুস্থ মানুষ বলে কেউ কেউ বালতিতে পানি ভরে দিয়ে যায়। সম্যক পরিচয়ের অভাবই হচ্ছে মানুষে মানুষে হিংসাবিদ্বেষের মূল।

আমি গোসল সেরে এসে দেখি নরেশদা জামাকাপড় পরে একমাত্র কাঠের চেয়ারখানার উপর বেলকনির দিকে মুখ করে বসে আছেন। ঘরে জয়সিংহ ব্যানার্জি তার যজমানের মেয়েটিকে নিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছেন। নরেশদা বোধ হয় জয়সিংহ ব্যানার্জি লোকটিকে পছন্দ করতে পারেননি। প্রথম যেদিন এসেছিলেন তখন বিশেষ কথাবার্তা বলেননি। তার এই অপছন্দের কারণ কি জিগগেস করতে গিয়েও করতে পারিনি। কতোজনের কতো কারণ থাকে। ওদের যে আজকে আসার কথা দিয়েছিলাম সেকথা মনেই ছিল না।

আমার পায়ের শব্দে নরেশদা পেছন ফিরে তাকালেন। এতো দেরী করলে যে? আমি বললাম, দেরী আর করলাম কোথায়? ঘুম থেকে উঠতেই দেরী হয়ে গেলো। তার ওপর মাসুমের আস্ত একখানি লেকচার শুনতে হলো। তিনি বললেন, টিফিন করতে যাবে না? সেকি আপনি সকাল থেকে কিছু না খেয়েই বসে আছেন? তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো? আমি বললাম, মনে করাকরি নিয়ে কাজ নেই, চলুন।

আমি জয়সিংহ ব্যানার্জিকে বললাম, আপনারা একটু বসুন, এই আমরা কিছু খেয়েই চলে আসবো। নরেশদা বললেন, ওনারাও সঙ্গে চলুন, আমাকে তো রুম বন্ধ করে যেতে হবে। আর তো কেউ নেই। রুম পাহারা দেবে কে? আমি যাবো আমার কাজে, তোমাকেও বোধ হয় বেরোতে হবে। অতএব কাপড়চোপড় পরে

একেবারে তৈরী হয়ে নেয়াই উত্তম। মনে আছে তো, তিনটের সময় তোমাকে কোথায় যেতে হবে?

আমার শরীরে একটা প্রদাহ সৃষ্টি হলো। বললাম, চলুন, চলুন। রাস্তা ক্রস করে ভীমনাগের পাশের ছোট্টো অবাঙ্গালী দোকানটিতে গিয়ে পুরি-তরকারী খেলাম। জয়সিংহবাবু এবং তার যজমান কন্যা কিছুই খেতে রাজী হলেন না। তারা বসে বসে আমাদের খাওয়া দেখলেন।

ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই দেখছি, আকাশে বড় বড় মেঘ দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মাটির ভাঁড়ের চা শেষ করার আগেই দেখলাম ঘন কালো মেঘে কোলকাতার আকাশ ছেয়ে গেছে। একটু পরেই বড় বড় ফোঁটায় বিষ্টি নেমে এলো। দেখতে দেখতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেলো। আমাদের বেরুবার আর কোনো উপায় রইলো না।

নরেশদা বললেন, এরপর তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, এদের নিয়ে প্রিন্সেপ স্ট্রীটে সোহরাব সাহেবের কাছে যাবো। তিনি যদি এদের নামে একটা স্লিপ ইস্যু করেন, তাহলে এরা কোলকাতা শহরে থেকেই রেশন ওঠাতে পারবেন। তিনি জবাব দিলেন না। পায়জামা অনেক দূর অবধি গুটিয়ে নিয়ে এই প্রচণ্ড বিষ্টির মধ্যেই—'তোমরা বসো, আমি ছাতাটি নিয়ে আসি' বলে বেরিয়ে গেলেন। গিয়ে আবার তিন চার মিনিটের মধ্যেই ছাতাসহ ফিরে এলেন।

আমি বললাম, এতো প্রচণ্ড বিষ্টির মধ্যে আপনি ছাতা নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, শেয়ালদা। ও মা, শেয়ালদা কেনো? একটু মধ্যম গ্রামে গিয়ে প্রণব আর সুব্রতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। আমার হাতে রুমের চাবি দিয়ে বললেন, আমার ফিরতে একটু দেরী হতে পারে। চিত্তের সঙ্গে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। দেখবে তক্তপোষের নীচে ছোটো দুটো বাটি আর টেবিলের ওপর একটা ব্যাগ। ওসব ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে যাবে। আস্ত ব্যাগটাই তনুর কাছে রেখে আসবে। আর ধরো, এই ত্রিশটা টাকা রইলো। তিনি হাঁটু অবধি পাজামা গুটিয়ে বিষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মধ্যমগ্রামের সুব্রতবাবু নরেশদাকে তার স্কুলে একটা চাকুরী দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই ভরসায় ওই বিষ্টিবাদল মাথায় নিয়ে তিনি মধ্যমগ্রাম যাচ্ছেন। আমাদের বেঁচে থাকা ক্রমাগতই কঠিন এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। ভেতরে ভেতরে কি তীব্র চাপ অনুভব করলেই না নরেশদার মতোন অলস স্থবির মানুষ এমন ঝড়জল উপেক্ষা করে শেয়ালদার রেলগাড়ীতে চড়ে মধ্যম গ্রাম পর্যন্ত ছুটে যেতে পারেন। বাইরে যতোই স্থৈর্য রক্ষা করুন না কেনো, আসলে ভেতরে ভেতরে মানুষটা ভেঙ্গে যাচ্ছে।

নরেশদা চলে যেতেই আমরা তিনজন অপেক্ষাকৃত হালকা বোধ করলাম। তার উপস্থিতির দরুন জয়সিংহবাবু স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। আমরা টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। বাইরে বিষ্টি পড়ছে বলে তো আর দোকানে বসে থাকা যায় না! দোকানের মালিকের আড়চোখে চাওয়ার উপদ্রব থেকে রক্ষে পাওয়ার জন্য

আরো তিন ভাঁড় চা চেয়ে নিলাম। একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খাচ্ছিলাম। আমাদের ভাবখানা এই, যতোক্ষণ বিষ্টি থামবে না, ততোক্ষণ এই ভাঁড়ের চা চুমুকে চুমুকে পান করে যাবো। কিন্তু পঁচিশ পয়সা দামের চায়ের ভাঁড় তো আর সমুদ্র নয়, এক সময়ে শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু বিষ্টি থামলো না।

দোকানী এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করলো, বাবুজী এখন উঠতে হবে, আমার দোসরা কাস্টোমার কো জাগা দিতে হবে। আমি বললাম, এই বিষ্টির মধ্যে যাবো কেমন করে? বাবুজী বিষ্টি তো আমি মন্তর পড়ে নামাইনি। আপনারা বলছেন, যাবো কেমন করে—ঐ দেখুন। মাথা বাড়িয়ে দেখলাম শতো শতো মানুষ বিষ্টিতে ভিজে ওদিক যাচ্ছে, এদিক আসছে। ট্রাম বাস দাঁড়িয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে থাক। কিন্তু মানুষের নিরন্তর পথ চলার কোনো বিরাম নেই।

অগত্যা বিষ্টির মধ্যে আমাদেরও উঠতে হলো। কিছুদূর এসে একটা বাড়ির রোয়াকে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। তারপর একটানা হেঁটে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বাঁকে ডা. বিধান রায়ের বাড়ীর কাছে চলে এলাম। বৌবাজার থেকে প্রিন্সেপ স্ট্রীটের দূরত্ব বেশী নয়। কিন্তু বিষ্টির বেগ আমাদেরকে চলতে দিচ্ছিলো না। আমরা আরেকটা চালার নীচে দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার ছল করে আরো একটুখানি আশ্রয় চুরি করলাম। চা খেতে খেতেই বিষ্টির বেগ একটু কমলো।

এই সুযোগে প্রিন্সেপ স্ট্রীটের অফিসটিতে চলে এলাম। ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। ঠেলাঠেলি, কনুই মারামারি করছে হাজার হাজার মানুষ। সকলেই অসহায়, সকলেই একটুখানি আশ্রয় চায়। অফিসের বিল্ডিংয়ের পাশের খালি জায়গাটিতে প্রতি রাতে হাজার হাজার বাংলাদেশের তরুণ ঘুমোয়। একখানি চাদর বিছিয়ে, লুঙ্গীটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে কেউ কেউ। যার তাও নেই উন্মুক্ত জমিনকেই শয্যা হিসেবে ধরে নিয়ে রাত গুজরান করে।

এদের মধ্যে ট্রেনিং ক্যাম্প যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান তরুণ যেমন আছে, তেমনি আছে ধাড়ী নিষ্কর্মার দল। চোরছ্যাঁচড়, এমনকি কিছু কিছু সমকামী থাকাও বিচিত্র নয়। অন্যান্য দিন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। গোটা সংখ্যাটা একসঙ্গে দেখা যেতো না। আজ বাসাভাঙ্গা কাকের মতো সবাই অফিস বিল্ডিংটিতে একটুখানি ঠাঁই করে নিতে যাচ্ছে। যে দিকেই তাকান, দেখবেন শুধু কালো কালো মাথা। এ ভীড় ডিঙ্গিয়ে ওপরে ওঠা প্রথমে মনে হয়েছিলো অসম্ভব। ভীড়ের মধ্যে একটি আঙ্গুল চালাবার মতোও খালি জায়গা নেই। কেমন করে যাবো? বিশেষত সঙ্গে একটি মেয়ে, বয়সে যুবতী, তার গায়ের কাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে একসাথ হয়ে রয়েছে। এতোগুলো মানুষ মেয়েটিকে এ অবস্থায় দেখছে, দেখে আমি নিজেই ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেলাম। ওমা, দেখি এরই মধ্যে মানুষ ওপরে যাচ্ছে। ওপর থেকে নীচে নামছে।

আমরাও একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপরে উঠে এলাম। যে কষ্টকর উপায়ে মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তার সঙ্গে এই উপরে ওঠার কিঞ্চিত তুলনা করা চলে। অফিসের খোপ খোপ কাউন্টারগুলোতে আজ আর কোনো কাজ চলছে না।

সর্বত্র মানুষ গিসগিস করছে। এখানে সেখানে মানুষের ঝাঁক মৌচাকের মতো জমাট বেঁধে আছে।

আমি জয়সিংহ ব্যানার্জিকে বললাম, এতো কষ্ট করে আসাটাই বৃথা হয়ে গেলো। এর মধ্যে সোহরাব সাহেবকে খুঁজবো কোথায়। এই সময়ে দেখা গেলো তিনতলার চিলেকোঠার দরোজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে। ইশারা করে ডাকছে। কাকে না কাকে ডাকছে পয়লা বিশেষ আমল দেইনি। তিনতলার সিঁড়িতেও মানুষ। তিলধারণের স্থান নেই। লোকজন এই জল অচল ভীড়ের মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, এই যে আপনাকে ওপরে ডাকছে। আমার তখখুনি মনে হলো এমন কালো, এমন মোটা, এমন লোমশ হাত সোহরাব সাহেবের ছাড়া আর কারো হতে পারে না। আবার পূর্বের মতো কষ্ট করে ওপরে এলাম।

সোহরাব সাহেব পায়জামা হাঁটুর ওপর তুলে পায়ের ওপর পা উঠিয়ে একটা হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসে চারমিনার টানছেন আর শেখ মুজিবের মুণ্ডুপাত করছেন। আরেকজন ছাত্রনেতা বসে বসে নীরবে সোহরাব সাহেবের কথামৃত শ্রবণ করছেন। ছাত্রনেতাটিরও নিশ্চয়ই কোনো জরুরী ঠেকা আছে। আর বোধ হয় খুব রিলায়েবল হবেন। নইলে নির্বিবাদে এমন বিরূপ শেখ মুজিব চর্চা এই প্রিন্সেপ স্ট্রীটের অফিসে কেমন করে চলতে পারে?

আমি বললাম, নেতা, কষে তো নেতার সমালোচনা করা হচ্ছে। আমি চীৎকার করে বলে দেই জনগণের কাছে, তখন বুঝবেন ঠেলাটা। তখখুনি আমার দৃষ্টি সোহরাব সাহেবের হাঁটুর দিকে পড়লো। বাইর থেকে ছিটেফোঁটা বিষ্টির ছাট এসে লাগছে। যতোটুকু পায়জামা গুটিয়েছেন দেখা গেলো লোমগুলো সব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সঙ্গে একজন মেয়ে আছে দেখেও তিনি পাজামাটা ঠিক করে নিলেন না।

আমাদের বসার কোনো জায়গা ছিলো না। স্বল্পপরিসর কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। সোহরাব সাহেব বললেন, নেতাকে বকবো না, কাকে বকবো? নেতার ডাকেই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। আজকে আসার সময় দেখলাম, যে ঘরটাতে থাকি সেখানে পানি উঠছে, বাচ্চাটার অসুখ। আর কতো কষ্ট সহ্য করবো? এখন পাকিস্তানের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিলেই হয়, ঘরের ছেলে ঘরে ফেরত চলে যেতাম। এদিকে কি সব কাণ্ড ঘটছে জানেন?

জবাব দিলাম, আমি জানবো কেমন করে। আপনাদের দল তো আমাকে দেশের শত্রু না হলেও ঠিক বন্ধু মনে করে না। তিনি আমার হাতে একটা লিফলেট দিয়ে বললেন, আপনি হার্মলেস মানুষ, তাই বিশ্বেস করে পড়তে দিচ্ছি। লিফলেটটা আগরতলা থেকে বেরিয়েছে। তার মর্ম সংক্ষেপে এরকম: শেখ সাহেব পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে ধরা পড়বার আগে এক ঘরোয়া সভা ডেকেছিলেন। তাতে একজন নাকি জিগগেস করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু আপনার অবর্তমানে আমরা কার নেতৃত্ব মানবো? শেখ সাহেব আঙ্গুল তুলে শেখ মনিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এর নেতৃত্ব মেনে চলবে। লিফলেটটা ফেরত দিলে তিনি পাঞ্জাবীর পকেট

হাতড়ে একটা জেন্টস সাইজ পকেট রুমালের মতো পত্রিকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই দাগ দেয়া অংশটুকু পাঠ করুন। আর বিশুদ্ধ বাঙাল উচ্চারণে বললেন, নেতাকে কি আর সাধে গাইল্যাই?

পত্রিকাটাও আমি পড়ে দেখলাম। সংক্ষেপে সারকথা এই: আগরতলাতে দু'দল ছাত্র, নেতৃত্বের দাবীতে একরকম সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিলো। তার প্রতিবাদে আগরতলার জনসাধারণ প্রকাশ্য সভা করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগরতলার মাটিতে বাংলাদেশের লোকদের এই মারামারি তারা সহ্য করবেন না। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করতে চায়, বাংলাদেশে গিয়ে করুক। আগরতলায় থেকে, আগরতলার খেয়ে ওরকম কোন ঔদ্ধত্য চলবে না।

কাগজটা ফেরত দিলে সোহরাব সাহেব আমাকে জিগগেস করলেন, ভালো লিখেনি? আমি মাথা নাড়লাম। দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে বাত ধরে যাচ্ছে। অধিক কথা না বাড়িয়ে বলে ফেললাম, সোহরাব সাহেব আমি আপনার কাছে এই এদের রেশন কার্ড ইস্যুর জন্য একটা স্লিপ নিতে এসেছিলাম। জয়সিংহ ব্যানার্জি এবং তার যজমানের মেয়ে সবিতাকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আরে সাহেব, আপনি মুশকিলে ফেললেন। এই হট্টগোলের সময় আমি কোথায় কাগজ পাই, কোত্থেকে কলম যোগাড় করি? আমি বললাম, কাগজ কলম দিচ্ছি। আপনি একটু কষ্ট করে লিখে দেবেন। তিনি খসখস করে গৎবাঁধা ইংরেজী জবানে লিখে দিলেন, প্লীজ ইস্যু এ ... ইত্যাদি ইত্যাদি। কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, সবচেয়ে বাঁদিকের কাউন্টারে যে লোক বসে তাকে দেখালেই একটা সীল দিয়ে দেবে। আজকে তো সম্ভব নয়। কালপরশু যে কোনো দিন এসে লাগিয়ে নিলেই হবে। জয়সিংহ ব্যানার্জিকে বললাম, দাদা, আপনারা তো অনেক দূরে যাবেন। বরং চলেই যান, কাল এসে সীলটা লাগিয়ে নেবেন। ওরা চলে গেলো।

আমরা আরো কিছুক্ষণ গল্পগাছা করলাম। এরই মধ্যে বিষ্টি ধরে এসেছে। আসমানের মেঘ কাটেনি। ঘড়ি চেয়ে দেখলাম, বেলা একটা বাজে। আমাকে উঠতে হলো। দোতলায় নেমে দেখি বিষ্টি থামতেই আবদ্ধ মানবমণ্ডলীর মধ্যে চলাচলের একটা সাড়া পড়ে গেছে। একটানা অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকার পর মানুষের মধ্যে একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে ভীড় অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলো। নীচে নেমে এলাম। রাস্তার পানি নামতে অনেক সময় লাগবে। তাও যদি বিষ্টি না হয়।

এখন আমি কি করবো চিন্তা করছি, এমন সময় পিস্তলের আওয়াজের মতো একটা তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এই যে দাদা, আপনার কাছে একটা কথা জিগাইবার লাইগ্যা ডা. রায়ের বাড়ী থেকে আপনাকে ফলো করছি। আমি তাকিয়ে দেখলাম, লোকটার গাত্রবর্ণ একেবারে ধানসিদ্ধ হাঁড়ির তলার মতো কৃষ্ণ। মুখে দাড়িগোঁফ গজিয়েছে। পরনে একখানি ময়লা হাঁটুধুতি, গায়ের জামাটিও ময়লা। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েও কোনো হদিস করতে পারলাম না, কে হতে পারে। আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না দাদা, আমি বাংলাবাজারের রামু।

ওহ রামু, তুমি কেমন আছো? দাদা, ভগবান রাখছে। বললাম, তোমার মা-বাবা সবাই ভালো আছেন? দাদা, মা-বাবা আর দাদার কথা জিগাইবেন না। সব ক'টারে দেশের মাটিতে রাইখ্যা আইছি। রামু হু হু করে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। তথাপি আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

রামু আমাকে ছেড়ে দিয়ে সটান সোজা হয়ে চোখে চোখ রেখে সরাসরি জানতে চাইলো, জয়সিংহ ব্যানার্জির সঙ্গে আপনার অতো পিরিত কেনো? আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে মনে রামুকে ধন্যবাদ দিলাম। একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রামু। বললাম, পিরিত টিরিত তো কিছু নয় রামু। জয়সিংহবাবু তার যজমানের মেয়েকে নিয়ে অসুবিধেয় পড়েছে। আমাকে ধরেছে একটা রেশন কার্ডের স্লিপ করিয়ে দেয়ার জন্য। তা করিয়ে দিলাম। মেয়েটির নাকি আর কোনো অভিভাবক নেই, তাকে পোষার দায়িত্বও জয়সিংহবাবুর ঘাড়ে এসে পড়েছে। অন্যায় কিছু করেছি রামু?

রামু এবার রাগে ফেটে পড়লো। শালা বদমাইশ বাউন, মা আর বুন দুইডা ক্যাম্পে কাঁইদ্যা কাঁইদ্যা চোখ ফুলাইয়া ফেলাইতাছে। আর হারামজাদা মাইয়াডারে আইন্যা মজা মারছে। আর কিছু না দাদা, এই খবরটা জানাইবার লাইগ্যা আপনার পাছ ধরছিলাম। তারপর উত্তরের কোনো তোয়াক্কা করে না রামু হাঁটুধুতিটা আরো ওপরে তুলে রাস্তার পানির মধ্যে পা চালিয়ে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো।

হঠাৎ করে আমার খুব রাগ ধরে গেলো। কাউকে খুন করার ইচ্ছে হচ্ছিলো। করার মতো কিছু না পেয়ে দাঁতে অধর চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে থুতনির কাছে তরল পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করে, আঙ্গুল দিয়ে দেখি রক্ত। আমারই অধর কেটে গিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

চার

হোস্টেলে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুটো বেজে গেলো। ক্ষীতিশ কলেজ থেকে ফিরেছে। বললো, দাদা, মেজদা নাকি চিত্তকে কি সব রান্নাবান্না করার ফরমায়েস দিয়ে গেছে। চিত্ত বারেবারে খুঁজছে। আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি। নইলে নিজেই খেয়ে নিতাম। কি ব্যাপার, জানেন নাকি কিছু?

আমি বললাম, হাঁ ক্ষীতিশ, একজন রোগীর জন্য কিছু খাবার পাক করে নিতে হবে হাসপাতালে। যদি হয়ে গিয়ে থাকে তুমি একটু কষ্ট করে ভাত আর মাছ আলাদা আলাদাভাবে এই বাটিটার মধ্যে ভরে দিতে বলো। তক্তপোষের তলা থেকে আমি ছোট্টো বাটিটা বের করে ক্ষীতিশের হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ পর ক্ষীতিশ ভাত তরকারীভর্তি বাটিটা নিয়ে এলে পেটমোটা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে আস্ত বাটিটা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলাম।

ক্ষীতিশ জানতে চাইলো, দাদা কি এখনই বেরুবেন? আমি বললাম, হাঁ, এখখুনিই বেরুতে হবে। কতোদূর যাবেন? পিজি হাসপাতাল। শহরে কোনো ট্রাম বাস চলছে না, রাস্তায় এক কোমর জল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, এই অল্পক্ষণের মধ্যে বিষ্টি নামবে।

ক্ষীতিশ ব্যালকনির দিকের দরোজা খুলে দিলো। আমার নিজের চোখে পরখ করে দেখার জন্য। কালোমেঘ কোলকাতার আকাশের চারকোণ ছেয়ে একেবারে নীচে নেমে এসেছে। ট্রাম বাস ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। হাতেটানা রিকশাগুলো ডিঙি নৌকার মতো চলাফেরা করছে। বাস্তবিকই পথে বেরুবার পক্ষে এক ভয়াবহ ব্যাপার বটে।

তথাপি এরই মধ্যে মানুষ চলাচল করছে। মহিলারা মাথায় ছাতা মেলে ধরছে বটে, কিন্তু অনেকেরই পরনের শাড়ী কোমর অবধি ভিজে গেছে। আমি বললাম, আমাকে যেতেই হবে ক্ষীতিশ। তুমি বরং একটা উপকার করো। নীচের কোনো দোকান থেকে সস্তায় একটা জয়বাংলা বর্ষাতি কিনে এনে দাও। বিশটি টাকা বের করে তার হাতে তুলে দিলাম। ক্ষীতিশ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নীচে গেলো।

ইত্যবসরে আমি একটা পুরোনো প্যান্ট পরে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে নিলাম। দেশ থেকে একজোড়া জুতো এনেছিলাম। কোলকাতায় আসার পর থেকে বিশেষ পরিনি। সেটা পরে নিলাম। আশঙ্কা হচ্ছিলো 'জয়বাংলা' স্যান্ডেল জোড়ার যে অবস্থা হয়েছে পানির সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠতে না পেরে মাঝ পথে ছিঁড়ে যাবে। ক্ষীতিশ বর্ষাতিটা কিনে নিয়ে এলে সেটা পরে নিয়ে ব্যাগটা হাতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে নামতেই ঝমঝম করে আকাশ ভেঙ্গে বিষ্টি নামলো। বর্ষণ এতো প্রবলভাবে শুরু হলো যে পাঁচহাত দূরের জিনিসও ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাচ্ছে। ফুটপাথ দিয়ে চলতে গিয়ে পরপর দুবার দুজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেললাম। রাস্তা পানিতে ফেঁপে ফুলে একটা ছোটো নদীর আকার ধারণ করেছে।

এ বিষ্টির মধ্যে প্রায় এক কোমর পানি ভেঙে পথ চলতে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করছিলাম। ঢাকা আসার আগে গাঁয়ে থাকার সময় ছোটোবেলায় বাড়ীর পাশের খালটিতে সাঁতার দিয়ে কি আনন্দই না অনুভব করতাম। তারপরে ছাঁৎ করে মনে পড়ে গেলো, একবার ঝড়বিষ্টির মধ্যে ভিজে চুপসে তনুদের বাড়ীতে হাজির হয়েছিলাম। তনু দরোজা খুলে আমাকে এ অবস্থায় দেখে রবীন্দ্রনাথের সে গানটির দুটি কলি গেয়ে উঠেছিলো 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরানসখা বন্ধু হে আমার'। সেদিন আর আজ। মাঝখানে কতোকিছু ঘটে গেছে। আমি রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে হাঁটছি। কেনো জানি কান্না এসে আমার বুক ভিজিয়ে দিতে চাইছিলো।

তনুর সঙ্গে আমার পরিচয় উনিশশো উনসত্তর সালে। সে দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, মৃত্যুর মুহূর্তেও ভুলতে পারবো না। এরকম আগস্ট

মাসের একটা দিনে প্রচণ্ড গরম পড়ছিলো। আমি বাংলাবাজারে প্রকাশক পাড়ায় গিয়েছি। নানা কারণে মনটা বিগড়ে গিয়েছিলো। যতীনদা আমাকে বললেন, চলো একটা জায়গায় ঘুরে আসি। হেঁটে হেঁটে গেন্ডারিয়ার লোহার পুল পেরিয়ে বুড়ীগঙ্গা পাড়ের একটা ছোটো একতলা বাড়ীর সামনে এসে যতীনদা বললেন, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি দেখি ভেতরে কেউ আছে কিনা। তিনি এগিয়ে এসে দরোজায় কড়া নাড়তে থাকলেন।

একটু পরে দরোজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেলো। যতীনদা ভেতরে ঢুকলেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাকলেন, এসো দানিয়েল। আমিও ভেতরে প্রবেশ করলাম। যতীনদা বললেন, দেখো তনু, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি। সাদা শাড়ী পরিহিতা উজ্জ্বল শ্যামল রঙের মহিলাটি আমাকে একটুখানি ঘাড়টা দুলিয়ে সালাম করলো। যতীনদা তক্তপোষের ওপর পাতা সাদা ধবধবে চাদরের ওপর পা উঠিয়ে বসলেন। মহিলাটি আমাকে বললেন, আপনিও উঠে বসুন। আমি ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললাম, আমার পায়ে অনেক ময়লা। চাদর ময়লা হয়ে যাবে। বরঞ্চ আমাকে অন্য রকম একটা আসন দিন। তাই যদি হয়, আপনি যদি কিছু মনে না করেন পাটা ধুয়েই বসুন। আমি পানি এনে দিচ্ছি। এক বদনা পানি এনে দিলে আমি পা দুটো রগড়ে রগড়ে পরিষ্কার করে বিছানার ওপর বসলাম।

সেদিন আমি একটা পাটভাঙা সাদা পাঞ্জাবী পরেছিলাম। লাল মলাটের কি একখানা বই বুকের সঙ্গে সারাক্ষণ আঁকড়ে ধরেছিলাম। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবীর বুকের অংশে মলাটের রংটা গাঢ় হয়ে লেগে গিয়েছিলো। মহিলাটি আমার পাঞ্জাবীর দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলো, আপনার পাঞ্জাবীতে এমন করে খুনখারাবীর রং দিয়েছে কে?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কেউ দেয়নি। কখন বইয়ের মলাটের রংটা পাঞ্জাবীতে লেগে গেছে খেয়াল করিনি। লক্ষণ ভালো নয়, বলে মহিলাটি সুন্দর সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসলো। ফুলদানীতে একটা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তার হাসিটি রজনীগন্ধার মতো সুন্দর স্নিগ্ধ। ঘাড়টাও রজনীগন্ধার মতো ঈষৎ নোয়ানো।

আমি চেয়ে দেখলাম, ঘরে আসবাবপত্তর বিশেষ নেই। তক্তপোষের ওপরে হারমোনিয়ম, তবলা এবং একটি তানপুরা। পাশে একটি পড়ার টেবিল, সামনে একখানি চেয়ার। শেলফে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পাঠ্য বই, একেবারে উপরের তাকে সেই চমৎকার চারকোণা ফুলদানীটি, যার ওপর শোভা পাচ্ছে সদ্যছিন্ন রজনীগন্ধার গুচ্ছ। মনে মনে ভেবে নিলাম এ বাড়ীতে গানবাজনার চল আছে। এ বাড়ীর কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, এই ঘরজোড়া তক্তপোষটিতে নিশ্চয়ই একের অধিক মানুষ ঘুমোয়।

যতীনদা বললেন, দানিয়েলের সঙ্গে এখনো পরিচয় করিয়ে দেইনি। দানিয়েল, এ হলো আমাদের বোন তনু। আর ও হচ্ছে দানিয়েল, অনেক গুণ, কালে কালে পরিচয় পাবে। তার সর্বপ্রধান গুণ হলো সে ভয়ানক রাগী। নাকের ডগার কাছ দিয়ে মাছি উড়ে যাওয়ার সময় দু'টুকরো হয়ে যায়। তনু সায় দিয়ে

বললেন, বা রে, যাবে না, যা খাড়া এবং ছুঁচোলো নাক! মহিলা আমার নাকের তারিফ করলেন কি নিন্দে করলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

একটু পরে আরো দুজন মহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন। একজনের পরনে সাদা শাড়ী, আরেকজন পরেছে সালোয়ার কামিজ। তনু পরিচয় দিলো, এ হচ্ছে আমার ইমিডিয়েট ছোট বোন, নাম দোলা—সেন্ট্রাল উইমেন্সে পড়ছে। খেলাধুলার দিকে খুব ঝোঁক। ও হচ্ছে তার ছোটোটি। নাম হেলেন। গানবাজনা করে। ইনি দানিয়েল ভাই, অনেক গুণী মানুষ। যতীনদা, আপনারা কথাবার্তা বলুন, যাই, কিছু খাবার দেয়া যায় কিনা দেখি।

সেদিন গেন্ডারিয়ার সে বাসা থেকে ফিরে আসার সময় দেখি আকাশে থালার মতো একখানা চাঁদ জ্বলছে। আমি পাঞ্জাবীর বুকের কাছের লাল রঙীন অংশটি বারবার স্পর্শ করছিলাম। একি সত্যি সত্যি রং, নাকি হৃদয়ের রক্ত, মাংস চামড়া ভেদ করে পাঞ্জাবীতে এসে লেগেছে?

আমার মনে হয়েছিলো, ওই দূরের রুপোলী আভার চাঁদ আমার জন্যই এমন অকাতরে কিরণ বিলিয়ে দিচ্ছে। কামিনী হাস্নাহেনা আমার ইন্দ্রিয়গ্রামের গভীর পরিতৃপ্তির জন্য এমন মনোরম সুবাস ঢেলে দিচ্ছে। যতীনদার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ। তবু, তবু তাকে আমি পুরোপুরি ক্ষমা করে দিতে পারবো, কেননা তিনি আমাকে বুড়ীগঙ্গার পাড়ে, গেন্ডারিয়ায়, তনুদের সে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

এসপ্লানেড ছাড়িয়ে বাঁক ঘুরে রবীন্দ্রসদন অভিমুখী রাস্তাটা ধরতেই পানির প্রতাপ কমে এলো। বিষ্টি হচ্ছে, তথাপি রাস্তাঘাটে জল দাঁড়ায়নি। এতোক্ষণ একটা ঝোঁকের মাথায় এতোদূরে চলে এসেছি। এখন নিজের দিকে একটু তাকাতে চেষ্টা করলাম। প্যান্টে নিশ্চয় পচা পানির সঙ্গে কোলকাতার যাবতীয় ময়লা এসে মিশেছে। লোমকুপের গোড়ায় গোড়ায় এখন থেকেই চুলকোতে শুরু করেছে। বর্ষাতিটা শরীরের সঙ্গে ঝাপটে ধরেছে। সত্তার তিন অবস্থার মধ্যে এক অবস্থা প্রথম দিনেই প্রত্যক্ষ করা গেলো। এখানে সেখানে ছড়ে গেছে।

পায়ের নীচের জুতোজোড়ার অবস্থা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছিনে। প্রতি কদমেই অনুভব করছি, বিষ্টিতে গলে যাওয়া এঁটেল মাটির মতো সোলটা ফকফকে হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সামনে আরেকবার চরণ বাড়ালেই সোল দুটো আপনা থেকেই পাকাফলের মতো খসে পড়বে। নিজের ওপর ভয়ানক করুণা হচ্ছিলো। এরকম দশা কি কারো কখনো হয়েছে? একটা সিগারেট খাওয়ার তেষ্টা পেয়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট আর ম্যাচ বের করে দেখি ভিজে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। দুত্তোর ছাই, রাগ করে সিগারেট ম্যাচ দুটোই ড্রেনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম।

হাসপাতালের গেট খুলতে এখনো প্রায় আধঘণ্টা বাকী। এ সময়টা আমি কি করি! আকাশ থেকে মুষলধারে বিষ্টি ঝরছে। ধারে কাছে চায়ের দোকানও নেই যে বসে সময়টা পার করে দেয়া যায়। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। দারোয়ানের কাছে গিয়ে বললাম, ড. মাইতির কাছে দেখা করতে যাবো। আমার দিকে

একপলক নিরীক্ষণ করে দারোয়ানের বুঝি দয়া হলো। সে সটাং করে লোহার গেটের পাল্লা দুটো আলাদা করলো, আমি ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

তনুর রুমে সরাসরি প্রবেশ করে দেখি সে শুয়ে আছে। পাশের বেডের উৎপলা আজও বেডে হাজির নেই। তনু কি ঘুমিয়ে পড়েছে, নাকি এমনিতে চোখ বন্ধ করে আছে? মস্তবড়ো ফাঁপরে পড়ে গেলাম। আয়াটায়া কিংবা নার্স জাতীয় কাউকে দেখা যায় কিনা খোঁজ করতে করিডোরের দিকে এলাম। আমার সিক্ত জুতো থেকে ফ্যাঁস ফ্যাঁস হাঁসের ডাকের মতো এক ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর প্যান্ট থেকে পানি পড়ে ধোয়ামোছা তকতকে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এক অসহনীয় পরিস্থিতি। এ অবস্থায় আমাকে কেউ দেখে হাসপাতালের পবিত্রতা লঙ্ঘনের অপরাধে যদি কান দুটো ধরে বের করে দেয়, বলার কিছুই থাকবে না।

এক সময় তনু চোখ মেলে জিগগেস করলো, কে? আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, খুব গম্ভীর গলায় পরম সন্তোষের সঙ্গে বললো, ও দানিয়েল ভাই, আপনি এসেছেন তাহলে। আমি সেই পেটমোটা ব্যাগটা তার হাতে দিয়ে নীচু গলায় বললাম, এর মধ্যে ভাতমাছ আছে। সে সন্তর্পণে ব্যাগটা গ্রহণ করে স্টীলের মিটসেফটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। খুশীতে তার চোখজোড়া চিকচিক করে উঠলো। দানিয়েল ভাই, বসুন, হাতে টুলটা দেখিয়ে দিলো। তারপর আমার আপাদমস্তক ভালো করে তাকাতেই শক লাগার মতো চমক খেয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো। একি অবস্থা হয়েছে আপনার, দানিয়েল ভাই! সব তো ভিজে একেবারে চুপসে গেছে।

আমি বললাম, বা রে, ভিজে যাবে না, রাস্তায় এক কোমর পানি ভেঙ্গেই তো আসতে হলো! তনু জিগগেস করলো, এ বিষ্টির মধ্যে সব পথটাই তাহলে আপনি হেঁটে এসেছেন? আমি বললাম, উপায় কি, ট্রাম বাস কিছুই তো চলে না। তাছাড়া ট্যাক্সি পাওয়া অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। সহসা তার মুখে কোনো কথা যোগালো না। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে একটি বড়োসড়ো তোয়ালে আমার হাতে দিয়ে বললো, আপাতত গায়ের বর্ষাতিটা আর পায়ের জুতোজোড়া খুলে, গা মাথা ভালো করে মুছে নিন। আমি দেখি কি করা যায়।

সে গোবিন্দদা, গোবিন্দদা চীৎকার করে একেবারে করিডোরের শেষ মাথায় চলে গেলো। গায়ের বর্ষাতিটা খুলে, পায়ের জুতোজোড়ার ফিতে খুলে, পাজোড়া বের করে নেয়ার জন্য যেই চাপ দিয়েছি, অমনি সোল দুটো আপোসে জুতো থেকে আলাদা হয়ে গেলো। আমার ভয়ানক আপসোস হচ্ছিলো। এই একজোড়া জুতো অনেকদিন থেকে বুকের পাঁজরের মতো কোলকাতা শহরের কাদা জল বিষ্টির অত্যাচার থেকে রক্ষা করে আসছে। আজ তার পরমায়ু শেষ হয়ে গেলো। গা মাথা মোছার কথা ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে খসেপড়া সোল দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই সময়ের মধ্যে গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তনু ফিরে এলো। তনু গোবিন্দকে কি একটা ব্যাপারে অনুরোধ করছে। আর গোবিন্দ বারে বারে মাথা নেড়ে বলছে, না দিদিমণি, সে আমাকে দিয়ে হবে না। দেখছেন না কেমন করে বিষ্টি পড়ছে।

দোকানপাট সব বন্ধ। তাদের কথা ভালো করে কানে আসছিলো না। আমি জুতোজোড়ার কথাই চিন্তা করছিলাম। তনু গোবিন্দের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললো। গোবিন্দ বললো, তাহলে টাকা দিন, আর ছাতার ব্যবস্থা করে দিন। আমার খুব ভয় লাগছিলো পাছে তনু আবার আমাকে কোনো টাকাপয়সা দিতে বলে। আসলে আমার কাছে বর্তমানে বিশ বাইশ টাকার অধিক নেই এবং টাকাটা হাতছাড়া করার ইচ্ছেও নেই। পঞ্চাশ নয়া পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাবার জন্য দৈনিক চার ছয় মাইল পথ অবলীলায় হেঁটে চলাফেরা করছি ইদানীং।

আমার জুতোর খসে পড়া সোল দু'খানি তার দৃষ্টি এড়ালো না। জিগগেস করলো, কি হলো আপনার জুতোর? আমি বললাম, কোলকাতার পানির সঙ্গে রণেভঙ্গ দিয়ে এই মাত্র জুতোলীলা সাঙ্গ করলো। সে বালিশের তলা থেকে একটা পার্স বের করে টাকা গুনতে গুনতে আপন মনে উচ্চারণ করলো, ও, তাহলে এই ব্যাপার। রুমের বাইরে গিয়ে গোবিন্দের সঙ্গে নীচু গলায় আবার কি সব আলাপ করলো। তারপর ভেতরে ঢুকে আমাকে বললো, আপনার বর্ষাতিটা দিন, গোবিন্দদা একটু বাইরে থেকে আসবে। গোবিন্দের হাতে নিয়ে বর্ষাতিটা দিলো।

গোবিন্দ হাঁটা দিয়েছে, এমন সময় ডাক দিয়ে বললো, গোবিন্দদা, আরেক মিনিট দাঁড়াও। আমার কাছে এসে জানতে চাইলো, আপনার তো সিগারেট নেই। আমি বললাম, না। কি সিগারেট যেনো আপনি খান? চারমিনার। এ ছাইভস্ম কেনো যে টানেন!

সে দরোজার কাছে গিয়ে বললো, গোবিন্দদা ওখান থেকে পয়সা বাঁচিয়ে এক প্যাকেট চারমিনার সিগারেট, আরেকটা ম্যাচ আনবেন। বাথরুমে গিয়ে পা দুটো পরিষ্কার করে এসে কোনোরকমে নিজেকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলো। স্যান্ডেল না পরে যে বেরিয়ে পড়েছিলো এটা সে নিজেই খেয়াল করেনি। এই হাঁটাহাঁটি ডাকাডাকিতে নিশ্চয়ই তনুর অনেক কষ্ট হয়েছে।

সেদিন আমি ভুল দেখেছিলাম, আসলে তনু সে আগের তনু নেই। একটুকুতেই হাঁফিয়ে ওঠে। এখন সে বিছানায় পড়ে আছে শীতের নিস্তরঙ্গ নদীর মতো। কোনো চাঞ্চল্য, কোনো উচ্ছ্বাস নেই। আমার কেমন কেমন জানি লাগছিলো। খুব ম্লানকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললো, দানিয়েল ভাই, জানেন জীবনে একদিন আপনি খুব বড়ো হবেন। যেনো গলার আওয়াজটা অনেক দূর থেকেই ভেসে আসছিলো।

তার কণ্ঠস্বরে চমকে গেলাম, তথাপি রসিকতা ছাড়তে পারলাম না। বড়ো তো আর কম হইনি। এখন কেবল বুড়ো হয়ে মরে যাওয়াটাই বাকি। আপনি সবসময় কথার উল্টো অর্থ করেন। থাক আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না। এমনিতেও কথা বলতে আমার বিশেষ ভালো লাগছে না। সে হা করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। আমি বললাম, তনু আজ তোমার শরীর কি খুব খারাপ? না, না, অতো খারাপ নয়। দেখছেন না, কি নোংরা বিষ্টি। তাছাড়া আমাকে আজ আবার ইঞ্জেকশন দিয়েছে। যেদিন ইঞ্জেকশন দেয়, সেদিন খুব কষ্ট হয়। অনেকক্ষণ ধরে

দিতে হয় তো। আমি বললাম, ঠিক আছে কথা না বলে তুমি চুপ করে থাকো। সারাদিন তো চুপ করেই আছি। একবার মাত্র মাইতিদা এসেছিলেন, সেই ইঞ্জেকশন দেয়ার সময়। তারপর থেকে তো চুপ করেই আছি। একটা জনপ্রাণীর দেখা নেই। কথা বলবো কার সঙ্গে? উৎপলার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলে সময় কাটাতাম। আজ সকাল থেকে তার অসুখটা বেড়েছে। তাই তাকে ইনটেনসিব কেয়ারে নিয়ে গেছে। আজ সকালে আমাদের ওয়ার্ডের পয়তাল্লিশ নম্বরের হাসিখুশী ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। আমার যে কি খারাপ লাগছিলো! মনে হচ্ছিলো দম বন্ধ হয়ে আমিও মারা যাবো। প্রতিদিন এখানে কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। এ মৃত্যুপুরীতে আমাকে এনে আটকে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ছুটে পালিয়ে যাই। আমি বললাম, কোথায় যেতে চাও?...

তনু জবাব দিলো, যেদিকে দুচোখ যায়। হঠাৎ তনু দুহাতে আমার ডান হাতখানা ধরে বললো, আচ্ছা দানিয়েল ভাই, আপনার মনে আছে, আপনি একবার ঝড়বিষ্টিতে ভিজে ছপছপে অবস্থায় আমাদের গেন্ডারিয়ার বাড়ীতে এসেছিলেন? আমি বললাম, পথে সেকথা আমারও মনে পড়েছে। তুমি সে গানটি গেয়েছিলে, আজি ঝড়ের রাতে ...। তনু গুনগুন করে গানের কলি দুটো আবার গাইলো, আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরানসখা বন্ধু হে আমার।

জানেন দানিয়েল ভাই, গেন্ডারিয়ার বাড়ীর জন্য আমার মনটা কেমন আনচান করছে। গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি, আমাদের ময়নাটি মরে গেছে। আসার সময় কাঠব্যবসায়ী যে প্রতিবেশী আছে, তাদের বাড়ীতে রেখে এসেছিলাম। সেই অবধি মনটা কেমন হু হু করছে। এরকম বিষ্টির সময় বুড়ীগঙ্গা কেমন ফেঁপে ফুলে অস্থির হয়ে ওঠে। পানির চীৎকার শুনতে কেমন লাগে! কি চমৎকার আওয়াজ!

বাড়ীতে আমরা তিন বোন একসঙ্গে থাকতাম। একখাটে তিনজন ঘুমোতাম। দিনাজপুর থেকে মাঝে মাঝে মা আর বড়ো ভাইয়া এসে থাকতো। ছোটো ভাইটি সারাক্ষণ পাড়ায় মারামারি ঝগড়াঝাটি করে বেড়াতো। এখন জানি না কেমন আছে। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেলো। এখানে আমি পড়ে আছি। দোলা গেছে পার্টির মেয়েদের সঙ্গে নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিতে—সেই ব্যারাকপুর না কোথায়। মা দিনাজপুরে, বড়ো ভাইয়া সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। ইচ্ছে করেই তনু হেলেনের নাম মুখে আনলো না। পাছে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, এই ভয়ে।

বরাবর তো দেখে আসছি, তনুর কাছে গোটা পৃথিবী একদিকে আর হেলেন একদিকে। রেডিও কিংবা টিভিতে হেলেনের রবীন্দ্র সঙ্গীতের যেদিন প্রোগ্রাম থাকতো, সে রিকশাভাড়া খরচ করে চেনাপরিচিত সবাইকে জানিয়ে আসতো। অনুরোধ করতো, আজকে রাতের রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রামটা শুনবেন অথবা দেখবেন, আমার বোন হেলেন গান গাইবে। আর হেলেনেরও ছিলো তনু-অন্ত প্রাণ। অতো ডাগর মেয়েটি তনুকে জড়িয়ে ধরে না ঘুমোলে তার ঘুম আসতো না। তনু কাছে না বসলে তার খাওয়া হতো না। মাঝে মাঝে হেলেনের পেটে কি একটা ব্যথা উঠতো। চার পাঁচদিন ব্যথার তোড়ে বিছানায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে

থাকতো। তনুকে আর সব বাদ দিয়ে হেলেনের বিছানার পাশে হাজির থাকতে হতো।

আজ হেলেন এতো কিছু ভুলে গিয়ে প্রায় বৃদ্ধ একজন লোকের সঙ্গে কেমন করে দিনরাত কাটাচ্ছে, আমি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারিনে। তনু চোখ বন্ধ করে আছে। আমি নিশ্চিত জানি, সে হেলেনের কথা চিন্তা করছে।

গলাখাকারীর শব্দে পেছন ফিরে তাকালাম। গোবিন্দ বাইরে থেকে ফিরে এসেছে। তার হাতে একটা প্যাকেট। ডাক দিলো, এই যে দিদিমণি, নিন আপনার জিনিসপত্তর। এর মধ্যে সব আছে। আর এই নিন পাঁচ টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা ফেরত এসেছে। তনু বললো, অনেক তো কষ্ট করলে গোবিন্দদা, এই টাকাটা তুমিই রাখো। গোবিন্দের ভাঙাচোরা মুখমণ্ডলে খুশীর একটা চাপা ঢেউ খেলে গেলো। তনু আচমকা ফের জিগগেস করে বসলো, আচ্ছা গোবিন্দদা, সিগারেট এনেছো তো? গোবিন্দ চলে যেতে যেতে বললো, আজ্ঞে দিদিমণি, ওই প্যাকেটের মধ্যে সব আছে।

তনু বিছানার ওপর প্যাকেটটা উপুড় করলো। ভেতরের জিনিসপত্তর সব বেরিয়ে এলো। একটা ধুতি মাঝামাঝি দামের, একজোড়া বাটার স্যান্ডেল, সিগারেট, ম্যাচ, তার নিত্য ব্যবহার্য কি সব টুকিটাকি জিনিস।

আমার দিকে তাকিয়ে তনু একরকম হুকুমের সুরেই বললো, দানিয়েল ভাই, তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢোকেন। পরনের ওই প্যান্ট খুলে ফেলে, এই সাবানটা দিয়ে যেখানে যেখানে রাস্তার পানি লেগেছে ভালো করে রগড়ে ধুয়ে ফেলুন। এ পানির স্পর্শ বড়ো সাংঘাতিক, স্কীন ডিজিজ টিজিজ হয়ে যেতে পারে। তারপর ওই স্যান্ডেল জোড়া পরবেন। দয়া করে আপনার জুতোজোড়া ওই দিকের ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। ওটা আর কোনো কাজে আসবে না। আমি বললাম, তনু আমি যে ধুতি পরতে জানি না। এবার তনু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, আপনি এখনো খেতের কুমড়োই রয়ে গেছেন, কিছুই শেখেননি। অতো আঠারো রকমের প্যাঁচগোছ দিয়ে দরকার কি? আপনি দু'ভাঁজ দিয়ে সোজা লুঙ্গীর মতো করেই পরবেন। যান, যান, বাথরুমে ঢোকেন, অতো কথা শুনতে চাইনে। এদিকে ভিজিটিং আওয়ারের সময় ঘনিয়ে এলো।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। লুঙ্গীর বদলে ধুতি কিনে আনার মধ্যে তনুর একটা সূক্ষ্ম চালাকি ধরতে পারলাম। সে একঢিলে দু'পাখি মারতে চাইছে। একদিকে তার চেনাজানা মানুষদের মধ্যে আমার একটা গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে চাইছে, অন্যদিকে আমাকে একখানা বস্তুসামগ্রী দান করে, আমার এই যে অল্পস্বল্প খরচপাতি হলো তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করছে।

আমি ধুতিখানা লুঙ্গীর মতো করে পরে বাইরে এসে জিগগেস করলাম, এখন ভেজা প্যান্টটা রাখি কোথায়? তনু বললো, কোণার দিকে চিপেটিপে রাখুন। যাওয়ার সময় ব্যাগের ভেতর পুরে নিয়ে যাবেন।

সারা শরীর ঘষেমেজে ধুতিখানা পরে বেরিয়ে এলে তনু মুখ টিপে হেসে বললো, আয়নার সামনে গিয়ে দেখে আসুন, এখন আপনাকে কি রকম ফ্রেশ

দেখাচ্ছে। আপনার একটা কুৎসিত স্বভাব। সবসময় চেহারাখানা এমন করে রাখেন, তাকিয়ে দেখলে ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। তনু একথা আগে কম করে হলেও একশোবার বলেছে। কিন্তু আমার চেহারার কোনো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি।

আমি বললাম, তনু আমি বোধ হয় মানুষটাই কুৎসিত। আমার ভেতর কোনো সৌন্দর্য নেই, বাইরে তা ফুটিয়ে তুলবো কেমন করে? তনু আমার কথার পিঠে বললো, তাই বলে (চেহারা) চব্বিশ ঘণ্টা সাতজনে পাঁচজনে ধরে কিলিয়েছে এমন বিরস এবং গোমড়া করে রাখতে হবে, তারও কি কোনো অর্থ আছে? সব মানুষেরই এক ধরনের দুঃখ আছে, তাই বলে দিনরাত তার একটা নোটিশ নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে নাকি? এই যে আমাকে দেখছেন, আমার দুঃখের কি অন্ত আছে, কিন্তু বেশ তো আছি... যাক, এই পর্যন্ত বলে তনু থেমে গেলো।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে একজন সিরিয়স রোগীর সঙ্গে কথা বলছি। আসলে আমি কথা কাটাকাটি করছি বুড়ীগঙ্গার পাড়ের গেন্ডারিয়ার বাসার তনুর সঙ্গে। সে তনু আর এ তনু যে এক নয়, একথা বারবার ভুলে যাই। গেন্ডারিয়ার বাসায় ভাইবোন পরিবেষ্টিত তনুর যে রূপ বর্তমানের সঙ্গে তার কি কোনো তুলনা করা যায়! হাসপাতালের তনু বড়োজোর গেন্ডারিয়ার তনুর একটা দূরবর্তী প্রতিধ্বনি—একটা ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

গেন্ডারিয়ার বাড়ীতে তনুকে যে দেখেনি সে কখনো তনুর আসল স্বরূপ ধরতে পারবে না। খাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, রাঁধছে বাড়ছে, বোনদের কলেজে পাঠাচ্ছে, আসতে দেরী হলে তত্ত্বতালাশ করছে, নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে—সর্বত্র একটা ঘূর্ণি হাওয়ার বেগ জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কখনো খলখল হাসিতে অপরূপা লাস্যময়ী, কখনো দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ছে, একে ধমক দিচ্ছে, ওকে শাসাচ্ছে, সদা চঞ্চল, সদা প্রাণবন্ত। আবার যখন চুপচাপ গম্ভীর থাকে, তাকে মনে হয় সম্পূর্ণ ধরাছোঁয়ার বাইরে... অনেক দূরের মানবী। যে দিকেই যায়, বাঁধ ভেঙে যায়। কোনো শাসন বারণ মানে না, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দু'বাহু বাড়িয়ে এক জায়গায় আটকে রাখে কার সাধ্য! চেষ্টা যে করিনি তা নয়। প্রতিবারই প্রচণ্ড আঘাত করে নিজের গতিবেগে ছুটে গেছে। আবার যখন তাকে ছেড়েছুঁড়ে আসতে চেষ্টা করেছি, সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে কাছে টেনে নিয়েছে।

সে যখন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আকাশের তারকারাজি কিংবা বুড়ীগঙ্গাতে ভাসমান নৌকার রাঙ্গা রাঙ্গা পালগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো, তাকে তারকার মতো সুদূর এবং রহস্যময়, নদীতে চলমান নৌকার রাঙ্গাপালের সুতোর একটা প্রতীক মাত্র মনে হতো। যেনো কারো কোনো রকমের বন্ধনে ধরা দেয়ার জন্য সে পৃথিবীতে আসেনি। তনুর অনেক ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমি এসেছি। কতোদিন, কতোরাত্রি তার সঙ্গে আমার কেটেছে। এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবেরা অনেক বিশ্রী ইঙ্গিতও করেছে। তনুর পার্টির লোকেরা কম হ্যাঙ্গামহুজ্জত করেনি।

এমনকি তার অভিভাবকদের মনেও এ ধারণা জন্মানো বিচিত্র নয় যে আমি তনুকে গুণ করেছি।

আমি কিন্তু তনুকে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আমার। তনুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরনটা কি, অনেক চিন্তা করেও নির্ণয় করতে সক্ষম হইনি। হাসপাতালের শয্যায় সে শুয়ে আছে। চোখ দুটো সম্পূর্ণ বোজা। নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নাকের দুপাশটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার ডান হাতটা আমার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে। এই যে গভীর স্পর্শ লাভ করছি তাতে আমার প্রাণের তন্ত্রীগুলো সোনার বীণার মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। এই স্পর্শ দিয়ে, যদি পারতাম তার সমস্ত রোগবালাই আমার আপন শরীরে শুঁষে টেনে নিতাম। তার জন্য আমার সবকিছু এমন অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার এই যে সরল সহজ ইচ্ছে—এটাকে কি প্রেম বলা যায়? যদি তাই হয়, আমি তনুর প্রেমে পড়েছি।

দানিয়েল ভাই, কথা বললো তনু। তার চোখ দুটো এখনো বোজা। কণ্ঠস্বরটা খুবই ক্ষীণ, যেনো স্বপ্নের ভেতরে তার চেতনা ভাষা পেতে চেষ্টা করছে। আমি তার দুটো হাতই টেনে নিলাম। দানিয়েল ভাই—আবার ডাকলো তনু। এবার তার কণ্ঠস্বরটি অধিকতরো স্পষ্ট। আমি বললাম, তনু বলো। সে চোখ দুটো খুললো, শরীর খুঁটে মুছে নিলো। তারপর ধীরে, অতি ধীরে উচ্চারণ করলো, এবার যদি বেঁচে যাই তাহলে নিজের জন্য বাঁচার চেষ্টা করবো।

আমার বুকটা কেঁপে গেলো। তথাপি বললাম, যদি বেঁচে যাই বলছো কেনো? দানিয়েল ভাই, আমার অসুখটি এতো সোজা নয়। আপনি ঠিক বুঝবেন না, সে আমার হৃদপিণ্ডের ওপর তাক করে বসে আছে। সুযোগ পেলেই বোঁটাশুদ্ধ আস্ত হৃদপিণ্ডটি ছিঁড়ে নেবে। আমি বললাম, ছি ছি তনু, কি সব বলছো। দানিয়েল ভাই, এই মুহূর্তটিতে একমাত্র এই কথাটিই আমার সব চাইতে সত্য মনে হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে সারা জীবন আলেয়ার পিছনে ছুটেছি। তাই আমার কোথাও যাওয়া হয়নি। আর সকলে নিজের নিজের সুবিধেজনক জায়গাটি বেছে নিয়েছে। তারা হয়তো দুঃখ পাবে, হয়তো সুখ পাবে জীবনে। তবু সকলে নিজের নিজের জীবন যাপন করে থাকে। আমি যেনো স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই জীবনটা কাটালাম। প্রতিটি মানুষ একটা জীবন নিয়েই জন্মায়। সে জীবনটাই সবাইকে কাটাতে হয়। জীবনযাপনের হিসেবে যদি ফাঁকি থাকে, জীবন ক্ষমা করে না।

ডাক্তারেরা যাই বলুক, আমি তো জানি, আমার অসুখের মূল কারণটা কি। একসময় আমার একটা অভিমান ছিলো, আমি অনেক কিছু ধরে রাখতে পারি। চোখের লোনা অশ্রুতে অভিমান আমার ঘুচেছে। কাকে ধরে রাখতে পারলাম, বলুন? চোখের সামনেই তো সবকিছু ছত্রখান হয়ে গেলো। আমার মা কোথায়, ভাইবোনেরা কোথায়, এখানে আমি নিতান্ত একাকী নিজের রক্তের বিষে প্রতিদিন একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। তার চোখের দু'কোণায় দু'ফোঁটা পানি দেখা দিলো। আমি আপন হাত দিয়ে মুছিয়ে দিলাম।

তনু বললো, জানেন দানিয়েল ভাই, আমি আগে চিন্তা করতে ঘৃণা করতাম। এখন নানারকম চিন্তা আমার মাথায় ভর করে। মানুষ মরলে কোথায় যায়, মাঝে মাঝে সে চিন্তাও আমার মনে উদয় হয়। উৎপলা বলেছে মানুষ মরলে তার আত্মা পাখি হয়ে যায়। এই যে আরতিদি বলেন, একজন্মে তো মানুষের শেষ নয়, তাকে বারবার জন্মাতে হয়। কথাটি সত্যি নাকি? যদি সত্যি হয়, তাহলে খুবই ভালো।

আগামীবারে আমি একজন অতি সাধারণ স্বার্থপর মেয়ে হয়েই জন্মাতে চাই। ঢোলাজামা পরা বড়োলোকদের বড়ো বড়ো কথায় একটুও কান দেবো না। আমি পেটুকের মতো বাঁচবো। খাবো, পরবো, সংসার করবো—আমার ছেলেমেয়ে হবে। সে সংসারের মধ্যেই আমি নিজেকে জড়িয়ে রাখবো। কখনো গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াবো না।

তনুর এ সকল কথা শুনতে আমার একটুকুও ভালো লাগছিলো না। বরাবরই জেনে এসেছি সে বড়ো শক্ত মেয়ে। কখনো তাকে এরকম দেখিনি। এ কোন তনু, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি! জোর দিয়ে বলতে চাইলাম, তনু তোমার ঢের জীবন এখনো সামনে পড়ে আছে। যেভাবে ইচ্ছে কাটাতে পারবে। কিন্তু আমার কথাগুলো নিজের কানেই বিদ্রূপের মতো শোনালো।

তনু বললো, না দানিয়েল ভাই, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেলো না। আপনি মিনমিনে হলে কি হবে, বড়ো বেশী একরোখা এবং গোঁয়ার। নিজে যা সত্য মনে করেন, তা সকলের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। সেজন্যই তো ভয় হয়, আপনার কপালেও অনেক দুঃখ আছে। আমার শরীরের খবর আমার চাইতে কি আপনি বেশী জানেন?

আমি বললাম, তনু তোমার অসুখটা কি ধরনের? সে বললো, অসুখের আবার ধরন কি—অসুখ অসুখই। তবু একটা ডাক্তারী নাম তো আছে। সেটা আমাকে বিরক্ত না করে ডাক্তারের কাছেই জিগগেস করুন না কেনো? আমি বললাম, ড. মাইতির কাছে আমি গতকাল জানতে চেয়েছিলাম তোমার কি অসুখ। উল্টো তিনিই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার অসুখটা কি জানি নাকি? আপনি গিয়ে ড. মাইতির সঙ্গে বোঝাপড়া করুন—বিরক্ত হয়ে তনু বিছানার ওপর শরীরটা ছেড়ে দিলো।

ড. মাইতি আবার কি করলো, হে? হাতে স্টেথেসকোপ দোলাতে দোলাতে ড. মাইতি প্রবেশ করলেন। আমার দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিন, একটু শেকহ্যান্ড করি। এ ঘোরতরো বিষ্টির মধ্যে চলে আসতে পেরেছেন! বা সোজা মানুষ তো নন আপনি। শেকহ্যান্ড করে আমি বললাম, চলে এসে কি আপনার রোগীর অনিষ্ট করলাম? নিশ্চয়ই আপনি গতকালকের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। আমি হাসলাম। তারপর তনুর দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, গিলে ফেলেছ না গিলতে এখনো বাকী আছে? মাইতিদা, সেকথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এতোক্ষণ দানিয়েল ভাইতে আমাতে ঝগড়া চলছিলো। মাইতি বললেন, ঝগড়ার বিষয়বস্তু কি সেকথা আগে বলো। বা রে, ঝগড়ার আবার বিষয়বস্তু থাকে নাকি! ওহো, বিষয়বস্তু ছাড়া ঝগড়া হতেই পারে না!

ওসব কথা এখন রাখো। ওয়ার্ডে ড. ভট্টাচার্যির পা দেয়ার আগে তোমার বায়না করে আনা ওই ভাতমাছ তাড়াতাড়ি গিলে ফেলো। উনি এসে পড়লে একটা অনর্থ বাঁধাবেন। হঠাৎ আমার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে চোখ পড়তেই ড. মাইতির চোখজোড়া কৌতুকে ঝিকমিকিয়ে উঠলো। বাহ, দানিয়েল সাহেব আজ নতুন ধুতি পরেছেন যে!

আমি একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আসলে আমি সেই বৌবাজার থেকে এককোমর পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে এসেছি তো। তিনি জিগগেস করলেন, এই ঘোলাজলের সবটুকু পথ আপনি কি নিজের পায়ে হেঁটে এসেছেন? আমি মাথা দোলালাম। তিনি অবাক হয়ে বললেন, আচ্ছা মানুষ তো! তারপর আমি কৈফিয়তের সুরে বললাম, এখানে এসে দেখি প্যান্টটা ময়লায় ভরে গেছে, আর পা থেকে জুতো খসাতেই সোলজোড়া ঝরে গেলো। তনু টাকা দিয়ে আপনাদের হাসপাতালের গোবিন্দকে দোকানে পাঠিয়ে এই ধুতি আর স্যান্ডেলজোড়া কিনে এনেছে।

তাহলে দিদিমণির দানদক্ষিণে করারও অভ্যাস আছে। বাহ, বেশ বেশ। তার প্রতি কথাতেই লজ্জা পাচ্ছিলাম আর অপ্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমি আরো লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই বলে বসলাম, প্যাঁচগোচ দিয়ে পরতে জানিনে। তাই দু'ভাঁজ করে লুঙ্গীর মতো পরেছি।

ঠিক আছে, খুবই ভালো করেছেন। আজ হাসপাতাল থেকে যাওয়ার পথে আমার কোয়ার্টারে যাবেন। আপনাকে ধুতি পরা শিখিয়ে দেবো, এ সুযোগে আপনার সঙ্গে একটু গপ্পোটপ্পোও করা যাবে। অ্যাঁ, কি বলেন? আমি বললাম, আপনার কোয়ার্টার কোথায় আমি চিনিনে। কি করে যাবো?

আরে মশায়, একটু ধৈর্য ধরুন, অতো উতলা হচ্ছেন কেনো? প্রথমে আমি চিনিয়ে দেবো, তারপর তো চিনবেন। ওই যে হাসপাতালের গেট দেখছেন, তার অপজিটে যে লাল দালানগুলো দেখবেন, তার একটার দোতলাতে আমি থাকি। নম্বরটা মনে রাখবেন, একুশের বি। এদিক ওদিক না তাকিয়ে সরাসরি দোতলায় উঠে কলিং বেল টিপবেন। আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকবো। কি চিনতে পারবেন তো? আমি বললাম, মনে হচ্ছে পারবো। মনে হচ্ছে কেনো, আপনাকে পারতেই হবে। এটুকু যদি না পারেন কর্পোরেশনের লোকদের লিখবো যেনো আপনাকে শহর থেকে বের করে দেয়। তারপর তিনি বললেন, তনু তুমি খেতে আরম্ভ করো। এই আমি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। ড. ভট্টাচার্যি কিংবা কেউ যদি এসে পড়েন, আমি হাততালি দেবো। অমনি তুমি সব লুকিয়ে ফেলে বাথরুমে ঢুকে পড়বে। হাতমুখ ধুয়ে তারপর এসে দেখা দেবে। দানিয়েল সাহেব যান, জলটল ঢালতে সাহায্য করুন।

আমি একটা প্লেট ধুয়ে দিলে তনু মিটসেফ থেকে ব্যাগটা টেনে নিলো। তারপর বাটিটা বের করলো। ভাতগুলো প্লেটে নিয়ে অন্য বাটিটা থেকে কিছুটা মাছের তরকারী ঢেলে নিলো। তার মুখে একটা খুশী খুশী ভাব। জানেন, দানিয়েল

ভাই, কতোদিন পর আজ ভাত মুখে দিতে যাচ্ছি। আমি বললাম, গতকাল তুমি বলেছিলে এক মাস। হাঁ, সেরকম হবে। ও একগ্রাস ভাত মুখে দিলো। তারপর আরেকটা গ্রাস। এমনি করে করে ক'টা গ্রাস মুখে দিয়ে সে প্লেটের ওপর হাতখানা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

আমি বললাম, চুপ করে অমন হাত ঠেকিয়ে আছো, খাচ্ছো না কেনো? না, খাবো না, ও খাবার কি মানুষে খায়? কি রকম বিশ্রী রান্না, মুখটা তেতো হয়ে গেলো। আহ, মাইতিদা। ড. মাইতি ভেতরে ঢুকলেন, কি হলো তনু, ভাত খেতে চাইছিলে, খাও। খেতে যে পারছিনে, সব তেতো লাগে। তার আমি কি জানি? তেল মশলা ছাড়া শুধু হলুদের রান্না আপনি খেতে পারবেন, দানিয়েল ভাই? মাছগুলো ভাজা করে আনতে পারলেন না? আপনি কিছুই বোঝেন না। আমি বললাম, ঠিক আছে আগমীকাল মাছ ভেজে এনে দেবো। হাঁ, তাই দেবেন। তনু হাত ধুয়ে ফেললো।

ড. মাইতি বললেন, আপনার মাছভাত বিজনেস এখানেই শেষ। এরপরেও ও সকল জিনিস এ রুমে যদি আসে আমাকে আপনার হাসপাতালে আসাটাই বন্ধ করতে হয়। তনু চুপচাপ থাকলো। আমার ধারণা হলো ড. মাইতির ব্যবস্থাটাই সে মেনে নিয়েছে। ড. মাইতি আমাকে বললেন, এক কাজ করুন, এই ভাতমাছ যা আছে সব বাটির ভেতর ভরে এধারের ডাস্টবিনটায় ফেলে দিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি। আমি বাক্যব্যয় না করে তার নির্দেশ পালন করলাম। বাটি প্লেট সব ধুয়ে নেয়ার পর ড. মাইতি বললেন, এবার আমি চলি, দানিয়েল সাহেব। মনে থাকে যেনো সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার সময়। আমি বললাম, থাকবে।

উনি চলে গেলে আমি তনুকে বললাম, ড. মাইতি সাড়ে সাতটার সময় তার কোয়ার্টারে যেতে বলেছেন, যাবো? অবশ্যই যাবেন। তিনি আর দীপেনদা আমার জন্য যা করেছেন, দেশের মানুষ, আত্মীয়স্বজন, তার এক ছটাক, এক কাচ্চাও করেনি। জানতে চাইলাম, দীপেনদাটি কে?

তনু বললো, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই তো চেষ্টা-তদবির করে আমাকে এ হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। আপনি চিনবেন কি করে? আপনারা সব নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমি মারা গেলাম, বেঁচে রইলাম, তাতে আপনাদের কিছু এসে যায়? আমি কোনো জবাব দিলাম না। তনুর অনেক রাগ, অনেক অভিমান। তাকে ঘাটিয়ে কাজ নেই। অনাবশ্যক রাগারাগি করে শুধু অসুখটা বাড়িয়ে তুলবে। এখন তো প্রায় ছটা বাজে। তোমার ডাক্তার আসবে। আজ আমি আসি।

সে আমার হাত ধরে বললো, কাল আবার আসবেন তো? আমি বললাম, আসবো। প্যান্ট আর বাটিসহ ব্যাগটা নিয়ে যাই। বাটি ব্যাগ নিয়ে যান। প্যান্টটা নিয়ে এখন আর কাজ নেই। নতুন একটা বাসায় যাচ্ছেন। আমি কাল গোবিন্দকে দিয়ে লন্ড্রীতে পাঠিয়ে দেবো। বরং ব্যাগ বাটি এসবও রেখে যান। কাল নিয়ে যাবেন।

পাঁচ

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখলাম মাত্র সোয়া ছয়টা। ড. মাইতির কোয়ার্টারে সাত থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে যে কোনো সময়ে গেলে চলবে। আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। সেই আড়াইটার সময় বেরিয়ে এতোটা পথ হেঁটে এসেছি। তারপর এতোক্ষণ সময় কাটালাম, পেটে কিছু পড়েনি। সারাটা সময় একরকম ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলেই ছিলাম। একটা খাবার দোকানের তালাশ করতে লাগলাম। এদিকে দোকানপাটের সংখ্যা তেমন ঘন নয়। তাই বাঁক ঘুরে ভবানীপুর রোডে এলাম। একটা সুবিধেজনক খাবার ঘরের সন্ধান করতে করতে হাজরা রোডের মোড়ের কাছাকাছি চলে এলাম। যে দোকানেই যাই প্রচণ্ড ভীড়। ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে আমার কেমন জানি প্রবৃত্তি হচ্ছিলো না। নিশীতে পাওয়া মানুষের মতো পথ হাঁটছি। অবশ্য বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ আগেই বিষ্টি ধরে গেছে।

এদিকটাতে রাস্তাঘাটের অবস্থা একেবারে খটখটে শুকনো। কোলকাতার টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড আকাশে ঝাঁক ঝাঁক তারা জ্বলছে। দুপাশের দোকানপাটে ধুমধাম বেচাকেনা হচ্ছে। ড্যাগর ড্যাগর করে ট্রাম ছুটছে, বাস, লরী এসব যন্ত্রযানের হর্ন বাজছে। মানুষের স্রোত তো আছেই। তারা যেনো অনাদিকাল থেকেই শহর কোলকাতার ফুটপাথ দিয়ে উজানভাটি দু'পথে ক্রমাগত প্রবাহিত হচ্ছে। মোড়ের একটা স্যান্ডউইচের দোকানে গিয়ে দু'খানা প্যাটিস আর ঢকঢক করে পানি খেয়ে ড. মাইতির কোয়ার্টারের উদ্দেশে হাঁটতে থাকলাম। কোনদিকে যাচ্ছি খেয়াল নেই। শুধু পা দুটো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোলকাতা আসার পর থেকে পায়ের চোখ ফুটে গেছে।

সাতটার ওপরে বোধ করি কয়েক মিনিট হবে। আমি ড. মাইতির কোয়ার্টারে এসে বেল টিপলাম। একটা ছোকরা চাকর দরোজা খুলে দিয়ে জানতে চাইলো, কাকে চান? আমি বললাম, ড. মাইতি আছেন? আছেন, আপনি ভেতরে আসুন। আমি ভেতরে প্রবেশ করে একটা বেতের সোফায় বসে সিগারেট জ্বালালাম।

ড. মাইতির বসবার ঘরে তেমন আসবাবপত্তরের বাহুল্য নেই। কয়েকটা বেতের সোফা, মাঝখানে একখানি গোল বেতের টেবিল। টেবিলের ওপর পাতা চাদরটি খুবই সুন্দর। একধরনের চাদর খাটের ওপরও পাতা দেখলাম। ওপাশে গুটানো একটি ক্যাম্পখাট দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে। দেয়ালে একজোড়া বুড়োবুড়ীর ছবি টাঙ্গানো। বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, ড. মাইতির মা-বাবা। তাছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের একটা বড়ো আকারের ছবি। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ঔষুধ কোম্পানীর দুটো ক্যালেন্ডার উত্তর-দক্ষিণের দেয়ালে পরস্পরের দিকে মুখ করে ঝুলছে। এছাড়া আরেকটি এনলার্জ করা গ্রুপ ফটো আছে। গাউনপরা একদল যুবকের ছবি। একটুখানি চিন্তা করলেই মনে পড়ে যাবে মেডিক্যাল কলেজের সার্টিফিকেট গ্রহণ

করার সময় ও ছবি ওঠানো হয়েছিলো। একেবারে কোণার দিকে হাতাঅলা একটি চেয়ার এবং সামনে মাঝারি ধরনের একখানি টেবিল।

ড. মাইতি জিগগেস করলেন, চিনতে অসুবিধে হয়নি তো? আমি বললাম, না। তিনি ডাক দিলেন, অনাথ। আগের সে ছেলেটি এসে দাঁড়ালে বললেন, চা দাও। আর শোনো, এই বাবু আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন এবং রাত্তিরে এখানে থাকবেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তার স্বাভাবিক কৌতুকমিশ্রিত স্বরে বললেন, দেখলেন তো কেমন বাড়ীতে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করে ফেললাম। সহসা আমার মুখে কোনো উত্তর যোগালো না। তিনি ফের জিগগেস করলেন, আপনার কি তেমন কোনো জরুরী কাজ আছে, আজ রাত্তিরে এখানে থাকলে বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে? জবাব দিলাম, না, তেমন কোনো কাজ নেই।

আপনার কি আজ রাতটা আমার সঙ্গে গল্প করে কাটাতে কোনো আপত্তি আছে? বা রে, আপত্তি থাকবে কেনো, আমাদের এখন যে অবস্থা কে আমাদের খবর নেয়? দানিয়েল সাহেব, এভাবে কথা বলবেন না। আপনারা একটি মুক্তিসংগ্রাম করছেন। আমি ডাক্তার মানুষ, বেশী খোঁজখবর রাখতে পারিনে। তবু তনুকে দেখতে হাসপাতালে যেসব ছেলে আসে, তাদের অনেকের মধ্যে দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং অদম্য মনোবল আমি লক্ষ্য করেছি। আপনাদের গোটা জাতি যে ত্যাগতিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

মানবচরিত্রের সবচাইতে যা মহত্তম সম্পদ তা আপনার দেশের অনেক যুবকের মধ্যেই বিকশিত অবস্থায় দেখেছি। মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি ভারতীয় নাগরিক। আমি কখনো বাংলা দেশে যাইনি। পুরুষানুক্রমে আমরা পশ্চিমবাংলার অধিবাসী। পদ্মার সে পাড়ের মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক কখনো ছিলো না। কিন্তু আপনার দেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নিজের মধ্যেই একটা পরিবর্তন অনুভব করছি। একদিনে সে পরিবর্তন আসেনি। ক্রমাগত মনে হচ্ছে আমি নিজেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটা অংশ। আমার ভারতীয় সত্তা এবং বাঙ্গালী সত্তা পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন বাঙ্গালী বলে ভাবতে আমার অনেক অহঙ্কার হয়। আপনার দেশ যুদ্ধে না নামলে এ উপলব্ধি আমার কখনো জন্মাতো কিনা সন্দেহ। কথাগুলো লিটারেল অর্থে ধরে নেবেন না। এটা জাস্ট একটা ফিলিংয়ের ব্যাপার।

আমি বললাম, বাংলা এবং বাঙ্গালিত্বের প্রতি পশ্চিম বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের একটা অতুলনীয় সহানুভূতি এবং জাগ্রত মমত্ববোধ আছে বলেই এখনো বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা শিরদাঁড়া উঁচু করে থাকতে পেরেছে। পশ্চিম বাংলার বদলে যদি গুজরাট কিংবা পাঞ্জাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হতো, ভারত সরকার যতো সাহায্যই করুন না কেনো সংগ্রামের অবস্থা এখন যা দেখছেন, তার চাইতে অনেক খারাপ হতো। পশ্চিম বাংলার মানুষের প্রাণের আবেগ, উত্তাপ, ভালোবাসা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সজীব এবং প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

চা দিয়ে গেলো। ড. মাইতি জিগগেস করলেন, আপনার কাপে ক'চামচ চিনি এবং দুধ দেবো বলুন। বললাম, আমি দুধ খাইনে, দু'চামচ কি আড়াই চামচ চিনি দেবেন। হো হো করে হেসে উঠলেন ড. মাইতি। একটা বিষয়ে দেখছি আপনার সঙ্গে আমার চমৎকার মিল আছে, আমিও দুধ খাইনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আমি মূর্খ মানুষ। প্রোফেশনের বাইরে গেলেই নাচার হয়ে পড়ি। আপনার মতো একজন স্কলার মানুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবো মশায়, সাবজেক্ট খুঁজে পাচ্ছিনে। আবার সেই হো হো হাসি। আমি বললাম, আপনিও তাহলে তনুর সেকথা বিশ্বেস করে আছেন। আমি এসএসসি থেকে এমএ পর্যন্ত সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছি। আসলে এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। জীবনে কোনো পরীক্ষাতে কোনোদিন বিশের মধ্যে থাকার ভাগ্যও আমার হয়নি। যাদেরকে চেনেজানে, তাদের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলাই তনুর স্বভাব। আমার ব্যাপারে মাত্রা এতোদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলো যে শুনে আমার কান পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিলো। এ নিয়ে তার সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে।

আপনার ব্যাপারে তার একটা লাগামছাড়া উচ্ছ্বাস এরই মধ্যে লক্ষ্য করে ফেলেছি। আপনাকে বিরাট স্কলার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, আপনি জুতো প্যান্ট ভিজিয়ে এসেছেন বলে বাজার থেকে তুমুল বিষ্টির মধ্যে লোক পাঠিয়ে সে সব কিনে আনে—এগুলো বাড়াবাড়ি নয় কি একজন রোগীর পক্ষে? আসলে আপনাদের সম্পর্কটা কিরকম? এ আপনার নেহায়েত ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি জবাব না দিন, আমি কিছুই মনে করবো না।

আমি বললাম, ড. মাইতি, জবাব দেবো না কেনো? তনুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরনটা আমি নিজেও ভালো করে জানিনে। আমার বিশ্বেস সে আমাকে করুণা করে। এই যুদ্ধ না লাগলে, বিশেষত এই অসুখটা না বাঁধালে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হতো কিনা সন্দেহ। সে থাকতো তার পার্টির কাজকর্ম নিয়ে। আমি আমার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

তিনি ফের জানতে চাইলেন, আপনাদের মধ্যে একটা হৃদয়গত সম্পর্ক আছে এবং সেটা গভীর সম্পর্ক, একথা কি আপনি অস্বীকার করবেন? ড. মাইতি, এ বিষয়টা নিয়ে আমি নিজেও চিন্তা করেছি অনেক। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে একটা গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে, না কিছুই নেই। সকালবেলার শিশির লাগা মাকড়সার জাল যেমন বেলা বাড়লে অদৃশ্য হয়ে যায়, ও তো অনেকটা সে রকম। সে তার পার্টি ছাড়তে পারবে না, তার অস্তিত্বের সবটাই পার্টির মধ্যে প্রোথিত। আর আমার চরিত্র কোনো পার্টির সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযুক্ত নয়। বলতে পারেন আমি খাপছাড়া ধরনের বেয়াড়া মানুষ। সে তারটা ছাড়তে পারবে না, আমি আমারটা। হৃদয়গত একটা গভীর সম্পর্ক কেমন করে থাকে, আমি তা তো বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারিনে ড. মাইতি।

আপনি কি রাজনীতিকে ঘৃণা করেন, দানিয়েল সাহেব? জবাবে বললাম, আমি ঘৃণা করিনে, রাজনীতির তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি নিজেকে মেলাতে

পারিনে। ড. মাইতি টেবিলে টোকা নিয়ে বললেন, এমনিতে আমি সিগারেট খাইনে। কিন্তু আপনার কথা শুনে একটা সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে। একটা চারমিনার জ্বালিয়ে টান দিয়ে খকখক করে কেশে ফেললেন। মশায় আপনি বেশ দুর্বোধ্য ধরনের মানুষ। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। হয়তো তাই, সব মানুষই একটা না একটা দিকে দুর্বোধ্য। আমরা খেয়াল করে দেখিনে।

ওসব গভীর কথা রাখুন। আপনাকে একটা সিম্পল প্রশ্ন জিগগেস করি, ইচ্ছে করলে আপনি জবাব নাও দিতে পারেন। আমি বললাম, নিশ্চয়ই জবাব দিবো, বলুন আপনার প্রশ্নটা। তনুকে ছাড়া আর কোনো নারীকে তার সঙ্গে পরিচয়ের পর ভালোবেসেছেন? না, তা হয়ে ওঠেনি। কেনো বলুন তো? হয়তো পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি বলেই।

অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা কখনো আপনার মনে এসেছে? না তাও আসেনি। ড. মাইতি বললেন, আচ্ছা মেনে নিলাম, অন্য কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ার কথা চিন্তা করতে পারেননি। কিন্তু বিয়েটিয়ে করার ব্যাপারে কখনো সিরিয়াস হয়েছেন? আমি বললাম, না, তাও হইনি। আত্মীয়স্বজন চাপ দিয়েছে বটে, আমি এড়িয়ে গেছি।

আপনি একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক, আপনার কোনো খারাপ অসুখ টসুখ নেই তো। কিছু মনে করবেন না। আমি একজন ডাক্তার, ডাক্তারের মতোই প্রশ্ন করছি। বললাম, বোধ করি তাও নেই। আপনার বয়েসের অন্য দশটি যুবক যা ভাবে, আপনি তা ভাবেন না কেনো? আমি বললাম, তা তো জানিনে, ও নিয়ে কখনো স্থির মস্তিষ্কে চিন্তাভাবনা করে দেখিনি।

ড. মাইতি বললেন, এবার আমার কথা বলি। আপনি দয়া করে একটু শুনবেন কি? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনি বলুন। তাহলে শুনুন, প্লেন এ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ। তনুর প্রতি আপনার মনের অবচেতনে গভীর ভালোবাসা রয়েছে বলে অন্য মেয়েকে ভালোবাসা কিংবা বিয়ে করার কথা চিন্তাও করতে পারেননি। তার দিক থেকে হোক, আপনার দিক থেকে হোক, বাস্তব অসুবিধে ছিলো অনেক, সেগুলো ডিঙ্গোবার কথাও ভাবতে পারেননি। আমি বললাম, নদীতে বাঁধ দেয়ার কথা বলা যায়, কেননা নদীতে বাঁধ দেয়া যায়। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে বাঁধ দিতে বলা হাস্যকর নয় কি? এটাও অনেকটা সে ধরনের ব্যাপার।

ড. মাইতি বললেন, তনু এ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে প্রায় একমাস হয়। আপনি তো মাত্র গতকাল থেকেই দর্শন দিচ্ছেন। এ একমাসে ডাক্তার হিসেবে তার সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে এসে ধরে পড়লেন, বাংলাদেশের একজন রোগীকে ভর্তি করতেই হবে। ড. ভট্টাচার্যি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। কারণ হাসপাতালে খালি বেড ছিলো না। শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধেই ড. ভট্টাচার্যি রাজী হলেন।

মেয়েটাকে প্রথম দেখেই আমার কেমন জানি অন্যরকম মনে হয়েছিলো। এক মাস খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়, তবু এসময়ের মধ্যে তাকে নানাভাবে জানার

সুযোগ আমার হয়েছে সত্যি বলতে কি এরকম স্বার্থবোধবর্জিত মেয়ে একটিও আমি দেখিনি। আমি বললাম, আমিও দেখিনি। ড. মাইতি বললেন, এ ব্যাপারেও দেখছি আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের কোনো গরমিল নেই। সে যাক, শুনুন, তনুকে দেখতে হাসপাতালে নানা রকমের মানুষ আসে। তার যতো কমপ্লেনই থাকুক, সকলের সঙ্গে যথাসম্ভব প্রাণখোলা কথাবার্তা বলে, হাসে, ঠাট্টা করে। কারো কাছ থেকে কিছু দাবী করতে দেখিনি। একমাত্র আপনার কাছেই ভাতমাছ রান্না করে আনার দাবী করতে দেখলাম। আপনার কথা প্রায় প্রতিদিন আমাকে বলেছে। তবু আপনি যখন এলেন, দেখলাম আপনার সঙ্গেই ঝগড়া করছে। এ থেকে হয়তো আমি ধরে নেই যে তনু আপনাকে প্রাণের গভীর থেকে ভালোবাসে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, তারপর হাসতে চেষ্টা করলাম। হয়তো হবেও বা। ধন্যবাদ। ফুলচন্দন পড়ুক আপনার মুখে, ড. মাইতি।

আপনি মশায় চমৎকার কথা বলতে জানেন। তো কথা বলে ফসকে যাবেন, তেমন সুযোগ আপনাকে দিচ্ছিনে। আপনি কি ভাবছেন, বাড়ীতে শুধু শুধুই ডেকে এনেছি? আপনার সঙ্গে আমার মস্ত দরকার। যাক ড. মাইতি, আপনি আমার কাছে আমার নিজের মূল্যটা অনেকগুণে বাড়িয়ে দিলেন। কোলকাতা আসা অবধি কেউ আমাকে বলেনি, আমার সঙ্গে কারো দরকার আছে। নিজের দরকারেই সকলের কাছে সকালসন্ধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা বলুন, আপনার দরকারটা কি? শুনে হৃদয় ঠাণ্ডা করি।

মশায় অতো রাগ কেনো। শুনবেন শুনবেন, অতো তাড়াহুড়ো কিসের? আগে রাতের খাবারটা খান। এখন তো সবে ন'টা বাজে। তারপর ডাক দিলেন, অনাথ। সে ছেলেটি এসে দাঁড়ালো, বাবু! খাবার হয়েছে রে? বাবু, একটু দেরী হবে। যা, তাড়াতাড়ি করতে চেষ্টা কর।

আমি জিগগেস করলাম, ড. মাইতি কোয়ার্টারে আপনি একাই থাকেন? একা মানুষ, একাই তো থাকবো। আপনি বিয়ে করেননি? না মশায়, সে ফাঁদে আজো পা দেইনি। আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন? ভালোবাসাটাসা আমাকে দিয়ে পোষাবে না, দানিয়েল সাহেব। হঠাৎ করে কাউকে বিয়ে করে বসবো। এখনো করেননি কেনো?

প্লেন এ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ হলো, এখনো সবগুলো বোনের বিয়ে দেয়া হয়নি। আপনি আর কোনো প্রশ্ন জিগগেস করবেন না। আপনাকে আমার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে নেমন্তন্ন করে এনেছি। আপনি যদি আমার কথা শুনতে চান, ডাকবেন, আমি গিয়ে সব কথা বলে আসবো। আমি বললাম, ড. মাইতি, আমাদের থাকার জায়গা নেই, আপনাকে ডাকবো কোথায়?

তিনি বললেন, যখন আপনার দেশ স্বাধীন হবে, তখন ডাকবেন। সব কথা জানিয়ে আসবো আর আপনার দেশটাও দেখে আসবো। আচ্ছা, বাই দা বাই, আপনি তনুর ভাইবোন, মা এরা সব কোথায় আছে বলতে পারেন? আমি বললাম, তনুর ইমিডিয়েট একটা বোনের বিয়ে হয়েছিলো, সেটি ছাড়া আর মোটামুটি

সকলের সংবাদ পেয়েছি তনুর ছোটো ভাইটি ঢাকায়। বড়ো ভাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। মা আছেন দিনাজপুরে। আর তারা তিন বোন কোলকাতায় এসেছে। এক বোন ব্যারাকপুরে না কোথায় পার্টির মেয়েদের সঙ্গে নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিচ্ছে। সব চাইতে ছোটো বোনটা এখানে কোলকাতায় এসে এক্সিডেন্ট করে বসে আছে।

কি নাম বলুন তো, দানিয়েল সাহেব, আই থিঙ্ক আই নো হার। আমি বললাম, হেলেন। ড. মাইতি বললেন, হেলেন তো একজন বুড়োমতো ভদ্রলোককে নিয়ে মাঝে মাঝে তনুকে দেখতে আসে। আমি মেজাজ সংযত রাখতে পারলাম না। বললাম, তাহলে হেলেনসহ তিনি তনুর কাছে আসেন! লজ্জাও করে না!

আরে মশায়, আপনি হঠাৎ করে খেপে গেলেন যে। আগে কি ব্যাপার বলবেন তো? বললাম, ওই যে বয়স্ক ভদ্রলোক আসে, তিনি হেলেনকে বিয়ে করে ফেলেছেন। ঢাকায় ঐ ভদ্রলোক আর তার স্ত্রী ছিলেন তনুদের অভিভাবক। মহিলা শশীভূষণ নামে তার মেয়ের এক গৃহশিক্ষককে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ললিতকলার চর্চা করতে গেছেন। আর ইনি পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে হেলেনকে বিয়ে করে বসে আছেন। আমার বিশ্বাস এটাই তনুর অসুখের একমাত্র কারণ।

তাছাড়া আমি আরো শুনেছি, শুধু মুখের অন্ন জোটাবার জন্য অসুস্থ শরীরে দুবেলা দুটো করে চারটে টিউশনি করতে হয়েছে। এই সমস্ত মানুষেরা তখন কোথায় ছিলেন? তনুর কি অসুখ আমি সঠিক জানিনে, তবু একথা জোর দিয়ে বলতে পারি অমানুষিক পরিশ্রম না করলে এবং হেলেন এ কাণ্ডটা না ঘটালে তার আজ এ অবস্থা হতো না। ওই লোকগুলোর নিষ্ঠুরতার কথা যখন ভাবি মাথায় খুন চেপে যায়।

অথচ এই লোকগুলোই ঢাকাতে আমাদের কাছে আদর্শের কথা প্রচার করতো। আপনি অনেক আনকোরা তরুণ যুবকদের মধ্যে জীবনের মহত্তম সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে উঠতে দেখেছেন, একথা যেমন সত্যি, তেমনি পাশাপাশি একথাও সত্যি যে যুদ্ধের ফলে আমাদের বাংলাদেশের অনেক মুখচেনা মহাপুরুষের মুখোশ খসে পড়ছে। আমরা তাদের জান্তব চেহারা দেখতে পাচ্ছি।

শরণার্থী শিবিরে আমাদের মানুষের দুঃখ দুর্দশার সীমা নেই, ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে আমাদের তরুণদের হাজার রকম অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর কোলকাতার যত্রতত্র শুনছি, বুড়ো আধবয়েসী লোকেরা নতুন করে বিয়ে করছে। ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এদের এই আচরণ আমার কাছে ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদের চাইতেও অধিক অমানুষিক মনে হয়। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, তনুর সঙ্গে এরা কশাইয়ের মতো ব্যবহার করেছে। তনু আমাকে কোনোদিন বলবে না, আমিও জিগগেস করবো না। তবু একথা সত্যি যে তনু যদি মারা যায়, সেজন্য দায়ী এরাই। কিন্তু কোনো আদালতে এ মামলার বিচার হবে না।

ড. মাইতি একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার অনুমান অনেকটা সত্যি। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং টেনশনই তার অসুখটার বাড়াবাড়ির কারণ। যাক

গে, যা হয়ে গেছে এবং যা হচ্ছে তার ওপর তো আমার আপনার হাত নেই। এখন কথা হচ্ছে তনুকে নিয়ে। তার জন্য আপনি কি করতে পারেন? আমি বললাম, মাইতিদা, দেখতেই তো পাচ্ছেন আমি কি রকম অসহায়! আজ রাতে যেখানে ঘুমোই, কাল সেখানে ঘুমোতে পারিনে। পঞ্চাশ পয়সা ট্রামভাড়া সেভ করার জন্য ছয় সাত মাইল পথ হাঁটতে আমাদের বাধে না। আজ যদি চোখের সামনে তনু মরেও যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখা ছাড়া আমার তো করার কিছুই থাকবে না।

তবে একটা দুঃখ থেকে যাবে, তনু বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারবে না। এই স্বাধীনতা জিনিসটি তনু বড়ো বেশী করে ভালোবাসতো। আলাপে আলোচনায় চলায় বলায় দেখে থাকবেন, সে কতোদূর স্বাধীন। উনিশশো উনসত্তরের আয়ুববিরোধী আন্দোলনে তনু নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে কার্ফু ভঙ্গ না করলে, হয়তো আন্দোলনের গতি অন্যরকম হতো। আমার ব্যক্তিগত লাভক্ষতি সুখদুঃখ—সেটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। কিন্তু দুঃখ থেকে যাবে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সে নিজের চোখে দেখে যেতে পারবে না। এটাই হবে আমার আফসোসের একমাত্র বিষয়বস্তু।

আমি মিনতি করে বললাম, আচ্ছা মাইতিদা তনুর অসুখটা কি, আপনি বলবেন? তিনি বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি শক্ত মানুষ। এখন দেখছি, মেয়েমানুষের চাইতেও দুর্বল। আগে থাকতে কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছেন। তনু যদি মারা যায়, আপনি কি আত্মহত্যা করবেন? তা করবো না। কারণ সে বড়ো হাস্যকর হবে। তাহলে কি করবেন, বসে বসে কাঁদবেন? তাও বোধ হয় সম্ভব হবে না। এখানে এ কোলকাতা শহরে বসে বসে কাঁদার অবকাশ কোথায়? বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাঁদার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। অনেকেই তাদের প্রিয়জন হারিয়েছে। আমিও না হয় তাদের একজন হয়ে যাবো।

আপনি তাহলে কিছুই করবেন না? ড. মাইতি ফের জানতে চাইলেন। আমি বললাম, কি করবো, কি করতে পারি? আপনার দিন কাটবে কেমন করে? বুকের এক পাশটা খালি খালি মনে হবে। মশায় আপনি এতোক্ষণ একটা কথার মতো কথা বলেছেন, অনিবার্যকে মেনে নিতেই হবে। এই কথাটা বলার জন্য আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে। এখন তনুর অসুখ কি আপনি জিগগেস করতে পারবেন, আমি বলতে প্রস্তুত। আমি বললাম, বলুন।

ওর হয়েছে লিউক্যামিয়া। জিগগেস করলাম, ওটা কি ধরনের রোগ? তিনি বললেন, ক্যান্সারের একটা ভ্যারাইটি। হ্যাঁ, খুবই কঠিন রোগ। এটা কি খুব কঠিন রোগ? বাঁচার সম্ভাবনা খুবই সামান্য। তনু বাঁচবে তো? তিনি বললেন, সেকথা আমি বলতে পারবো না। এ হাসপাতালের আমি একজন জুনিয়র ডাক্তার। ড. ভট্টাচার্য তার টেস্টের রিপোর্ট বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছেন। জানেন তো বাঙ্গালোরে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের একটা ওয়েল ইকুইপড সেন্টার আছে। সেখান থেকে এ্যাডভাইস না আসা পর্যন্ত আমাদের বলার কিছুই নেই। দিন আপনার

একটা চারমিনার। এখন বুঝতে পারছি, আপনার সঙ্গে থাকলে আমাকেও চেইন স্মোকার হয়ে উঠতে হবে। চলুন খাবার দিয়েছে। কথায় কথায় অনেক রাত করে ফেললাম। আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম।

ড. মাইতির কোয়ার্টারে একফোটা ঘুম চোখে আসেনি। সারারাত বিছানায় হাসফাঁস করেছি। কেমন জানি লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো, আমার সামনে একটা দেয়াল আচানক মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার খুব গরম বোধ হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে মশারীর ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে টেবিলে রাখা পানির বোতল থেকে ঢেলে ঢকঢক করে পানি খাচ্ছিলাম। আর একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছিলাম। দূরের রাস্তার ধাবমান গাড়ীর আওয়াজে আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিলো, কোথাও কেউ ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে।

শেষরাতের দিকে একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো। সেই ঘোরেই স্বপ্ন দেখলাম। আমার আব্বা এসেছেন। স্কুল হোস্টেলে থাকার সময়ে যে বাড়ীতে আমি পেয়িং গেস্ট হিসেবে খেতাম, সে বাড়ীর সামনে পথ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরনে শান্তিপুরের চিকন পাড়ের ধুতি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, গলায় ঝোলানো মক্কা শরীফ থেকে আনা ফুলকাটা চাদর। আর মাথায় কালো থোপঅলা টকটকে লাল সুলতানী টুপী।

আমি জিগগেস করলাম, আব্বা, এতো সুন্দর কাপড় পরে কোথায় চলেছেন? তিনি খুবই অবাক হয়ে জিগগেস করলেন, বেটা, তুমি জানো না বুঝি আজ তোমার বিয়ে? আমিও অবাক হলাম। আশ্চর্য তো, আমি জানিনে। বাবা বললেন, কোথাও কোথাও এমন হয়। আব্বাজান, আমার ইজের চাপকান কই? অন্তত একখানা শাল এ উপলক্ষে তো আপনি আমাকে দেবেন। আব্বা সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, বেটা, সাদা ধুতি পরো। আমার বিয়ের সময় আমিও ধুতি পরেই বিয়ে করেছিলাম। তোমার বড়ো ভাইকেও ধুতি পরিয়ে বিয়ে করিয়েছি।

তিনি আমার হাতে একখানি ধুতি সমর্পণ করলেন। আমি বললাম, আব্বা, আমি যে ধুতি পরতে জানিনে। বেটা বেহুদা বকো না। পরিয়ে দেয়ার লোকের কি অভাব? নাও, তানজামে ওঠো। আমি বললাম, এই শুভদিনে অন্তত একখানা ঘোড়ার গাড়ী আপনি ভাড়া করতে পারেন না? বেটা মুরুব্বীর সঙ্গে বেয়াদবী করা তোমার একটা মজ্জাগত অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি। নাও, তানজামে ওঠো।

তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোথাও তাকে দেখলাম না। চারজন মানুষ আমাকে একটা খাটিয়ায় করে আমাদের গ্রামের পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খাটিয়ার আগেপিছে বেশ কিছু মানুষ। কাউকে আমি চিনিনে। সকলের পরনে শুভ্র বসন। খাটিয়ার লোকগুলো আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সুর করে বলছে, বলো মোমিন, আল্লা বলো। রাস্তার লোকেরাও বলছে, আল্লা বলো।

আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম, এ কেমনধারা বিয়ে গো? বাজী পোড়ে না, বাজনা বাজে না। অমনি পায়ের দিকে বহনকারী দুজন লোক কথা বলে উঠলো, এ লাশটা তো অনেক ভারী। চলো, একে এখানে ফেলে রেখে চলে যাই। মাথার

দিকে কাঁধে নিয়েছে যে দুজন মানুষ তারা বললো, না না, চলো। আর তো অল্প পথ। তোমরা নাও, আমরা পারবো না। তারা কাঁধ সরিয়ে নিলো। আমি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। হাঁটুতে প্রচণ্ড চোট লেগেছে।

আমার তন্দ্রা টুটে গেলো। চোখ মেলে দেখলাম, আমি ফ্লোরের ওপর পড়ে গেছি, আর হাঁটুতে সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়েছি। কাঁচের জানালার শার্শি ভেদ করে শিশু সূর্যের দু'তিনটি রেখা ঘরের ভেতর জ্বলছে। আবার উঠে খাটে চড়ার কোনো প্রবৃত্তি হলো না। তিন চার মিনিট তেমনি পড়ে রইলাম।

চোখ বন্ধ করে তন্দ্রার মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাক্রমকে আবার মনে মনে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

এই সময় ড. মাইতি এসে আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, একি দানিয়েল সাহেব, আপনি নীচে কেনো? আমি আস্তে আস্তে বললাম, একটা স্বপ্নের ঘোরে খাট থেকে নীচে পড়ে গিয়েছি। বাহ, চমৎকার। আপনার মনে যখন স্বপ্ন আছে দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। আশা করি দাড়ি কাটতে এবং স্নান করতে অমত করবেন না। আমি মৃদুস্বরে বললাম, না। তিনি বললেন, বাথরুমে শেভিং স্টিক, ব্লেড, সাবান সব দেয়া আছে। যান, তাড়াতাড়ি যান। এখখুনি টিফিন দেবে। গালে সাবান ঘষতে গিয়ে দেখি, থুতনির কাছে আট দশটা দাড়ি পেকে গেছে। দু'কানের গোড়ায়ও অনেকগুলো বাঁকাচোরা পাকা চুলের রুপোলী রেখা। আমার চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। আহা, আমার যৌবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি বুড়ো হতে চলেছি। এতোদিন চোখে পড়েনি কেনো? একরাতের মধ্যেই কি ম্যাজিকটা ঘটে গেলো?

ড. মাইতির সঙ্গে নাস্তার টেবিলে বসলাম, চুপচাপ লুচি, হালুয়া, ডিম এবং চা খেলাম। আমার কোনো কথাবার্তা বলার প্রবৃত্তি হচ্ছিলো না, তিনিও বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে তার মুখে চোখ পড়তে দেখি, তিনি যেনো কি একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। ড. মাইতির সঙ্গে আমার একটা সহজ সম্পর্ক তৈরী হয়েছিলো। কিন্তু এই একরাতের ব্যবধানে তাতে যেনো বিস্ফোরণ ঘটে গেছে।

আমার মনের এরকম একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যা ঘটছে ঘটুক আমি কেয়ার করিনে। চারপাশের লোকজন, এদের আমি চিনিনে, চিনতেও চাইনে। ড. মাইতি আমাকে জিগগেস করলেন, সকালবেলা একবার তনুকে দেখে যাবেন কি? আমি নিস্ক্রিয়ভাবে বললাম, চলুন। কোনো ব্যাপারে আমার আর কোনো উৎসাহ নেই। তনু যদি গতরাতে ঘুমের মধ্যে মরেও গিয়ে থাকে, আমি যদি হাসপাতালে গিয়ে তার মরা শরীরও দেখি তবু কেঁদে বুক ভাসাবো না। আমি কি করবো, আমার কি করার আছে!

সে যাক, ড. মাইতির পেছন পেছন আমি তনুর ওয়ার্ডে এসে প্রবেশ করলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম। এই সাত সকালবেলা জাহিদুল হক এবং হেলেন তনুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য সময় হলে আমি বোধ করি প্রচণ্ডভাবে

নিজের মধ্যে হলেও খেপে উঠতাম। আজকে সেরকম কোনো অনুভূতিই হলো না। বরঞ্চ মনে হলো, ওরা আসবে একথা অবচেতনে আমার যেনো জানা ছিলো। আমিও চুপচাপ তনুর শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তনু পেছনের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেছে। এখনো মুখ ধোয়নি। ফ্যানের বাতাসে মাথার চুল উড়াউড়ি করছে। তার চোখেমুখে বেদনামথিত স্নিগ্ধ প্রশান্তির দীপ্তি। আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলো, এই যে দানিয়েল ভাই, আসুন, আপনি কি কাল মাইতিদার কোয়ার্টারে থেকে গিয়েছিলেন? নইলে এতো সকালে আসবেন কেমন করে? আমি মাথা নাড়লাম এবং নীরবে জাহিদুল হকের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

জাহিদুল হকের মধ্যেও কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো না। তনুদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে জাহিদুল হক আমাকে আর তনুকে কাছাকাছি বসে কথা বলতে দেখলে ভ্রূকুটিজোড়া মেলে ধরতেন। তিনি আমাদের পরিচয় আর মেলামেশা কখনো সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এমনকি তনুর পার্টির সিনিয়র লোকদের কাছেও একাধিকবার মন্তব্য করতে ছাড়েননি, আমি খুব নারীলোলুপ মানুষ।

আমিও জাহিদুল হককে বরাবর ভড়ংসর্বস্ব একটা ফাঁকা মানুষ জ্ঞান করে আসছি এবং একথা গোপন রাখিনি। আর সুযোগ পেলেই তাকে কখনো ছেড়ে কথা বলিনি। আজকে তিনিও মৃদু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। এক রাতের মধ্যে সবকিছুর এমন পরিবর্তন ঘটলো কি করে? সকলেই কি তনুর ভবিষ্যৎ নিয়তির কথা জেনে গেছে?

জাহিদুল হক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা ব্যাটারীচালিত টেপরেকর্ডার বাজিয়ে বাজিয়ে তনুকে কি সব গান শোনাচ্ছিলেন। আমার আচমকা উপস্থিতিতে সেটা এতোক্ষণ বন্ধ ছিলো। তনু জাহিদুল হককে বললো, রিউইন্ড করে আবার প্রথম থেকে বাজান জাহিদ ভাই, দানিয়েল ভাইও শুনুক। আমাকে বললো, দানিয়েল ভাই শোনেন, হেলেন দিল্লীতে বাঙালীদের একটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একক প্রোগ্রাম করেছে। গান বাজতে থাকলো।

দেয়ালে হেলান দিয়ে তনু চোখ বন্ধ করে রইলো। বাংলাদেশে থাকার সময়ে হেলেন যখন রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম করতো, এমনি করে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় বিদ্যুতবাহিত স্বরতরঙ্গের সঙ্গে তনু নিজেকে বিলীন করে দিতো।

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতোদূরে আমি যাই
কোথা মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।

হেলেনের কণ্ঠ অত্যন্ত সুরেলা, তাতে যেনো বিষাদের একটু ছোঁয়া আছে। এই ছোঁয়াটুকুর স্পর্শেই সঙ্গীতের সুদূরের আহ্বানটি যেনো প্রাণ পেয়ে ওঠে। হেলেন জাহিদুল হকের কাছে গান শিখেছে। তার আর যাই অপরাধ থাকুক, যাকে গান শেখান, সারা মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে শেখান, একথা স্বীকার করতেই হবে। আবার বেজে উঠলো,

আমায় যে সব দিতে হবে, দিতে হবে, সে তো আমি জানি,
আমার যতো বাক্য প্রভু, আমার যতো বাণী।

এমনি করে আধঘণ্টার প্রোগ্রাম ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজতে থাকলো। সবগুলো গান তনুর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাছাই করা হয়েছে। তাহলে হেলেনও কি জানে, অন্তিম পরিণতিতে তনুর কি ঘটতে যাচ্ছে? মনের মধ্যে একটুখানি খুঁতখুঁতোনি অনুভব করছিলাম। তনুর সেই প্রিয় গান দুটো হেলেন বাদ দিয়েছে কেনো?

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

এবং,

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।

সকলে সবদিকে তনুকে অন্তিমযাত্রার জন্য যেনো প্রস্তুত করে তুলছে। হেলেন যে তনুকে পার্ক সার্কাসের বাসায় সংজ্ঞাহীন রেখে জাহিদুল হকের সঙ্গে দিল্লীতে পালিয়ে গিয়েছিলো তাও বোধ করি এ জমজমাট নাটকের শেষ দৃশ্য উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য নিখুঁত পরিকল্পনা করেই করা হয়েছিলো!

ক্যাসেট শেষ হলে, তনু চোখ খুললো। তার ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো। হেলেনের গানের শেষে এমনি তৃপ্তি এবং গর্বের হাসি খেলে যেতে অনেকবার পূর্বে আমি দেখেছি। তনু খুব ক্ষীণকণ্ঠে জিগগেস করলো, লোকে কেমনভাবে নিয়েছে তোর গান, হেলেন। এবার হেলেন মুখ খুললো। বাপ্পা, সে এক আজব ব্যাপার। নানা জায়গা থেকে গান করার এতো অফার আসতে লাগলো যে গোটা মাসেই শেষ করা যেতো না।

হেলেন তনুকে বাপ্পা বলে ডাকে। কি কারণে বড়ো বোনকে বাপ্পা বলে তার ইতিকথা আমি বলতে পারবো না। কারণ গেন্ডারিয়ার বাসাতে গিয়েই হেলেনকে বাপ্পা বলতে শুনেছি এবং পরে কোনো কোনো বাসায় বড়ো বোনকে বাপ্পা বলে সম্বোধন করতে শুনেছি।

তনু বললো, কয়েকটা অনুষ্ঠান করে এলেই পারতিস। পিঁপড়েয় কামড়াচ্ছিলো নাকি, এতো সকাল সকাল চলে এলি? দিল্লী কতো বড়ো শহর, কতো জ্ঞানীগুণীর ভীড় সেখানে। পাওয়া সুযোগটা নষ্ট করে দিলি? হেলেন তনুর গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললো, বাপ্পা, তোমার শরীরের এ অবস্থায়, সে হু হু করে কেঁদে ফেললো। তনু গভীর আদরে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, আমার অসুখ তো লেগেই আছে, তোর সুযোগ তো প্রতিদিন আসবে না।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, জানেন, দানিয়েল ভাই, কালকে আপনার যাওয়ার পর থেকে সারারাত বমি করেছি। একবার তো বাথরুমে পা পিছলে পড়েই গিয়েছিলাম। ভাগ্য ভালো, আয়াটা ছিলো নইলে সারারাত পড়ে থাকতে হতো। তনুর কথা শুনে হেলেন আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রইলো। জাহিদুল হকের সে পুরোনা ভ্রূকুটিটি জেগে উঠলো। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যাঁর অর্থ করলে এরকম দাঁড়াবে, জানতাম তুমি এলে একটা অঘটন ঘটবে। তিনি তনুকে জিগগেস করলেন, কি হয়েছিলো, কেনো বমি করলে, কই কিছু তো বলোনি, কখন পড়ে গিয়েছিলে? কিছু কুপথ্য মুখে দিয়েছিলে কি? তনু বললো, না, না, সেসব কিছুই না। সন্ধ্যের পর থেকে আপনা আপনি বমি হতে শুরু করলো। এক সময় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।

আমার মনে হলো, এ নাটকে যা কিছু ঘটবে সব দেখে যেতে হবে। পালন করার কোনো ভূমিকা থাকবে না। এমনকি একটা ফালতুরও নয়। অগত্যা আমি উঠে যেতে উদ্যত হলাম। তনুর দিকে তাকিয়ে বললাম, তাহলে এখন আসি। না না দানিয়েল ভাই, যাবেন না, বসুন—আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। বরঞ্চ হেলেন, তোরা যা, প্রোগ্রাম শেষ হলে যাবার পথে খবর দিয়ে যাস। হেলেন, জাহিদুল হক চলে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের হেলেনি খুব গুণী। এরই মধ্যে দিল্লীতে প্রোগ্রাম করে এলো। আজ মহাজাতিসদনে গাইবে। আমার শরীরটা হয়েছে একটা মস্ত বড়ো বোঝা। নইলে আমিও গান শুনতে যেতাম। অনুষ্ঠানে হেলেনির গান শুনিনি কতোদিন হয়। মা শুনলে কি যে খুশী হবে! দানিয়েল ভাই, আপনি একটু উঠে দাঁড়ান। আপনার কাঁধে ভর দিয়ে আমি একটু বাথরুমে যাবো মুখে পানি দিতে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। আজ নটায় আবার ড. ভট্টাচার্য এসে কি সব টেষ্টফেষ্ট করবেন। আর সহ্য হয় না।

আমি তাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। সে ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে মুখে সাবান ঘষলো। তারপর মুখ ধুয়ে নিলো। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালো। তনু বললো, আমার পা দুটো কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে। আমি বেসিনে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো। আপনি গিয়ে আমাকে একটা টুল এনে দেন। টুলটা এনে দিলে সে বসে হাঁপাতে লাগলো।

দানিয়েল ভাই, আপনাকে আরো একটা কাজ করতে হবে। দেখবেন, খাটের বাজুতে ঝোলানো একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি আছে। সেখান থেকে খোঁজ করে একটা ধোয়া তাঁতের শাড়ী, পেটিকোট এবং ব্লাউজ এনে দিন না। এখনো বাসি কাপড়ে রয়েছি, সারা শরীর আমার কুটকুট করছে। গেন্ডারিয়ার বাসাতেও দেখেছি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করে গোসল সেরে তাকে একটা ধোয়া কাপড় পরতে।

আমি প্লাস্টিকের ঝুড়ি থেকে খোঁজ করে শাড়ী, ব্লাউজ এবং পেটিকোট বের করে তনুর হাতে দিলাম। তনু বললো, এখন টুলটা টেনে ওই দরোজার কাছে নিয়ে যান, কাপড়চোপড় পরতে হবে, আর আপনি দরোজার ওপাশে গিয়ে

দাঁড়ান তনুকে টুলের ওপর বসিয়ে রেখে আমি বাথরুমের দরোজা বন্ধ করে এপাশে চলে এলাম। তনু কোন কৌশলে এই অল্প পরিসর টুলের ওপর বসে এসব কাপড়চোপড় পরবে, আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না।

কাপড় পরা হয়ে গেলে তনু ডাকলো, দানিয়েল ভাই। আমি দরোজা খুললাম। কাপড়চোপড় পরেছে বটে, কিন্তু আঁচলটাকে সামলাতে গিয়ে বেশ অসুবিধে হচ্ছিলো। কাঁধ থেকে খসে মেঝেতে পড়ে বেশ খানিকটা ভিজে গেলো। তনু বললো, আপনি ভীষণ অপয়া। আমার আঁচলটা ভিজে গেলো। আঁচল তুলে নিয়ে চিপে পানি বের করে নিলো।

আরেকবার আপনাকে কষ্ট করতে হবে। আমার শিথানে একটা ক্রিম আছে। চাদর ওঠালেই দেখতে পাবেন। প্লিজ সেটা গিয়ে একটু নিয়ে আসুন না। আমি ক্রিমটাও নিয়ে তার হাতে দিলাম। সে একটু ক্রিম হাতের তালুতে নিয়ে ঘষে ঘষে মুখমণ্ডল এবং ঘাড়ের কাছটিতে মাখলো। তারপর আমার হাতে ফেরত দিলো।

এখন আপনি আগের মতো দাঁড়ান। আমি টুলটির পাশে দাঁড়ালাম। কিন্তু সে আর উঠতে পারলো না। উহ, দানিয়েল ভাই। আমি বললাম, কি তনু? আমার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, শরীরের সমস্ত শক্তি কাপড় পরতে শেষ। আপনি আমাকে একটু পাঁজাকোলা করে বিছানায় রেখে আসুন না। আমি দুহাত দিয়ে তাকে উঠিয়ে নিলাম। সে একটি হাত আমার ঘাড়ের উপর রাখলো। কাজটি শেষ হতে আধমিনিটও ব্যয় হলো না। তনুর সঙ্গে তিন বছর আমার পরিচয়। তিন বছরে এই আধমিনিটের মতো সময় কখনো আসেনি।

বিছানায় শুয়ে সে কয়েকবার হা করে শ্বাস ফেললো। বুঝলাম, তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। বেশ কয়েক মিনিট পর, সে আমাকে জিগগেস করলো, দানিয়েল ভাই, আপনি কি হেলেনির গান শুনতে যাবেন? যান তো একখানা টিকেট দিতে পারি। আমি বললাম, যেখানে থাকি সেখানে যেতে হবে। তারপর পত্রিকার অফিসে গিয়ে লেখার কিস্তিটি পৌঁছে দিতে হবে।

তনু কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেলো। আপনি হেলেনির প্রতি এতো নিষ্ঠুর কেনো? ওকি সংসারের কিছু বোঝে? সে একটা কিছু করেছে, তা এমন সিরিয়াসলি নেয়ার কি আছে! তার যখন জন্ম হয়েছিলো মার ভয়ানক অসুখ ছিলো। আমিই নিজের হাতে সেবাযত্ন করে এতো ডাগরটি করেছি। গায়েগতরে বেড়েছে বটে। আসলে ওর কি বয়েস হয়েছে? আপনি ওকে একটু ভালোভাবে নিতে পারেন না? তারপর বললো, এখন ডাক্তার আসবে আপনি পলান।

ছয়

হাসপাতাল থেকে আমি সবটা পথ পায়ে হেঁটেই বৌবাজারের হোস্টেলে এলাম। ট্রামবাসে ওঠার ইচ্ছেও মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। আমার মনে হচ্ছিলো, আমি একেবারে কাঙাল বনে গেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা করার কিছু নেই। তবু হোস্টেলে

আসতে পারলাম কেমন করে সে আমি বলতে পারবো না। গেটের গোড়ায় এসে দেখি ভুঁড়িঅলা দারোয়ানের বদলে দুবলা-পাতলা দারোয়ানটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসে খৈনি টিপছে। আমাকে দেখতে পেয়ে পান খাওয়া লাল গ্যাটগেটে দাঁত দেখিয়ে হেসে বললো, বাবু কোটি সে যাইয়ে, আজ হাওয়া বহুত গরম হে। কোনো উত্তর না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম।

যে রুমে আমরা থাকি সেখানে রীতিমতো একটা মাঝারি ধরনের কনফারেন্স বসে গেছে। আমাদের ছেলেদের অধিকাংশ হাজির আছে। তাছাড়া আছেন কোলকাতার সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পোস্টাফিসে চাকুরী করেন। ফর্সাপানা সুন্দর চেহারার সদানন্দ মানুষটি। সবসময়ে পরিষ্কার পাজামা পাঞ্জাবী পরেন এবং দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কেটে থাকেন। অবসর সময়ে কবিতা লেখেন, কিন্তু কোলকাতার কাগজ এমনকি লিটল ম্যাগাজিনগুলো পর্যন্ত তার কবিতা ছাপতে চান না।

সম্পাদকদের এক আজব বিদ্বেষ সৌগতবাবুর প্রতি। বিশ্বেসের দিক দিয়ে তিনি বিপ্লবীও বটেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার কোনো পার্টির সদস্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কথাবার্তা বলে দেখেছি পশ্চিম বাংলার বিপ্লবী পার্টিসমূহের নীতি, আদর্শ এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি সৌগতবাবুর ভয়ানক রাগ। কথায় কথায় তিনি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।

অবশ্য ইদানীং সৌগতবাবুর বেশ পুষিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এইসব ভাসমান কর্মহীন ছেলেদের সঙ্গে তিনি একটি সত্যিকার গণবিপ্লবের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে হামেশা আলোচনা করে থাকেন। প্রায়ই বলে থাকেন, পশ্চিম বাংলা হেজেমেজে গেছে। কিছু যদি করার থাকে, অবশ্যই বাংলাদেশের ছেলেরা করবে। এরই মধ্যে সৌগতবাবু উদ্যোগী হয়ে বাংলাদেশের ছেলেদের নিয়ে গোটা তিনেক সংকলন প্রকাশ করেছেন। বলাবাহুল্য প্রতিটিতেই সৌগতবাবুর তিনটি করে দীর্ঘ কবিতা সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে।

সৌগতবাবু মানুষটি রসগোল্লার মতো। টিপলেই রস বের হয়। কি কারণে বলতে পারবো না, আমার সঙ্গে তার পরিচয় মামুলিপনা অতিক্রম করে হৃদ্যতার স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। আমাকে ধুতিপরা দেখতে পেয়ে মাসুমই প্রথম ফোড়ন কাটলো। দানিয়েল ভাই, এখন বলুন দেখি কোলকাতার হাওয়া কেমন লেগেছে?

কোলকাতার মানুষের মতো টানটোন লাগিয়ে ঢাকার বাংলা ভাষাটি বলতে চেষ্টা করে বলে আমি একবার বলেছিলাম, মাসুমের গায়ে কোলকাতার বাতাস লাগছে। আজ ধুতিপরা অবস্থায় দেখতে পেয়ে মাসুম তার শোধ নিচ্ছে। মাসুমের কথার পিঠে কথা বলার মতো আমার মনের অবস্থা ছিলো না। নীরবে নরেশদার পাশে গিয়ে একটা বালিশ টেনে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম।

নরেশদা বললেন, কি খবর? বললাম, ভালো নয়। কি রকম, বলো দেখি? এসব শেষ হোক, পরে বলবো। আমি চোখ দুটো বন্ধ করে রইলাম। মনে হচ্ছিলো একটা প্রচণ্ড সংজ্ঞাহীনতা এখখুনি আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে পারছিলাম না। এক ভদ্রলোক, যিনি আমার সম্পূর্ণ অচেনা,

ইংরেজী এ্যাকসেন্টে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছিলেন। বোধ করি তিনি আগ থেকেই কথা বলছিলেন। আমার আসায় তার কথায় ছেদ পড়ে থাকবে।

আমরা বাংলাদেশের ফ্রিডম ওয়ারের কথা শুনে লেখাপড়া সব ছেড়ে দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে কোলকাতায় এসেছি আজ পঁচিশ দিন। কিন্তু এখানে এসে দেখি, থিয়েটার রোডে আসর পেতে যারা বসে আছে তাদের অধিকাংশই এ বাঞ্চ আব রাসকেলস। এরা খাচ্ছেদাচ্ছে, মজা করছে, এরা নাকি ফ্রিডম ওয়ারেরও নেতৃত্ব দেয়। ভয়ানক ডিজইল্যুশনড হয়ে গেছি। মাও সেতুংও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আপনারা সকলে লঙ মার্চের খবর জানেন?

একজন বললেন, আপনার মাও সেতুং এখন বাংলাদেশের ব্যাপারে কি করছেন, জানেন? পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে খুনজখম হত্যাধর্ষণ সবকিছু অবলীলায় করে যাচ্ছে। আর আপনার মাও সেতুং ইয়াহিয়ার জল্লাদ সৈন্যদের অব্যাহত দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্য জাহাজভর্তি করে বোমা, কামান, অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি? আমার মনে হলো প্রশ্নকারীর কণ্ঠস্বরটি আমার পরিচিত। ওহ্‌, মনে পড়েছে, গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী মনোকুমার সেন যিনি একবার এখানে এসেছিলেন এই ভদ্রলোক তারই ছেলে। অমর্ত্য সেন নাকি একটা নাম। বেলেঘাটার দিকে বাসা। একবার আমাদের খেতে ডেকেছিলেন।

সবাই কথা বলছে, কোনো আগামাথা নেই। কোথায় শুরু হচ্ছে এবং কোথায় শেষ হচ্ছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। সকলেই তার আপন বক্তব্যটি প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের সালাম এবার মুখ খুললো, মাওলানা ভাসানী মাও সেতুং এবং চৌয়েন লাইয়ের কাছে পাকিস্তানী সৈন্যদের ধ্বংসলীলার কথা বর্ণনা করে, পাকিস্তানী সৈন্যদের সাহায্য না করার অনুরোধ জানিয়ে দু'খানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।

আরে থোন ফালাইয়া আপনার মাওলানা ভাসানী। টেলিগ্রাম দু'খান যত্নের সঙ্গে মাও সেতুং আর চৌয়েন লাই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে থুইয়া রাখছে। মাওলানা এখন ইন্ডিয়ায় কেনো আইছে, হেইডা কইবার পারেন? এই সমস্ত বেঈমানদের চিনতে কিছু বাকী আছে নাকি? এ কথাগুলো সাবদার সিদ্দিকীর। সিদ্দিকী সব জায়গায় নিজেকে ঘটা করে আওয়ামী লীগের লোক বলে প্রচার করে থাকে। কিন্তু আওয়ামী লীগের লোকেরা তাকে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। আওয়ামী লীগারদের কাছে কোনো পাত্তা না পেয়ে সিদ্দিকী আমাদের ডেরায় এসে আওয়ামী লীগ বিরোধীদের মুণ্ডুপাত করে থাকে।

ইংল্যান্ড প্রত্যাগত ভদ্রলোকটি জিগগেস করলেন, বাই দ্যা বাই, ক্যান এ্যানিওয়ান অব ইউ টেল মি হোয়ার ইজ দি মাওলানা নাউ? উয়ি হিয়ার দ্যাট হি ওয়াজ পুট আন্ডার এ্যারেস্ট। তারপর মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চললো। কে একজন বললো, মাওলানাকে এ্যারেস্ট করে লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরেকজন বললো, এ্যারেস্ট করেছে একথা সত্যি নয়। তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই কোলকাতার ধারেকাছে কোথাও রাখা হয়েছে।

আমি শুনেছি, পহেলা মাওলানাকে বালিগঞ্জের একটা বাড়ীতে রাখা হয়েছিলো। মাওলানা সন্ধ্যে হলেই ছাদের ওপর পায়চারী করতেন। তার লম্বা দাড়ি, পাঞ্জাবী, মাথার ওপর বেতের টুপি দেখেই আশপাশের মানুষের মনে কেমন সন্দেহ হতে থাকে যে ইনি মাওলানা না হয়ে যাবেন না। মাওলানার আরেকটা একগুঁয়ে স্বভাবের দরুন তাকে বালিগঞ্জ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে ভারত সরকার বাধ্য হয়েছেন। তা হলো এই যে বালিগঞ্জের মতো এরিয়ায় মাওলানা ছাদের ওপর আজান দিয়ে নামাজ পড়তেন।

এক সময় মাওলানা ভাসানী প্রসঙ্গও চাপা পড়ে গেলো। শেখ মুজিবকে নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। সাবদার সিদ্দিকী বললো, থিয়েটার রোডের যে সকল মাস্তান আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে সবকিছু লুটেপুটে খাচ্ছে, এখানে বঙ্গবন্ধু হাজির থাকলে পেঁদিয়ে সকলের পাছার ছাল তুলে নিতো।

সালাম ঠোঁট উল্টে জবাব দিলো, আরে রাখো তোমার বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই ধরা দিয়েছে। পৃথিবীর কোন বিপ্লবী সংগ্রামের নেতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে শত্রুর হাতে তোমার ওই বঙ্গবন্ধুর মতো আত্মসমর্পণ করেছে, তার কোনো নজির আছে? শেখ মুজিব সবসময় স্যুটকেস রেডি রাখতেন, আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেই জেলে চলে যেতেন। আর আন্দোলন শেষ হলে বিজয়ী বীরের বেশে বেরিয়ে এসে ক্রেডিটটুকু লুট করতেন। দল গড়ার সময় গুন্ডা বদমায়েশদের প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। আমরা তো ছোটবেলা থেকে শেখ মুজিব সম্পর্কে এ-ই শুনে আসছি।

সাবদার সিদ্দিকী হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, খবরদার সালাম, ছোটো মুখে বড়ো কথা বলবে না। মুখের একটা দাঁতও আস্ত রাখবো না। সালাম এবং সাবদার সিদ্দিকী উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য শক্তিপরীক্ষার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় পৌঁছার উপক্রম করলে সকলে ধরাধরি করে দুজনকে বসিয়ে দিলো। এধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। এধরনের একটা বিস্ফোরণের পর আর আলোচনা স্বাভাবিক খাতে এগুচ্ছিলো না।

ইংল্যান্ড প্রত্যাগত ভদ্রলোক বললেন, সরি, আমার একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে। এখুনি উঠতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে সৌগতবাবুও উঠে গেলেন। বুঝলাম, ইংল্যান্ড প্রত্যাগত ভদ্রলোকটাকে সৌগতবাবুই সংগ্রহ করে এনেছেন। আসরের একেকজন করে উঠে যাচ্ছিল।

মাসুমকে কথা বলতে শুনলাম। ওমা, এমনি করে সবাই উঠে গেলে চলবে কেনো? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখনো উত্থাপনই করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি মনে হয় সকলের মনে একটু দাগ কাটলো। মাসুম খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িঅলা এক ভদ্রলোকের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, নাহিদ ভাই এবার তার দুঃখের কথা বলবেন। তিনি যে দুঃখে পড়েছেন, তার চেহারাসুরত দেখলেই তা মনে হয়। উদ্ভ্রান্তের মতো চোখের দৃষ্টি। জামার এক হাতের হাতা গোটানো, অন্যটা ছেড়ে দেয়া।

তিনি বলতে শুরু করলেন, বগুড়া ফল করার দু'দিন আগে আমার দেড়মণ সোনা স্টেট ব্যাঙ্কের সেফটি ভল্ট ভেঙ্গে এখানে নিয়ে আসি। নৌকাতে করে আমরা তিনজন সোনাসহ বর্ডারে এসে পৌঁছাই। সেখান থেকে গাড়ীতে করে কোলকাতায় এসে দুটো বড়ো সুটকেস কিনে সোনাগুলো ভাগাভাগি করে রাখি। তারপর তিনজন একটা হোটেলে উঠি। একদিন না যেতেই অন্য দুজন বললো, আমাদের পেছনে ভারত সরকারের স্পাই লেগেছে। যদি কোনো রকমে জানতে পারে সবকিছু আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জেলে পুরে রাখবে। অতএব মাল সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

অন্য দুজন স্যুটকেস দুটো নিয়ে হোটেল ছেড়ে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলো। আমাকে বলেছিলো, তিনজন একসঙ্গে গেলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। তাই কথা ছিলো, কোনো সেফ জায়গায় উঠে সন্ধ্যের সময় আমাকে নিয়ে যাবে। সেই যে চলে গেলো, আর কখনো তাদের দেখা পাইনি।

নরেশদা বললেন, এই সোনা তো বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি। আপনি কি থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো নালিশ টালিশ করেননি? নাহিদ সাহেব বললেন, থিয়েটার রোডে অনেক ঘোরাফেরা করেছি, কিন্তু আমার কথা কেউ কানেও তুলতে চান না। যে তিনজন আমরা সোনা নিয়ে এখানে এসেছিলাম তার একজন আবার এমপির আপন ভাই। আরেকজন আরেক এমপির ভগ্নিপতি। তারা কোথায় আছে, কি করছে, কিছুই জানিনে। এদিকে আমার কথাও কেউ কানে তুলতে চান না। দেখছেন তো এ অবস্থায় আমার কথা কে গেরাহ্যি করে। নিজের দীনদশার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তো এরকম একজন মানুষ বাংলাদেশ থেকে দেড়মণ সোনা নিয়ে এসেছে শুনলে আজ কে বিশ্বেস করবে? ভদ্রলোক বললেন, এখন আমি কি করি বলেন তো, পথেঘাটে আমার বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিন কোলকাতা এবং বাংলাদেশের অনেক চেনা অচেনা মানুষ ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে, আমি যদি কোলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে না যাই, তাহলে খুন হয়ে যাবো। তা না হলে ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক আমাকে এ্যারেস্ট করে একেবারে গুম করে ফেলবে। আমি এখন কি করবো বুঝতে পারছিনে। আপনারা কি আমাকে কোথাও কোনো আশ্রয় দিতে পারেন?

তার গল্পটি কেউ অবিশ্বাস করলো না। মুখে মুখে অনেক সহানুভূতির কথাও প্রকাশ করা হলো। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। সাবদার সিদ্দিকী কিন্তু আশ্বাস দিয়ে বললো, আপনি কাল এই সময়ে আসবেন। আপনাকে নিয়ে থিয়েটার রোডে গিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবকে সবকিছু খুলে বলে বদমায়েশদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করবো। আজ বাড়ী চলে যান।

নাহিদ সাহেব বললেন, এখানে আমার বাড়ী কোথায় যে যাবো। সাবদার বললো, যেখানে থাকেন, চলে যান। তিনি বললেন, আমার তো থাকার কোনো জায়গা নেই। গতরাতে শেয়ালদা স্টেশনে ঘুমিয়েছিলাম। দূর মশায়, সবদার

বললো, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেলো না, কিছু বোঝেন না। তারপর সাবদার নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেলো।

আমার চোখ দুটো ঘুমে ধরে আসছিলো। এতো ক্লান্তশ্রান্ত অবস্থায়ও কি করে এতোক্ষণ ধরে, এতোসব কথাবার্তা নীরবে শুনে আসছিলাম, তার কারণ কি ঠিক বলতে পারবো না। সবাই চলে গেলে নরেশদা জিগগেস করলেন, দানিয়েল গতরাতে কি তোমার ঘুম হয়নি? আমি বললাম, না। এখন কি ঘুমোবে? বললাম, হাঁ। কিছু খাবে না? ঘুমজড়ানো স্বরেই জবাব দিলাম, খেয়ে এসেছি।

বেলা তিনটার দিকে আমার ঘুম ভাঙলো। দেখি রুমে আর কেউ নেই। নরেশদা বসে বসে সুবলচন্দ্র মিত্র এবং হরিচরণ ব্যানার্জির অভিধান দুটো নিয়ে কি সব করছেন। অভিধান পাঠ করা, একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে দেখা তার দীর্ঘদিনের অভ্যেস। আমরা তো একরকম ধরেই নিয়েছিলাম, তিনি নিজেই আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আস্ত একখানি অভিধান প্রসব করতে যাচ্ছেন।

জিগগেস করলেন, দানিয়েল গতরাতে কোথায় ছিলে? আমি বললাম, তনুর ডাক্তার মাইতির কোয়ার্টারে। তনুর রোগ সম্পর্কে ডাক্তার কিছু বললেন? আমি জবাব দিলাম, হাঁ বলেছেন, ওটা নাকি লিউক্যামিয়া, ক্যান্সারের একটা ভ্যারাইটি। তনু বাঁচবে তো! আমি বললাম, ডাক্তার সে ব্যাপারে আমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্যই তার কোয়ার্টারে ডেকে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, এধরনের রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নাকি খুবই ক্ষীণ।

তাই নাকি! তিনি অভিধান দুটো বন্ধ করে গালে হাত দিয়ে কি সব ভাবলেন। এখন তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, গোল পার্কের কাছে, সুনন্দাদের বাড়ী যাবো। সুনন্দা স্কুলে যায়নি? আমি বললাম, আজ স্কুল বন্ধ, গেলে পেতেও পারি।

সে কি, খাবে না? আপনি খেয়েছেন? হাঁ, আমাকে খেতে হয়েছে। রাজার মঠ থেকে দাদা আসছিলেন তো, তিনিসহ খেয়ে নিয়েছি। তিনি এসেছিলেন নাকি? হাঁ। কোনো খবরটবর পেলেন? মা-বাবা আজ তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছেছেন। আমি বললাম, ভালো খবর। তিনি এখন কোথায়? খবরটা দিয়েই চলে গেছেন আবার।

কাপড় পরে আমি জিগগেস করলাম, নরেশদা আপনার কাছে টাকা আছে? বললেন, কতো? এই ধরুন পনেরো বিশ। তিনি আমার হাতে একখানি বিশ টাকার নোট দিলেন। বেরিয়ে আসতেই তিনি বললেন, একটু দাঁড়াও, তনুর হাসপাতালের ওয়ার্ড নাম্বার এবং বেড নাম্বারটি দিয়ে যাও। আমি একটা কাগজ নিয়ে ওয়ার্ড নাম্বার এবং বেড নাম্বার লিখে দিলাম।

সাত

সুনন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক আগের। অবশ্য পরিচয় হয়েছিলো পত্রের মাধ্যমে। সুনন্দারা উনিশশো আটষট্টির দিকে একখানি গল্প পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে আমার একটা ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিলো। আমি এমন

আহামরি লেখক নই। তথাপি আমার লেখাটি সুনন্দার মনে ধরেছিলো। তখন থেকে পত্র-যোগাযোগ। এখানে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সে।

তার বাড়ীর ঠিকানায় খোঁজ করে তাকে খুঁজে নিতে কোনোই অসুবিধে হয়নি। বড়ো আশ্চর্য মেয়ে। বিশ্বভারতীতে ফিলসফি পড়াতো। ছাত্রীও বোধ হয় ওখানকার। রবীন্দ্রনাথের সাধনপীঠে নকশাল ঢোকাবার অপরাধে বেচারী চাকুরীটি হারায়। অনেকদিন পর্যন্ত নকশালদের সঙ্গে সে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলো। অধ্যাপক সুশীতল রায় চৌধুরী বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ করে যখন নিহত হলেন, তারপর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

সক্রিয়ভাবে আর তেমন জড়িত নয় বটে, কিন্তু এখনো অনেকের সঙ্গে তার ভীষণ মাখামাখি। কোলকাতায় একটা মাস্টারীর চাকুরী জুটিয়ে নিয়ে মা ভাইয়ের সংসারে দিন কাটাচ্ছে। ভীষণ জেদী এবং একরোখা মেয়ে।

তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই খোলামেলা। আমরা একজন আরেকজনকে তুমি সম্বোধন করি। মাঝে মাঝে আমার অবস্থা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, কয়েক ঘণ্টা সুনন্দাদের বাড়ীতে কাটিয়ে মনটাকে অনেকটা ঝরঝরে করে তুলি।

বাসে গড়িয়াহাটা পর্যন্ত এসে বাকী পথটা টানারিকশায় গেলাম। এটা এ অবস্থায় অনেকটা বিলাসিতা বটে। কিন্তু হাঁটার জন্য পায়ে কোনো জোর পাচ্ছিলাম না। গোলপার্কের বাড়ীতে গিয়ে বেল টিপতেই সুনন্দা নিজে এসে দরোজা খুলে দিলো।

আমাকে দেখে সে বেশ খুশী হলো। জানো দানিয়েল, আজ ভাবছিলাম বৌবাজার গিয়ে তোমাকে খুঁজে বের করবো। হোস্টেলটা চিনিনে বটে। ঠিকানা তো ছিলোই, খুঁজে বের করতে কতোক্ষণ। বাংলাদেশের ছেলেদের একটা সারপ্রাইজ দিয়ে দিতাম।

যাওনি যখন সেকথা বলে আর কি লাভ! আমি তো প্ল্যান করেছিলাম যাবোই। মাঝখানে বৌদি দাদাকে ধরে তার বোনের বাসায় নিয়ে গেলো। আর মা চলে গেলেন রামকৃষ্ণ মিশনে। ওখানে অক্ষরানন্দ নামে কোন এক স্বামীজী এসেছেন। আর তাঁর মুখের বচন নাকি খুব মিষ্টি। আমি বেচারী বাড়ীতে বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি।

নিতান্ত আটপৌরে কথাও সুন্দরভাবে বলতে জানে সুনন্দা। আমি বললাম, সুনন্দা, পয়লা এক কাপ চা খাওয়াবে? ও মা, চা তো খাবেই। ভেতরের দিকের দরোজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলো, এই অচলা, অচলা। কাজের মেয়েটি এলে বললো, দু'কাপ চা করে আন। আর দেখ, খাবার মতো কি আছে। আমি বললাম, সুনন্দা আর কিছুর প্রয়োজন নেই। খাবো না শুধু চাটা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সুনন্দা বুদ্ধিমতি মেয়ে। বললো, দানিয়েল নিশ্চয়ই তোমার একটা কিছু হয়েছে। কিছু একটা তো নিশ্চয়ই হয়েছে। বললাম, নইলে শুধোশুধি তো তোমার কাছে আসিনে। সে বললো, কথা না বাড়িয়ে সেটা বলে ফেলো না কেনো?

আমার সে পরিচিতা মহিলা, যার কথা তোমাকে বলেছি, গত পরশু তার দেখা পেয়েছি। সুনন্দা থামালো আমাকে, তাহলে তো পেয়েই গেছো। আমাদের বাসায়

কেনো এসেছো, সেকথা বলো শুনি। আমি বললাম, সুনন্দা তার যে খুব অসুখ। ডাক্তার বললো, ক্যান্সার। বাঁচবে সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এখন কোথায় আছে? পিজি হাসপাতালে। তুমি কেমন করে খুঁজে বের করলে? সেকথা থাকুক, সুনন্দা। খুঁজে বের করে কি লাভটা হলো! তোমরা বেটাছেলেরা ভয়ানক নেমকহারাম। সবসময়ে লাভ খুঁজে বেড়াও। কাজের মেয়েটি চা দিয়ে গেলো। চায়ে চুমুক দিতেই আমার মনে হলো, আমার শরীরে প্রচণ্ড শীত লাগছে। আমি কেঁপে কেঁপে উঠছি। প্লিজ, সুনন্দা, ফ্যানটা বন্ধ করে দাও। আমি শীতবোধ করছি।

ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে সুনন্দা বললো, দানিয়েল এতোক্ষণ খেয়াল করিনি। তোমাকে খুব সিক দেখাচ্ছে। তোমার চোখদুটোও জবাফুলের মতো লাল হয়ে গেছে। আমাকে সিক দেখাচ্ছে, সে জন্য দুঃখিত নই। জ্বর আসছে সেটা ভাবনার বিষয় নয়। আমার দুঃখ লাগছে এখানে এসে এ অবস্থা সৃষ্টি করলাম কেনো?

চায়ের কাপে শেষ চুমুকটি কোনোরকমে দিয়ে বললাম, সুনন্দা কিছু মনে করো না। আমাকে এখন উঠতে হবে। সুনন্দা বললো, পাগলামো করো না দানিয়েল, চুপচাপ বসে থাকো। আমি একখানা চাদর এনে দিচ্ছি। ভালো করে গায় জড়িয়ে নাও। চাদর জড়িয়ে নিলাম বটে, কিন্তু সে শীত শীত ভাবটি আরো প্রবল হলো। হিমালয়ের যতো ঠাণ্ডা হঠাৎ করে আমার শরীরে কেউ যেনো ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাঁপুনির তোড়ে বাতাসলাগা চারাগাছের পাতার মতো কেঁপে উঠছিলাম।

আমি আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সুনন্দা এবার আমি যাই, তোমাকে এ বিব্রত অবস্থায় ফেলার জন্য আমি খুবই লজ্জিত এবং দুঃখিত। ঘরের চৌকাঠ অবধি গিয়ে ড্রয়িংরুমের কার্পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। সুনন্দা আমার হাত ধরে টেনে তুলে ড্রয়িংরুমের স্ক্রীনটা সরিয়ে একখানি বিছানায় শুইয়ে দিলো এবং একখানি বড়ো লেপ এনে শরীরের ওপর চাপিয়ে দিলো।

শীতের ভাগ কমেছে কিন্তু শরীরের তাপ জাগতে আরম্ভ করেছে। উত্তাপে আমি ছটফট করছিলাম। আমার সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হয়ে আসছিলো। প্রাণপণ শক্তিতে চেতনা আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করছিলাম। সবকিছু ছাপিয়ে একটা প্রবল তীক্ষ্ণ ধিক্কারধ্বনি আমার চেতনালোকে রণিত হয়ে উঠলো। সুনন্দার ভাই বৌদি মা এসে যদি দেখে একটা বাইরের মানুষ শরীরে জ্বর নিয়ে তাদের বাড়ীতে শুয়ে আছে তখন কি মনে করবেন আর সুনন্দাও বা কি কৈফিয়ত দেবে! এ লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছিলাম।

আমি সুনন্দাকে মিনতি জানালাম, এ অবস্থায় আমার থাকা সম্ভব নয়। আমাকে আমার দেশের লোকের কাছে যেতেই হবে। একটা ট্যাক্সি আনিয়ে যদি তুমি আমাকে তুলে দাও, আমি তোমার প্রতি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

সুনন্দা কপালে টোকা দিতে দিতে কি যেনো চিন্তা করলো। তারপর বললো, ঠিক আছে আমিই তোমাকে ট্যাক্সিতে করে বৌবাজার রেখে আসবো। একটু অপেক্ষা করো, আমি পাশের বাসার ফুল্লু মাসীকে বাড়ী পাহারা দেয়ার জন্য ডেকে আনি। একটু পরে ট্যাক্সি এলো। সুনন্দা আমার পাশে বসলো এবং ড্রাইভারকে

বললো, বৌবাজার ভীমনাগ কা দোকান থে না, ওধার চলো। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বেশ কবার গলগল বমি করে ফেললাম। বেলা পাঁচটা হবে হয়তো। সুনন্দাসহ ট্যাক্সি থেকে নেমে আমাদের রুমে এলাম।

বাইরের কেউ নেই তবে বাংলাদেশের ছেলেরা সবাই আছে। আমাকে সবাই দেখে হৈ হৈ করে উঠলো। আমি আরেক দফা বমি করে ফেললাম। সুনন্দা আমাদের থাকার ব্যবস্থা সব নিজের চোখে দেখলো। আমি বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছি। সুনন্দাদের বাসায় একবার নরেশদা আমার ’সঙ্গে গিয়েছিলেন। সুনন্দার সঙ্গে তাই তার পরিচয় আছে। সে নরেশদাকেই বললো, আপনাদের এখানে টেলিফোন আছে? নরেশদা বললেন, নীচে একটা কয়েন বক্স আছে, কোথাও টেলিফোন করবেন নাকি? হাঁ, আমার এক জামাইবাবু আর জি কর মেডিক্যাল হাসপাতালের ডাক্তার। দেখি সেখানে ভর্তি করিয়ে দেয়া যায় কিনা। আপনাদের এখানে তো একজন সিরিয়াস রোগীর থাকার বিশেষ সুবন্দোবস্ত নেই। নরেশদা এবং সুনন্দা টেলিফোন করে এসে ধরাধরি করে আমাকে একটা ট্যাক্সিতে ওঠালো। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। শুধু এটুকু মনে আছে, সংজ্ঞা হারাবার আগে বলেছিলাম নরেশদা তনুর হাসপাতালের ঠিকানাটা সুনন্দাকে দেবেন। ওরা আমাকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলো।

আর জি কর হাসপাতালে দু’দিন আমার কোনো জ্ঞান ছিলো না। তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখি আমার শিয়রের পাশে টুলের ওপর সামনের দিকে ঝুঁকে সুনন্দা বসে রয়েছে। সহসা আমার মুখে কোনো বাক্যস্ফূর্তি হলো না। এ আজব জায়গায় কেমন করে এলাম, সেকথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। দানিয়েল, তোমাকে নিয়ে সকলের কি ধকলটাই না গেছে। আমি বললাম, এটা তো একটা হাসপাতাল মনে হয়, কোন হাসপাতাল? সুনন্দা, আমাকে এখানে কে এনেছে? সুনন্দা বললো, এটা আর জি কর মেডিক্যাল হসপিটাল, তোমাকে আমরাই এনেছি। কেনো এনেছো? তোমার কি মনে পড়ে না, আমাদের বাড়ীতে তোমার শরীরে খুব জ্বর এসেছিলো আর ট্যাক্সিতে সারা পথ বমি করেছিলে?

আমি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা পরম্পরা স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। আবছা কুয়াশার মতো তনু, ড. মাইতি, নরেশদা, জাহিদুল হক ও হেলেনের ছবিগুলো একটার পর একটা মনের আকাশে ভেসে উঠলো। কিন্তু একটা সূত্রের সাহায্যে একটার সঙ্গে আর একটা জুড়তে পারছিলাম না। সে যন্ত্রণার ঘোরেই, আহ সুনন্দা বলে পাশ ফিরলাম।

সুনন্দা জিগগেস করলো, দানিয়েল, খুব কি ব্যথা লাগছে? আমি বললাম, খুব, খুব ব্যথা, মাথাটা আমার যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। ঘাবড়ে যেয়ো না। ব্যাটাছেলেদের একটু শক্ত হতে হয়। মাথা এদিকে ঘোরাও দেখি। একটু আইস ব্যাগটা লাগাই। জ্বরের রেমিশন দেয়ার পর তুমি সাত সাতটি ঘণ্টা একনাগাড়ে ঘুমিয়েছো। অতএব দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের সবাইকে কি দুশ্চিন্তায়ই না ফেলে দিয়েছিলে!

আমি বললাম, সুনন্দা একটু পানি। তেষ্টায় বুকটা ফেটে গেলো। সুনন্দা বোতল থেকে একগ্লাস পানি ঢেলে দিলো। আমি মাথা তুলতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আপনা আপনি বালিশের ওপর এলিয়ে পড়লাম। থাক, থাক, তোমার আর কষ্ট করার দরকার নেই। সুনন্দা একহাত আমার ঘাড়ের নীচে রাখলো আরেক হাতে ঠোঁটে গ্লাস ঠেকিয়ে বললো, এখন জল খাও। আমি পুরো গ্লাসের পানিটাই খেয়ে নিলাম।

সুনন্দা বললো, আরও দেবো? হাঁ দাও সুনন্দা। আরেক গ্লাস পানি সে আমার ঠোঁটের কাছে ঠেকালো। খেয়ে নিলাম। পানি খেয়ে মনে হলো একটু বল পেলাম। কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করেছিলো। সুনন্দা, তোমরা পানিকে জল বলো। আমরা পূর্ব বাংলার মানুষেরা পানিই বলি। তুমি যদি চাও এবার থেকে আমি পানিকে জলই বলবো। কিন্তু বহুদিনের পুরোনো অভ্যেস তো, বদলাতে চায় না।

ওমা, তুমি দেখছি গা থেকে জ্বর নামতে না নামতে জলপানির বিষয়টা চর্চা করতে লেগেছো। তুমি খুবই দুর্বল। দু'দু'দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছটফট করে কাটিয়েছো। এখন অধিক কথাবার্তা না বলে দয়া করে চুপচাপ থাকার চেষ্টা করো। আমি বললাম, আচ্ছা সুনন্দা, আমার এরকম একটা অসুখ হয়েছে, নরেশদা জানেন না? তাকে দেখছিনে কেনো?

সে ফিক করে হেসে ফেললো। তাহলে তোমার অচেতন শরীরটা দিনেরাতে পাহারা দিলো কে? সারা সকাল ছিলেন। তোমাকে নিশ্চিন্ত ঘুমোতে দেখে তিনি হোস্টেলের দিকে গেছেন। সন্ধ্যের দিকে এসে পড়বেন। তোমার আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই। তিনি না আসা অবধি আমি এখান থেকে নড়ছিনে।

তখনি, ঠিক তখখুনি আমার তনুর কথা মনে পড়ে গেলো। নিজের অসুখের কথা ভুলে গেলাম। দুর্বলতার রেশটুকু ঝেড়ে ফেলে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। সুনন্দাকে জিগগেস করলাম, সুনন্দা তোমাকে তনুর কথা বলেছি না, তনু কেমন আছে বলতে পারো? জানো তার কোনো সংবাদ? নরেশদা কি একবার তাকে দেখতে পিজি হাসপাতালে গিয়েছিলেন?

উনি পিজি হাসপাতালে ছুটোছুটি করলে তোমাকে দেখাশোনা করতো কে? আরে বাবা, শুয়ে পড় না। অতো উতলা হওয়ার কি আছে? তনু দিব্যি আছে। তুমি কেমন করে জানলে, সুনন্দা? জানবো না কেনো, আজ তিন দিন ধরে আর জি কর এবং পিজিতে ছুটোছুটি করার চাকুরীটা তো করছি।

সুনন্দার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেলো। গলা দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। চোখ মেলে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অমন করে কি দেখছো, দানিয়েল? অসুখের মধ্যেও অনুভব করলাম লজ্জায় আমার কানদুটো গরম হয়ে উঠলো। কিছু একটা বলা দরকার, তাই বললাম, সুনন্দা তোমার কথা সারা জীবন মনে থাকবে। সমস্ত জীবনে তোমার ঋণ শোধ দিতে পারবো না। সে ঈষৎ বিরক্ত হয়েই বললো, যদি শোধ দিতে না পারো ঘাড়ে ঋণের বোঝা নিয়েই মারা যেয়ো। এখন দয়া করে একটু চুপ করো।

হাসপাতালের জানালা দিয়ে দেখলাম, কোলকাতা শহরের বাতিগুলো জ্বলে উঠতে আরম্ভ করলো। সুনন্দা মুখের ভেতর একটা এলাচ দানা পুরে বললো, এসময়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলা ঠিক না। তবু একটা কথা বলতে চাই। তোমার জ্বরে পড়ার পর থেকে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, মহিলাদের শ্রদ্ধা লাভ করা যায় শুনে আমার বারবার জ্বরে পড়তে ইচ্ছে করছে।

আমার কথা গায়ে না মেখে সে বললো, আমাদের বাড়ীতে প্রচণ্ড জ্বরের আক্রমণের সময় যখন তোমাকে শুইয়ে দিয়েছিলাম, ইচ্ছে করলে তুমি সেখানে থাকতে পারতে। মা দাদা বৌদি সকলেরই তোমার ওপর একটা ভালো ধারণা আছে। তাছাড়া নিরাশ্রয় সহায়হীন অসুস্থ প্রবাসীর একটা মানবিক দাবী তো আছেই। সে অবস্থায় তোমার চলে আসার দৃঢ় সংকল্প দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। বাড়ীর সকলেও শুনে বিস্মিত হয়ে আছেন।

এটা আমার ভাবতে আনন্দ হচ্ছে যে অন্তত একজন বাংলাদেশের মানুষ আমাদের পরিবারের লোকদের কাছে তার দেশের ইমেজ উজ্জ্বল করতে পেরেছেন। আমি বললাম, ধন্যবাদ সুনন্দা। সে ভয়ানক খেপে গেলো। তোমার সঙ্গে কথা বললে বিরক্তিই শুধু বাড়ে। কথায় কথায় এতো আদব লেহাজ প্রকাশ করতে থাকো যে মনে হয় লখনৌয়ের সরাইখানার খিদমতগারের সঙ্গে কথা বলছ।

আমি বললাম, ওটাই তো আমাদের একমাত্র সম্বল। সে আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে একটা প্লেট ধুয়ে ছুরি দিয়ে আপেল কাটতে লাগলো। তারপরে প্লেটটা আমার সামনে রেখে বললো, আরো তিনবেলা বোধ হয় তোমাকে ফলাহার করেই কাটাতে হবে। আপেল আর একটা কাটতে হবে। নাও এগুলো খেতে থাকো।

আপেলের একটা কাটা টুকরো নিয়ে মুখে দিলাম। দাঁত দিয়ে চাপ দিতেই কেমন পানসে এবং বিস্বাদ মনে হলো। বললাম, সুনন্দা খেতে যে ইচ্ছে করছে না। মুখে কেমন কেমন লাগছে। তা তো লাগবেই। তুমি না টাইফয়েডের রোগী। যতোই খারাপ লাগুক তোমাকে সবটা খেতে হবে। আমি কিন্তু কেটে পড়লাম। ওই যে তোমার নরেশদার লম্বা দাড়ি দেখা গেলো। শাড়ীর খুটে চশমাজোড়া পরিষ্কার করে নাকের ডগায় চড়িয়ে নিলো, আমাকে একটি কথাও বলার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সুনন্দা চলে যাওয়ার এক মিনিটও হয়নি। নরেশদা রুমে প্রবেশ করলেন। আধশোয়া অবস্থাতেই জিগগেস করলেন, এখন কেমন বোধ করছো? ম্লান হেসে বললাম, ভালো। তিনি হাতের ফ্লাক্সটা টেবিলের ওপর রাখলেন। কাটা আপেলের প্লেটটাতে চোখ পড়তেই বলে উঠলেন, বাহ্, চমৎকার দেখছি, আমার বাকী কাজটুকু উনিই সমাধা করে গেছেন। এখন আপেলের টুকরোগুলো শেষ করে দুধটা খেয়ে একটা ঘুম দাও। তিনি গ্লাসে দুধ ঢাললেন। কিছু খাওয়ার প্রবৃত্তি হচ্ছিলো না। কিন্তু নরেশদার সঙ্গে জোরাজুরি করে বিশেষ লাভ হবে না জেনে

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সব ক'টা আপেলের টুকরো চিবিয়ে গলার নালীর মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর দুধটুকুও।

নরেশদা আর আমি দুজনের কেউ কথা বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণের জন্য একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তিনি কাঠের তাকটা হাতড়ে তিনটা হলুদ সবুজ ক্যাপসুল বের করলেন। তারপর বললেন, হা করো দেখি। আমি হা করলে হায়ের ভেতর ক্যাপসুল তিনটা ছেড়ে দিয়ে হাতে এক গ্লাস পানি ধরিয়ে দিলেন। কালকেও ঘুম থেকে উঠে এখান থেকে তিনটি ক্যাপসুল খাবে। হাসপাতালে এগুলো পাওয়া যায় না, বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

আমি হঠাৎ করে জ্বরে পড়ে কতো লোককে যে কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি সেকথা ভেবে মনে মনে ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়লাম। নরেশদা বললেন, এখন শুয়ে পড়ো। কালকে আসতে পারবো না। একবার রাজার মঠে গিয়ে দেখে আসতে হবে মা-বাবা কি অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেছেন। দাদারও তো বড়ো সংসার। কি করে যে সামাল দেবেন তাই ভাবছি! কিছু পয়সা রোজগারের উপায় না দেখলে আর চলছে না। সুব্রতবাবু কেবল কথা দিচ্ছেন আর দিচ্ছেন।

জানতে চাইলাম, নরেশদা আপনি কি এখখুনি চলে যাবেন?

হাঁ, কোনো কিছু বলবে? আমি উসখুস করতে করতে বলেই ফেললাম, আপনি কি তনুর কাছে গিয়েছিলেন? কি করে যাই বলো তো, এদিকে তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সুনন্দা এখানে আসার পথে রোজ একবার করে তো দেখে আসছেন। সুনন্দা কি প্রতিদিন হাসপাতালে এসেছে? নরেশদা হাঁসূচক মাথা নাড়লেন। কালকে সন্ধ্যেয় তো দাদা, বৌদি এবং মাকে নিয়ে এসেছিলেন। গোটা পরিবারটির সহৃদয়তার কথা চিন্তা করে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কতো আর চেনা! সর্বসাকুল্যে মাত্র পাঁচবার সুনন্দাদের বাড়ী গিয়েছি। কোনোবারই দু'ঘণ্টার বেশী সময় কাটাইনি। আমার তখন নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। মা চেরাগের আলোতে ভাতের থালাটি সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। একটি গ্রাসও মুখে তুলতে পারছে না। পাঁড়াগায়ে অন্ধকার আরো নিবিড়, আরো ভুতুড়ে হয়ে আমাদের বাড়ীটাকে বেষ্টন করে আছে। বাঁশঝাড়ের ভেতর শেয়াল ডাকছে। মা অন্ধকারে কান পেতে আছে, চোখ মেলে আছে।

সাড়ে আটটার ট্রেনের হুইসিল শুনলে হেলেপড়া কাঁঠাল গাছটির গোড়ায় দাঁড়াবে কিছুক্ষণ। নাকি কেউ ট্রেন থেকে নেমে পুকুরের কোণায় এসে মা বলে ডাক দেয়—সে আশায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। পত্রপতনের শব্দে চমকে চমকে উঠবে। কোথাও কেউ নেই, শুধু বাতাসের কারসাজি, শুধু পাতার সরসর শব্দ। মা খাবারের থালাটি সরিয়ে রাখবে। কোরান শরীফ রেহেলের ওপর রেখে পড়তে চেষ্টা করবে। চোখের পানিতে সব ঝাপসা হয়ে আসবে। আল্লার কালাম গলদ পড়লে অমঙ্গল হয়, সে ভয়ে কোরান শরীফে চুমু খেয়ে আবার তুলে রাখবে।

একটা বই খুলে কিছু পড়তে চেষ্টা করলাম। বড়ো কষ্ট হয়। এক একটা শব্দ পাথরের মতো ভারী লাগে। সাড়ে আটটা না বাজতেই চোখের পাতা বুজে আসছিলো। একথা সেকথা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন থেকে হাসপাতালে একটা নতুন উৎপাত শুরু হলো। ভাসমান অসহায় নিষ্কর্মা দলছুট গুলবাজ যতো মানুষ কোলকাতা শহরে এসে জুটেছে তার একটা অংশ প্রতিদিন রোগী সন্দর্শনে হাসপাতালে এসে ভীড় জমাতে আরম্ভ করেছে। পয়লা কয়েকদিন আমার খুব ভালো লাগছিলো। আমার দেশের এতোগুলো মানুষ আমাকে ভালোবাসে, রোজ খবর নিতে আসে, একথা চিন্তা করে একটা ভালোরকম চিত্তসুখ অনুভব করছিলাম। কিন্তু দু'দিন না যেতেই সে ধারণাটা ভেঙে খান খান হয়ে গেলো।

আসলে এই দর্শনার্থীদের অনেকেরই কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই আমার শয্যার চারদিকে ভীড় করে। আমাকে দেখা একটা উপলক্ষ মাত্র, এতোগুলো জোয়ান ছেলে ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। সময়ের খরতরো স্রোতের মধ্য দিয়ে অসহায় খড়কুটোর মতো বয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তাদের কেউ যদি ভালো কাপড় পরে—কোলকাতা শহরের একশ্রেণীর মানুষ ওদের দেখিয়ে বলে, এই দেখো জয়বাংলার মুক্তিসংগ্রামীরা কেমন ধোপদুরস্ত কাপড়চোপড় পরে ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি পরনে ময়লা নোংরা কাপড়চোপড় থাকে, তখনো অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে—নোংরা বিচ্ছিরি, এই হতচ্ছাড়াদের দেখলে কার মনে প্রত্যয় জন্মাবে যে, এরা একটা মুক্তিযুদ্ধ করতে পারে?

যদি জোরগলায় কথা বলে, তখন মন্তব্য করে, ব্যাটা ভিখিরিদের আস্পর্ধা দেখো! এখানে থেকে, এখানে খেয়ে চোখরাঙ্গানো চলছে। ব্যাটাদের ঘাড় ধরে বর্ডারের ওপারে পাঞ্জাবীদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। কোলকাতার মানুষদের কাছে যদি বিনয় দেখিয়ে কথা বলা হয়, অমনি সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। এই সমস্ত ম্যাদা লোকেরা পাঞ্জাবীদের তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করবে! তাহলে তো পুবের সূয্যি পশ্চিমে উঠবে গো।

প্রতিটি দলের লোকদের একেকটা মনগড়া মাপকাঠি আছে, তাই তারা স্বভাবতই কামনা করে বাংলাদেশের ছেলেরা এভাবে কথা বলুক, ওভাবে চলাফেরা করুক এবং তাদের নির্দেশিত পদ্ধতিতে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঞ্জাবীদের মেরেকেটে এমন একটা নাজেহাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করুক যাতে করে তারা হনুমানের পাতালবিজয় জাতীয় একটা লোমহর্ষক ছায়াছবি মাটির বাস্তবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

গোড়ার দিকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি এটাই ছিলো পশ্চিম বাংলার বেশীর ভাগ মানুষের মনোভাব। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে একটা উৎকণ্ঠা পরিপূর্ণ হিন্দী ছবির স্যুটিং চালাচ্ছে। থ্রিল আছে, রোমাঞ্চ আছে, প্রাণদেয়ার প্রাণনেয়ার তীব্র উত্তেজনা আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যখন সীমান্ত অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে ভারতে প্রবেশ করলো, দেখে পশ্চিম বাংলার মানুষের ভয়ানক আশাভঙ্গ হলো।

পশ্চিম বাংলার মানুষের মতো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে কেউ এতো বেশী প্রত্যাশা করেনি এবং এতো বেশী হতাশও হয়নি। দলে দলে শরণার্থী, মলিনমুখো ছেঁড়া ত্যানা পরনে, যখন বন্যার স্রোতের মতো পশ্চিম বাংলাতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলো, তাদের স্টেশনগুলোতে যখন দল বেঁধে সংসার পেতে বসবাস করতে আরম্ভ করলো, তাদের ট্রেনগুলোতে বিনা টিকিটে মলিন বস্ত্রে ভীড় করতে লাগলো, তাদের পার্ক এবং উদ্যানগুলোর শোভাসৌন্দর্য নষ্ট করতে থাকলো, তাদের শহরগুলোর পৌরপিতাদের ঘুমের ব্যাঘাত ভালোমতো ঘটাতে শুরু করে তেল নুন লাকড়ি এমনকি পানির গ্লাসটিতেও দাবী জানাতে শুরু করলো তখন, তখনই পশ্চিম বাংলার মানুষ কল্পনা-কবিত্বের কুয়াশাটুকু সরিয়ে দিয়ে সাদা চোখে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের আসল রূপটা দেখার সুযোগ লাভ করলো।

বাড়তি সত্তর আশি লক্ষ মানুষের চাপ সে কি চাট্টিখানি কথা! পশ্চিম বাংলার নাভিশ্বাস উঠছে।

আট

সেপ্টেম্বর মাস শেষ হওয়ার পথে। ইন্দিরা গান্ধী পাশ্চাত্যের দেশগুলো সফর করে এসেছেন। কোলকাতার ময়দানে মিটিং করে গেছেন। ভূটান বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রুশ-ভারত সামরিক চুক্তি হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অপেক্ষাকৃত ভারী অস্ত্র সরবরাহ করতে আরম্ভ করেছে ভারত সরকার। তারা সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ জোরদার করেছে। গেরিলা ইউনিটগুলো দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। এমআর আখতার মুকুল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে বসে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী সেনা হত্যা করছেন। চারদিকে একটা সাজো সাজো রব।

ওদিকে ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদে মদের গেলাসে চুমুক লাগিয়ে গোঁফে নাড়া দিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন। বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে বয়ান করছেন, সারাক্ষণ কিন্তু আমি বসে বসে মদ খাবো না। সময় এলে ফ্রন্টে চলে যাবো এবং ঐ মেয়েমানুষটিকে দেখে নেবো।

ভূট্টো চীন যাচ্ছেন। আমেরিকা সেভেন্থ ফ্লিট পাঠাবে গুজব উঠেছে। আলবদর এবং রাজাকারের সংখ্যা দ্বিগুণ তিনগুণ করা হয়েছে। শান্তিবাহিনীর লোকেরা সবকিছু থেকে ফায়দা ওঠাচ্ছে। এরই মধ্যে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেললো। তারপর সোভিয়েত রাশিয়া। তারপর ভারত।

সকলে দেখলো একটা যুদ্ধের পটভূমি তৈরী হয়ে গেছে। শুধু একটা বাড়তি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন। অমনি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

আমি তো হাসপাতালে পড়ে আছি। যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তার তরঙ্গ এসে আমার চেতনায় আছড়ে পড়ছে। বাংলাদেশের ছেলেরা রোজ বিকেলবেলা এসে

আমার শয্যার পাশে জড় হয়, কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সব আলোচনা করে। মারাত্মক জ্বর আমার শরীরটাকে এতো দুর্বল এবং অক্ষম করে দিয়ে গেছে যে বিছানা থেকে বহু কষ্টে উঠে কোনোরকমে বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারি। উত্তেজক সংবাদ শুনলে আমি রাতে ঘুমোতে পারিনে। যেদিন রাতে ভালোভাবে ঘুম হয় না, সকালবেলা শরীরে তাপ দেখা দেয়। অসুখ সেরেও সারে না। আরো একটা নতুন উপসর্গ এসে জুটেছে। ক'দিন ধরে সারাক্ষণ খকখক করে কাশছি। একবার বেগ হলে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে হয়।

আমাকে নিয়ে একাধিক কারণে ডাক্তারেরা চিন্তিত হলেন। প্রথমত আমার অসুখটি সারছে না। হাসপাতালে এসে রোগীর অসুখ যদি না সারে সে দায়িত্ব সাধারণত হাসপাতাল বহন করে না। কিন্তু এখানে অন্য একটা ব্যাপার জড়িয়ে গেছে। সুনন্দার জামাইবাবু এই হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার। সুতরাং শ্যালিকার পেসেন্ট যদি ভালো না হয় তাহলে শ্বশুর গোষ্ঠীর কাছে জামাইবাবুর মুখ যে রক্ষা হয় না।

দ্বিতীয় কারণটি এই যে সকাল বিকেল দলবেঁধে বাংলাদেশের যে সকল ছেলে আসে তারা হাসপাতালের নিয়মকানুনের কোনো ধার ধারে না। ভিজিটিং আওয়ারের পরেও তারা আমার বিছানার চারপাশে বসে উচ্চরবে তর্ক করে, কথা কাটাকাটি করে। এতে অন্যান্য রোগীর ভয়ানক অসুবিধে হয়। আমি দুর্বল কণ্ঠস্বরে সতর্ক করে দিলে কিছুক্ষণ হয়তো আস্তে কথা বলে, কিন্তু একটা সময়ে সেকথা সবাই ভুলে যায়। এরকম প্রায় সাত আট দিন চলেছে। বাংলাদেশের মানুষ বলে করুণা কিংবা সঙ্কোচবশত কেউ কিছু বলেনি।

একদিন বিকেলবেলা সুনন্দা বললো, দানিয়েল, একটা ব্যাপারে একটু সিরিয়াসলি আলাপ করতে চাই। আমার সমস্ত সিরিয়াস বিষয়ের ভার তো সুনন্দার ওপর ছেড়ে দিয়েছি। বলতে গেলে একাই তো সে আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে এবং প্রতিদিন তনুকে দেখে আসছে। বললাম, সমস্ত ব্যাপার তো তুমিই কাঁধে তুলে নিয়েছো। এর বেশী আর কিছু আছে নাকি?

সে বললো, দেখো দানিয়েল, তোমার সুস্থ হয়ে ওঠা প্রয়োজন। প্রায় দশ বারো দিন হয়ে গেলো হাসপাতালে। প্রতিদিন একগাদা লোক যদি এখানে এসে জটলা পাকায়, আড্ডা করে, তিন মাসেও তুমি ভালো হতে পারবে না। আজকে জামাইবাবু আমাকে ডেকে একথা স্পষ্ট বলেছেন। দেশের মানুষ মানলাম, এখানে এসে প্রতিদিন ভীড় করার কি যুক্তি থাকতে পারে? তোমার বন্ধুদের ভীড় না করতে বলবে।

বললাম, সুনন্দা আমার অসুখটা উপলক্ষ মাত্র। এদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই আসে। আমি বললে কে কিভাবে নেবে, বরং তুমি একদিন একথাটা বলে দাও না? সে রেগে আগুন হয়ে গেলো। আমি বলি আপনারা এখানে ভীড় করবেন না, তাই না? আর তোমার দেশের লোকেরা সবখানে বলে বেড়াক... দুলাল তালুকদারকে এক মাস বাড়ীতে রেখে আমার ভালোমতোন শিক্ষা হয়ে গেছে। তুমি তখনো কোলকাতা আসোনি, দুলাল যখন আমাদের বাড়ীতে উঠে

এলো, আমি আমার ঘরটা ছেড়ে পাশের বাড়ীর ফুল্লু মাসীর সঙ্গে থাকতে লাগলাম। তোমাদের সরকারের অধীনে ভালো একটা চাকুরী পাওয়ার পর সে আর তার বউ আমাদের বাড়ী থেকে চলে যায়। এখন আমাদের সম্পর্কে কি বলে বেড়ায় জানো? আমরা নাকি একখানা মশারী পর্যন্ত তাদের দেইনি।

এতোদিন পর্যন্ত তনুর ব্যাপারে সুনন্দার সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। আজকে একা পেয়ে জিগগেস করলাম, আচ্ছা সুনন্দা, তুমি তো তনুকে দেখতে যাচ্ছো প্রতিদিন। তার অবস্থা কেমন? কিছু বলতে পারো? সুনন্দা কথার জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেলো।

দানিয়েল, তোমার শক্ত হওয়া প্রয়োজন। মেয়েটা দিন গুনছে। তারপর আনমনে আবৃত্তি করলো, আউট, এ ব্রীফ ক্যান্ডেল। মোমবাতির মতোই তনুর জীবনকাঠি একটু একটু করে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। শেক্সপীয়রের সে লাইনটা বারবার আমি আবৃত্তি করতে থাকলাম, আউট, আউট এ ব্রীফ ক্যান্ডেল। আমার চোখের কোণায় দু'ফোঁটা পানি এসে জমা হলো। সুনন্দা কিছুই বললো না। সে বড়ো বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমার কিছুক্ষণ একা থাকা প্রয়োজন বুঝতে পেরেছে। বললো, এই আমি দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই আসছি। জামাইবাবু ফোন করেছেন, একবার দেখা করে যেতে হবে।

সুনন্দার চলে যাওয়ার পর নিজের অবস্থাটা খুঁটিয়ে চিন্তা করে দেখলাম। এখানে এই হাসপাতালে আমি পড়ে আছি। তনু পিজি হাসপাতালে একটু একটু করে নিঃশেষে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার সম্ভাবনা-পরিপূর্ণ জীবনের এ কি করুণ ধূসর পরিণতি! বুকের মধ্যে প্রবল একটা কান্নার বেগ বোধ করছিলাম। একটা হরিণশিশুকে শিকারীর গুলিতে মরতে দেখলে মনে যেরকম ব্যথা ঘনিয়ে আসে, খাঁচায় বাঁধা কথাবলা ময়নাপাখিকে হাত পা ছুঁড়ে চিরতরে নীরব হয়ে যেতে দেখলে যে বোবা বেদনার বেগ কণ্ঠনালী পর্যন্ত চেপে ধরে, বুকের গভীরে আমি তেমনি বেদনা হৃদপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে থাকা আমূলবিদ্ধ বর্শার ফলার মতো অনুভব করছিলাম। এইভাবে এই ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

আমার ভেতর ঝড়, বাইরে ঝড়। কোথায় যাবো, কি করবো আমি! এদিকে তনু মারা যাচ্ছে, ওদিকে যুদ্ধ হচ্ছে আর আমি অচল মালের বস্তার মতো হাসপাতালের একটি শয্যায় পড়ে রয়েছি। যেনো বহু যুগ যুগান্তর ধরে উদ্ভিদের মতো শিকড় প্রসারিত করে এক জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ছি, বিষ্টিতে ভিজছি—প্রবল বাতাসের বেগে এদিক ওদিক হেলে হেলে পড়ছি। নিজের ভেতরের জট ছাড়িয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতে পারছিনে। এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। হাঁ, এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন। আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবো।

সুনন্দা এলে আমি বললাম, সুনন্দা, হাসপাতালে আমি আর থাকতে পারবো না। যে করেই হোক, আমাকে চলে যেতে হবে। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আচ্ছা।

আমি হাসপাতাল থেকে সন্ধ্যেয় বেরিয়ে দেখলাম ব্ল্যাক আউটের মহড়া শুরু হয়ে গেছে। সর্বত্র একটা থমথমে পরিবেশ। ফুটপাথ ধরে সুনন্দার সঙ্গে হাঁটছিলাম। বললাম, সুনন্দা আমার কেমন কেমন জানি লাগছে। সুনন্দা বললো, আমারও। দেখছো না গোটা শহর কেমন ঝিম মেরে গেছে। আমার তো মনে হচ্ছে, আজ রাতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। একটু পা চালিয়ে এসো। একে তো দুর্বল মানুষ, তদুপরি অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। বললাম, একটু আস্তে যাও, আমি তো তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিনে। সুনন্দা একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তোমার যদি সাহস থাকে আমার হাতখানা ধরো।

বললাম, সুনন্দা অসহায় মানুষের কাছ থেকে তুমি সাহসের প্রত্যাশা করো কেনো? যদি তোমার হাত ধরি, তাহলে প্রয়োজনেই ধরবো। চলো, তাড়াতাড়ি রাস্তার মোড়টা পার হই। ও ধারে একটা ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। দেখলাম, সামনে একটা ছোট্টোমতো মসজিদ। দরোজা খোলা। আলোগুলোর উপর টুপি পরানো হয়েছে। দুজন মুসল্লী আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি বললাম, সুনন্দা, তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছো। সে তেতে উঠলো। বাপু কথায় অতো তেল লাগাও কেনো, যা বলবার সোজাসুজি বলে ফেলতে পারো না?

এই মসজিদ ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি যদি পাঁচমিনিট কাটিয়ে আসি, তুমি কি দয়া করে এ সময়টুকু আমার জন্য অপেক্ষা করবে? যেতে চাও যাও, আমি একটা ট্যাক্সি দরদাম করি।

অনেকদিন আগে ছোটোবেলায় গ্রামের মসজিদে নামাজ পড়েছি। তারপর অনেক বছর দু'ঈদ ছাড়া কখনো সেজদা দেয়া হয়নি। পানি রাখার হাউজের সামনে বসে অজু করতে চেষ্টা করলাম। ওমা, আমি কায়দাকানুন সব ভুলে গেছি। বারবার ভুল হচ্ছে দেখে হাতপা ভালো করে ধুয়ে ভেতরে প্রবেশ করে নিয়ত বাঁধার জন্য দাঁড়ালাম। নামাজের নিয়তও সব খেয়ে বসে আছি। উল্টোপাল্টা ভুলভাল হতে লাগলো। বিশুদ্ধভাবে মনে আনার বৃথা চেষ্টা না করে নিরন্তর জাগ্রত যে মহাশক্তি সমস্ত চরাচর, আকাশমণ্ডল বেষ্টন করে আছে তার নামে পরপর কয়েকটি সেজদা দিলাম। আমার মনে হলো, আমার শরীর অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। এখন যে কোনো পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি।

সুনন্দা একটা ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে। আমাকে বললো, বলো তো এখন তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, কেনো, হোস্টেলে। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, উহু, হোস্টেলে না, সেখানে অনেক বেশী গ্যাঞ্জাম। তারচেয়ে এক কাজ করো না, আজ রাতটা তুমি আমাদের বাসায় কাটাও। বাড়ীর সকলে তোমাকে সুস্থ হয়েছো দেখলে খুশী হবে। তা মন্দ হয় না। বলতে আমি দ্বিধা বা সঙ্কোচ কিছুই করলাম না। তবে তার কাছ থেকে কথা আদায় করলাম পথে হোস্টেলে এবং হাসপাতালে থামতে হবে।

প্রথমে হোস্টেলে এলাম। সমস্ত হোস্টেলটাও ফাঁকা। বোমা আক্রমণের ভয়ে নিশ্চয়ই বোর্ডাররা এদিক ওদিক নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় কেটে পড়েছে। আশঙ্কা

করেছিলাম নরেশদাকেও পাবো না। কিন্তু রুমে গিয়ে দেখলাম, তিনি ছোটোভাই ক্ষীতিশকে নিয়ে কাঁসার থালায় করে আলুসেদ্ধ এবং জল দিয়ে চটকে চটকে ভাত খাচ্ছেন।

আমাকে দেখে নরেশদা ভাতের গ্রাসটা মুখে দিতে পারলেন না, বাহ বাহ, চমৎকার সময়েই তুমি এলে। লোকে তো সকালবেলাতে হাসপাতাল থেকে রিলিজ নেয়, তুমি যে সন্ধ্যেবেলায়! বললাম, চলে এলাম। আর সব কোথায়? সময়টা তো বুঝতে পারছো, এখন কে কোথায় যায়, তার হিসেব রাখা সম্ভব নয়। ছেলেদের ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চাইতেও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি কোনোরকমে থালার ভাতটা শেষ করে হাত ধুয়ে গামছায় মুখ মুছলেন।

দাঁড়িয়ে রইলে কেনো, বসো? আমি বললাম, নীচে ট্যাক্সিতে সুনন্দা অপেক্ষা করছে। তাদের বাড়ীতে নাকি একবার হাজিরা দিতে হবে। আজ রাতটা যদি ওদের সাথে কাটাই আপনি কি কিছু মনে করবেন? তিনি বললেন, আজকের রাতটা কাটাও, কাল সকালে অবশ্যই চলে আসবে। এ সময়ে কাছাকাছি থাকা ভালো।

আমরা ট্যাক্সিতে রবীন্দ্রসদনটা পেরোতেই আবার আলো জ্বলে উঠলো। পিজির গেটে এসে সুনন্দা বললো, ট্যাক্সি ছেড়ে দিই, কি বলো? বাড়ীর তো অনেক কাছাকাছি চলে এলাম। তনুর রুমের সামনে উঁকি মেরে দেখি জাহিদুল হক। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সুনন্দার গতি আটকালাম। জাহিদুল হক হা করে আছেন। হায়ের ভেতর লালচে জিভটা পর্যন্ত আমার চোখে পড়ছে।

তনুর চোখে পানি। তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। জাহিদ ভাই, আমার মাকে এনে দেন। কালকে আমি মাকে নিজের চোখে ওইখানে আমার বিছানায় দেখতে চাই। জাহিদুল হক ন্যাকা ন্যাকা রাবীন্দ্রিক ঢঙে জবাব দিলেন, তনু, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো। হয়তো আজ রাতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এখন খোঁজ করবো কেমন করে?

তনু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, ন্যাকা ন্যাকা কথা সারাটা জীবন ধরে শুনে আসছি। আপনাকে আমাদের এখানে কে নিয়ে আসতে বলেছিলো? ঢাকায় থাকলে পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের তিন বোনকে হয়তো ব্যারাকে নিয়ে যেতো। তারা কি আপনার চাইতে খারাপ কিছু করতো?

জাহিদুল তনুর মুখে হাত চাপা দিলেন, তনু। একটু চুপ করো লক্ষীটি। আমি, আমি চেষ্টা করে দেখছি। সে প্রবল বেগে জাহিদুলের হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, যান, আপনি বেরিয়ে যান, দেখতে চাইনে আপনার মুখ। আপনি এবং আপনার বউ আমাদের পরিবারটাকে সাত টুকরো করে ফেলেছেন। আমি তো জানি, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।

একটা কথা শুধু আপনাকে আপনার চোখে চোখ রেখে বলে যেতে চাই, শিল্প সংস্কৃতি রাজনীতির নামে আপনারা সারা জীবন ধরে বদমায়েশীই করে আসছেন।

যান আপনি চলে যান জাহিদুল দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছেন। তার এ অবস্থা দেখে আমার করুণাই হলো। একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে সে ধপ করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো।

কি করবো চিন্তা করছি, এসময় ড. মাইতি এসে বাঁচালেন। এই যে দানিয়েল সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, তনু কি ঘুমিয়ে পড়েছে? আমি, সুনন্দা এবং ড. মাইতি রুমে প্রবেশ করলাম। ড. মাইতিকে দেখে জাহিদুল বিগলিত হেসে বললেন, এই যে মাইতিদা, আপনি এসে গেছেন। আমার তাহলে ছুটি আজকে আবার একটা জরুরী মিটিঙ্গে বসতে হবে। আপনি বোধ হয় জানেন, আজ রাতেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তনুর চুলে হাত বুলিয়ে জাহিদুল হক বেরিয়ে আসলেন। তার এ প্রস্থান দৃশ্য দেখে আমার যেনো পলায়মান হুলো বেড়ালের কথা মনে পড়লো।

তনুর উঠতে কষ্ট হচ্ছিলো। তবু উঠে বসলো। সুনন্দা বললো, দেখো তনু, হাসপাতাল থেকে দানিয়েলকে নিয়ে এসেছি। টুলটা দেখিয়ে বললো, বসো সুনন্দাদি, বসো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেলো। ইস দানিয়েল ভাই, আপনার মুখে দেখছি দাড়িগোঁফের জঙ্গল হয়ে গেছে। শরীরের অবস্থাও কি করে রেখেছেন! এখন কেমন আছেন? আমি বললাম, ভালো হয়েই তো হাসপাতাল থেকে এলাম। তোমার খবর বলো, তুমি কেমন আছো?

তনু ম্লান হাসলো। অস্তগামী সূর্যের শেষ আভার মতো সে হাসি। আমার বুকটা ধ্বক করে উঠলো। তারপর সে খুব গর্ব সহকারে বললো, জানেন দানিয়েল ভাই, দোলা অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে নার্সিং করতে ফ্রন্টে চলে গেছে। তনু আরো কি বলতে যাচ্ছিলো, ড. মাইতি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দানিয়েল সাহেব, আপনারা এখন আসতে পারেন। ড. ভট্টাচার্য আসবেন। কাল সকাল আটটার মধ্যে সম্ভব হলে আমার কোয়ার্টারে একবার আসবেন।

পিজির গেটে এসে সুনন্দা বললো, বাসে ট্রামে উঠতে ভয়ানক বিশ্রী লাগছে। একটা টানারিকশা নেই। নিশ্চয়ই তোমার মহিলাদের পাশে রিকশায় বসার অভ্যেস আছে। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। সে ইশারায় একটা রিকশা ডাকলো উঠে বসেই আপন মনে মন্তব্য করলো সুনন্দা, মেয়েটা ভালো। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। সে কনুই দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললো, কি, কথা বলছো না যে? বললাম, ভালো খারাপ চিন্তা করিনি। তনুকে সব সময়ে তনু বলে জেনে আসছি আমাদের দুজনের কারো মুখে কোনো কথা যোগালো না। নীরবে গড়িয়াহাটার রাস্তা বেয়ে রিকশা চলছিলো।

কিছুক্ষণ পর আবার মন্তব্য করলো, মেয়েটা তোমাকে প্রাণের থেকে ভালোবাসে আমার মুখ দিয়ে কাষ্ঠহাসি বেরিয়ে এলো। বললাম, সুনন্দা সেকথা যখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম, দেখলাম সবকিছুর ইতি ঘটে গেছে। আর ক'টা দিন সবুর করো, দেখতে পাবে সে ভালোবাসার অন্তিম পরিণতি

নয়

সে সময়ে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত চমকে দিয়ে সাইরেন বেজে উঠলো। সমস্ত বাতি নিভে গেলো। কোলকাতা মহানগরী অন্ধকারে সয়লাব হয়ে গেলো। অতি কষ্টে সুনন্দাদের বাড়ীতে এলাম। বাড়ীতে পা দিতেই দেখি, ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা দিচ্ছেন।

সারমর্ম এই পাকিস্তানীরা সাত সাতটি ভারতীয় নগরীতে বিমান হামলা চালিয়েছে। তাই ভারতকে আত্মরক্ষার্থে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হচ্ছে। সকলের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। আমার দিকে খেয়াল করারও কারো সময় নেই। আমি ইঁদুরের মতো চুপটি করে ড্রয়িংরুমে বসে আছি।

নরেশদার কথাই ঠিক, এ সময়ে দেশের মানুষদের কাছাকাছি থাকাই ঠিক। শেষ পর্যন্ত সুনন্দার মা আমাকে বললেন, বাবা তুমি ভালো হয়ে ফিরে এসেছো দেখে আমরা খুব খুশী হয়েছি। এখন একটু হাতমুখ ধোও। সুনন্দার দাদা আমার দিকে তাকালেন, খেয়ালই করিনি যে দানিয়েল তুমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছো। আমরা কি দুশ্চিন্তায় ছিলাম! যাক, ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছো। এখন একটু হাতপা ছড়িয়ে বিশ্রাম করো।

তারপর তিনি রেডিওর খবর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রেডিওতে আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণের সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। সংবাদ শেষ হলে তিনি মন্তব্য করলেন, এইবার পাকিস্তানীরা ভারতীয়দের হাতে একটা বড়রকম মার খাবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

সুনন্দার বৌদি বললেন, ভারতের ব্যাপারে সবসময় তুমি বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখো। বললেই আর হয়ে গেলো না। পাকিস্তানীরা যুদ্ধ জানে। দেখবে হয়তো আজ রাতেই কোলকাতা শহরে বোমা পড়বে।

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেছে। পাকিস্তানীরা আমাদের শত্রু, কিন্তু ভারতকে ঠিক বন্ধুও ভাবতে পারছিনে। ভারত যুদ্ধে জয়ী হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, একথা জানি। কিন্তু মনের মধ্যে কি একটা খচখচ করছিলো। উনিশশো বাহান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত আমরা যতো আন্দোলন করেছি, যতো রক্ত দিয়েছি, তার পরিণতি কি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে এই একটা যুদ্ধ!

এই অনুভূতিটা প্রকাশ করারও উপায় নেই। তাদের কথাবার্তার সঙ্গে হুঁ হাঁ করে কোনোরকমে সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা সুবিধে ছিল, আমি রোগী মানুষ বলে কেউ আমাকে দিয়ে জোর করে কথা বলাতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি হাজার চেষ্টা করেও এই যুদ্ধটাকে পুরোপুরি আমার যুদ্ধ বলে মেনে নিতে পারছিলাম না। অথচ এদের বাড়ীর সকলেই ধরে নিয়েছেন, ভারতের অগ্রগতির সংবাদে আমি ভীষণ রকম পুলকিত হচ্ছি।

সুনন্দা আমাকে বসিয়ে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। দুর্বল শরীর হেলে হেলে আসছিলো। দুত্তোরি ছাই, এখানে এলাম কেনো? কিন্তু ভয় হচ্ছিলো, আমার

মনের ভাবটা যদি কেউ ধরে ফেলেন সুনন্দার মা আমাকে ডাইনিং টেবিলের সামনে বসিয়ে বললেন, বাবা, এই ছানা আর লুচিটুকু খেয়ে তুমি শুয়ে পড়ো তুমি অসুস্থ মানুষ। এদের সঙ্গে বসে থাকলে তোমার চলবে না। শেষ খবর না শুনে আজ আর কেউ বিছানাতে পিঠ রাখবে না।

একটা অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলাম। লুচি এবং ছানাটুকু কোনোরকমে খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিলো, এই যুদ্ধে ভারত জিতবে ভারত জিতলে কি হবে, মনে মনে জল্পনা করছিলাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে হয়তো হবে।

কিন্তু তনুর কি হবে? সমস্ত চেতনায় মন্দ্রিত হলো তনু মারা যাবে এবং যাবে এখানে এই কোলকাতায়। আমার সব ভাবনা ফুরিয়ে এলো। তাহলে ভারতই জিতুক এবং তনু মারা যাক। একরম একটা নিশ্চিত ধারণা পোষণ করতে পেরে নিজেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত এবং নির্ভার মনে করলাম। তারপর ঘুমিয়ে গেলাম।

পরের দিন সকালে সকলের অনুরোধ উপরোধ একরকম অগ্রাহ্য করেই বলতে গেলে খালিমুখে ড. মাইতির কোয়ার্টারে এসে হাজির হলাম। বেল টিপতেই ড. মাইতি নিজে দরোজা খুলে দিলেন। তিনি চা খাচ্ছিলেন। আমাকেও এক কাপ চা ঢেলে দিলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ড. মাইতির দিকে তাকালাম। তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। চাটা শেষ করে তিনি উঠে গিয়ে হাসপাতালের কাপড়চোপড় পরলেন। তারপর বললেন, চলুন।

আমি তাকে অনুসরণ করতে থাকলাম। বাড়ীর সামনের সুরকীঢালা পথটুকু অতিক্রম করে বড়ো রাস্তায় পা দেয়ার পর, তিনি অত্যন্ত যান্ত্রিক স্বরে আমাকে ইংরেজীতেই বললেন, মি. দানিয়েল, টেক কেয়ার, ফাইন্যাল আওয়ার ইজ এপ্রোচিং ভেরী কুয়িকলি। আই এম অ্যাফ্রেড শি মে নট সারভাইভ এনাদার ফুল উয়িক।

মৃত্যুদণ্ডের চূড়ান্ত ঘোষণাটি দিয়ে ঘোষণাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের মতো দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে চলে গেলেন। একবার তাকিয়েও দেখলেন না আমার দিকে। ঠিক সে সময়ে আবার সাইরেন বাজলো। আমি ধরে নিলাম আকাশ থেকে বোমাটি সরাসরি নেমে এসে আমার মাথায় ফাটবে। আতঙ্কবশত আমি দুহাতে মাথা ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলাম। দু'মিনিট পর আবার অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজলো।

যন্ত্রচালিতের মতো আমি তনুর রুমে কখন চলে এসেছি খেয়াল করিনি। তনু লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার অনাবৃত পা দুটোই আমার চোখে পড়লো। জীবনে কোনো মেয়ের এতো ছোটো সুন্দর পা আমি দেখিনি। পায়ের দিক থেকে দেখলে তাকে আগের যুগের চীনামেয়ের কথাই মনে হতো। তাই যতোবার আমার তনুর কথা মনে হতো মুখের সঙ্গে সঙ্গে পাদুটোও মনের ভেতর জেগে উঠতো।

আমাকে দেখতে পেয়ে তনু বললো, দানিয়েল ভাই, শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে সুনন্দাদের বাড়ীতে কাল আপনি ঘুমোতে পেরেছিলেন? ওমা, এখনো তো মুখের সে দাড়িগোঁফের জঙ্গল পরিষ্কার করেননি আপনাকে কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে সুনন্দাদি এতো চালাকচতুর মেয়ে, আপনার দাড়িটা কাটাতে পারলেন

না? আমি বললাম, থাক তনু, তোমার কষ্ট হচ্ছে, কথা বলো না সে বললো, একসময় তো কথা থেমে যাবে, যতোক্ষণ পারি বলে যাই।

আমি কোনো বাধা দিতে চেষ্টা করলাম না। সে ধীরে ধীরে আমার ডান হাতটা তার মুঠোতে নিয়ে জিগগেস করলো, সুনন্দাদিকে আপনি কেমন করে চেনেন? আমি বললাম, ওরা একটা গল্পের পত্রিকা বের করেছিলো। আমার একটা লেখা তাতে ছাপা হয়েছিলো। আপনার তো সব লেখা আমার পড়া আছে। সুনন্দাদি কোন লেখাটা ছেপেছিলেন? আমি বললাম, পদাঘাত গল্পটি তাই নাকি? সে বই ছাপার সময় আমি তিন ভরি সোনা বেচেছিলাম।

চুপ করে রইলাম। তিন ভরি সোনা বিক্রয় করে ছ'শো টাকা আমার হাতে তনু দিয়েছিলো। সে টাকা বই ছাপার কাজে খরচ করিনি। ভাত খেয়ে নষ্ট করেছি। প্রকাশক নিজ ব্যয়ে বইটা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তনুর কাছে তা গোপন রেখেছিলাম। তার কাছে ওটাই আমার অপরাধ। সে একটা হাঁচি দিলো। মাগো! একটা হাঁচির বেগও সহ্য করতে পারছে না তার শরীর।

দমটা সামলে নিয়ে সে আবার বললো, আপনি সুনন্দাদিকে নিয়ে এতো ঘোরাঘুরি করছেন, তাদের বাড়ীতে থাকছেন, কই আমাকে নিয়ে কখনো কোথাও যাননি। আমাদের বাড়ীতে একদিনও থাকেননি। আমি জবাব দিলাম, সুনন্দার সঙ্গে বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। আর তুমি তো তোমাদের পার্টির কাজে ব্যস্ত থাকতে সারাক্ষণ। আপনি আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন না কেনো? বললেন না কেনো একদিন আমাদের বাড়ীতে থাকবেন? একবার কার্ফ্যু মাথায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি আশা করেছিলাম থেকে যাবেন, কিন্তু আপনার মনে কি অহঙ্কার! জানেন, সারারাত আমি কেঁদেছিলাম।

আমি চমকে উঠলাম। কার্ফ্যু শুরু হয়ে গেছে, আমার চলে আসতে মোটেই ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু তনু একবারও মুখফুটে বলেনি, রিস্ক নিয়ে কাজ নেই। আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে যান। সেদিন বুটপরা মিলিটারীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে দিতে আমি মনে করেছিলাম, উহ, তনুটা কি নিষ্ঠুর!

তার কণ্ঠস্বর একটুখানি সতেজ হয়ে উঠলো, আপনি ভাজামাছটি উল্টে খেতে শিখলেন না কোনোদিন। সুনন্দাদির মতো কোনো মেয়ের পাল্লায় যখন পড়বেন, দেখবেন কেমন নাকে দড়ি দিয়ে কলুর বলদের মতো ঘুরিয়ে ছাড়বে।

তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে অপেক্ষাকৃত আন্তরিক সুরে সে বললো, হেলেনি একজন রবীন্দ্রসংগীতের খুব বড়ো শিল্পী হবে। সকলে সুচিত্রা মিত্রের মতো তার গানের তারিফ করবে। তাকে ভরসা দেয়ার জন্যই বললাম, নিশ্চয়ই হবে, এই অল্পদিনেই তো সে বিরাট নাম করে ফেলেছে।

তার মুখে একটি হাসির রেখা দেখা দিলো সে বড়ো শিল্পী হলেই হলো বাস আর কিছু কামনা নেই আমার আপনি তো বলতেন, শিল্পের আগুনে মানুষের সব পাপ, সব ক্লেদ সোনা হয়ে ওঠে। হেলেনিরও কি তাই হবে না? আমি বললাম, আরে, হবে হবে

আপনি কিন্তু তাকে দেখবেন। সে একেবারে ছেলেমানুষ, কি করেছে না করেছে, সেগুলো বড়ো করে দেখবেন না। একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে। তনুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললাম, হাঁ দেখবো। কথা দিলেন তো? আমার ডান হাতটিতে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, জানেন তো, মৃতের সঙ্গে কথা দিলে রাখতে হয়।

ড. মাইতি হন্তদন্ত হয়ে রুমে প্রবেশ করে বললেন, দানিয়েল সাহেব আপনার সিগারেট আছে? আমি বললাম, আছে। আমার একজন বন্ধুকে এদিকে এসে একটা সিগারেট দিয়ে যান ও বস্তু আমি আর ধরবো না। আমি করিডোর দিয়ে ড. মাইতির পিছু পিছু কিছু দূর এলেই বললেন, এখখুনি তাকে অক্সিজেন টেন্টে নিয়ে যেতে হবে। যে ক'দিন বাঁচে ইন্টেন্সিভ কেয়ারে রাখা হবে। দেখতে পাচ্ছেন না, শি ইজ ফেডিং আপ।

আমি বোকার মতো বলে বসলাম, একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে যে। এই সমস্ত পেসেন্ট অনেক সময় কথা বলতে বলতেই, দ্যাটওয়ে দে মীট দেয়ার লর্ড। সো টেক কেয়ার। অব ইউর সেলফ। এখন আপনাকে হাসপাতাল ছাড়তে হবে। অলসো ইউ আর সীক।

সকাল সাড়ে নয়টায় আমি হোস্টেলে এসে পৌঁছুলাম। রুমে গিয়ে দেখি আমাদের বাংলাদেশের বেশীর ভাগ ছেলেই আছে। কেউ বিছানায় বসে, কেউ মেঝেতে শুয়ে। তারা যুদ্ধের গতিবিধি নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ করছে। শিয়ালকোট সেক্টরে পাকিস্তান মার খাচ্ছে, লাহোরে বোমা পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর সেক্টরে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যূহ পাউরুটির মতো কেটে ভারতীয় সৈন্য দশমাইল অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। এদিকে পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে আগরতলার সীমানা পেরিয়ে আখাউড়া পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্য এসে গেছে।

চট্টগ্রাম এবং চালনা বন্দর অকেজো করে দেয়া হয়েছে। বয়রা সীমান্তে ভারতীয় এলাকায় দুটো বোমা পড়েছে বটে, কিন্তু দু'দু'খানি বিমান ভারতের মাটিতে অবতরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। নরেশদা এতোক্ষণ রুমে ছিলেন না। তিনি কোত্থেকে এসে জিগগেস করলেন, দানিয়েল এলে? আমি বললাম, হাঁ নরেশদা, এলাম। এখন তোমার শরীর কেমন, কোনো কমপ্লেন নেই তো? আমি মাথা নাড়লাম। তনুর অবস্থা? আমি বললাম, একটা পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি এক মিনিট চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, আর কারো কিছু করণীয় নেই? তাই তো বললেন ডাক্তার। ডাক্তার বলেছেন? আমি বললাম, হাঁ। তবে আর কি!

রুমের মধ্যে এবার মুক্তিবাহিনীর কর্মধারার আলোচনা চলছিলো। আমার সবকিছু যেনো পানসে এবং বিস্বাদ মনে হচ্ছিলো। আমি বললাম, নরেশদা আমি একটু ঘুরে আসি তিনি জানতে চাইলেন, কোথায় যাবে? কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেনো? অজয়বাবু আজকে আমাকে সে লেখার প্রাপ্য চারশো টাকা দিলীপ চক্রবর্তীর কাছ থেকে নিয়ে দেবেন বলেছিলেন। দেখি টাকাটা পাই কিনা তিনি বললেন, যাও এসময়ে হাতে কিছু টাকা থাকা খুবই ভালো।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ঢুকতেই দেখি অজয়বাবু হাত ইশারা করে আমাকে ডাকছেন, আমি কাছে গেলে তিনি আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন, তোমার অসুখ শুনেছিলাম, কিন্তু শরীর এরকম খারাপ তা তো জানতাম না নিজে এলে কেনো? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতে। তারপরে তিনি আমার হাতে চারটি একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, এই নাও টাকাটা। দিলীপবাবু রেখে গেছেন।

টাকাটা গ্রহণ করে লালবাজারে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার অফিসে এলাম। পত্রিকার মালিক অরুণ রায় মশায় আমাকে ডেকে বললেন, এই যে ভায়া এদিকে এসো। তুমি ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছো। তিনি জানতে চাইলেন, তুমি বলো দেখি আখাউড়া থেকে কুমিল্লার দূরত্ব কতো? বললাম, পনেরা বিশ মাইলের অধিক হবে না। আজ আখাউড়ায় যুদ্ধ চলছে, আমি নিশ্চিত বলতে পারি আগামী দু'দিনের মধ্যেই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ফল করবে। এদিকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের দশমাইল সীমানার মধ্যে ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করেছে। বড়োজোর তিন চার দিন ঠেকিয়ে রাখবে। আগামী পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে দেখা যাবে পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যের কোমর ভেঙে গেছে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা এয়ার কভার ছাড়া কেমন করে লড়বে? খুব সম্ভব এখন ঢাকায় উড়তে পারে মতো একটা মাত্র ফাইটার আছে। তাছাড়া সম্মানের সঙ্গে লড়ে পরাজয় স্বীকার করার মতো হায়ার মর‍্যালও পাকিস্তানী সৈন্যের নেই। দে নো ইট ওয়েল দ্যাট আদার দ্যান ইন্ডিয়ান আর্মি দে আর এনসার্কলড বাই হান্ড্রেড মিলিয়ন্স অব হোস্টাইল বেঙ্গলীস। সো দেয়ার ফেট ইজ সীলড।

আমি লালবাজার থেকে চলে এলাম। সত্যি সত্যি শান্তি পাচ্ছিলাম না। একখানা রিকশা নিয়ে প্রিন্সেপ স্ট্রীটের অফিসটিতে পা দিলাম। অফিসের প্রাত্যহিক নিয়ম অনুসারে আজ আর কাজ চলছে না। সর্বত্র যুদ্ধের আলোচনা। চেনাজানা ক'জনের সঙ্গে দেখা হলো। এড়িয়ে গেলাম। সোহরাব সাহেবের খোঁজ করলাম, তার সহকারীটি জানালেন, তার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। এ নিয়ে হাসপাতালে ব্যস্ত আছেন।

জলেস্থলে অন্তরীক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। এরই মধ্যে মানুষ মারা যাচ্ছে। আবার মানুষ মানুষ জন্ম দিচ্ছে। নয়কো শুরু আঁতুড়ঘরে, শেষ নয়কো চিতায় পুড়ে।

অফিস থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে ড. রায়ের বাড়ীর কাছে এসে দেখি পিনাকী মোড়ের দোকান থেকে পান কিনছে। সে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, আপনাকে খুঁজতে হোস্টেলে গিয়েছিলাম। এই এখখুনি ফিরে আসছি। চলুন, জাফর ভাই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, তিনি রিপন স্ট্রীটের বাসাটিতে আছেন না? হাঁ, চলুন।

পিনাকীসহ রিপন স্ট্রীটে জাফর ভায়ের বাসায় এলাম। বসে বসে তিনি তামাক খাচ্ছেন। আমাকে দেখে ধমকে উঠলেন, ছোঁড়া, কোথায় কোথায় থাকো! জানো, তনু মেয়েটি মারা যাচ্ছে। বললাম, আমি কি করবো জাফর ভাই! তুমি তার সঙ্গে

দেখা করেছিলে? বললাম, দেখা তো প্রতিদিনই করছি। কিন্তু দেখা করে তো আর ক্যান্সার সারানো যায় না। এখন তো আর দেখাও করতে দেবে না তাকে আজ অক্সিজেন টেন্টের মধ্যে নিয়ে গেছে।

জাফর ভাই বললেন, দীপেনও আমাকে সেকথা বলেছিলো। আমি বললাম, কোন দীপেন? কোন দীপেন আবার কি, আমাকে ধমক দিলেন, এই একটাই দীপেন, মানে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধালাম, তাকে আপনি চেনেন? বলো কি হে ছোকড়া! দীপেন আমার কোলকাতায় প্রথম যৌবনের বন্ধু না? সে তো কমিউনিস্ট হয়ে গেলো। কিন্তু একটা মানুষের মতো মানুষ। বুঝলে, তোমাদের মতো একেকটা খোদাকাটা ডাকাত নয়। তিনি মুখ ভ্যাঙচালেন।

আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। বললাম, জাফর ভাই, মনে হচ্ছে আমি পড়ে যাবো। কোথাও যদি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন, পর্দার ওপারে একটা পাতা বিছানা আছে। নির্বিবাদে শুয়ে থাকতে পারো। পর্দাটা সরিয়ে বিছানার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম। কোত্থেকে রাজ্যের ঘুম এসে চোখে ভীড় করলো। যখন ঘুম ভাঙলো তখন প্রায় বেলা সাতটা। ডিসেম্বর মাসে সাতটা কম রাত নয়।

মুখহাত ধুয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে জাফর ভাই বললেন, ওহে এই ব্ল্যাক আউটের মধ্যে কই যাও? আমি বললাম, একটু হাসপাতালে গিয়ে দেখি। তিনি বললেন, তুমি তো তাকে দেখতেও পাবে না। অনর্থক এতোটা পথ হেঁটে কি লাভ? আমি শিশুর মতো জিগগেস করলাম, তাহলে এখন আমি কি করবো? তিনি হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, এইখানে বসো। কারো কিছু করার নেই, যা ঘটবার ঘটবে। দৈব প্রতিকূল। আমরা পরাজিত হবোই। সাজানো দাবার ছকটির প্রতি অঙ্গুলি দেখিয়ে বললেন, চলো দাবা খেলি। আমি বললাম, হোস্টেলে ফিরবো কেমন করে, অনেক রাত হয়ে যাবে। হোস্টেলে আর ফিরবে কি? এখানেই দুটো খেয়ে ঘুমিয়ে নিবে।

সকালবেলা জাফর সাহেবের সঙ্গে নাস্তা সেরে বৌবাজারের হোস্টেলে এসে দেখি এক অঘটন ঘটে গেছে। আগের রাতে লালবাজারের পুলিশ সাবদার সিদ্দিকীকে পাকিস্তানী গুপ্তচর সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেছে। সাবদারের চুলদাড়ি থেকে শুরু করে যার কথাবার্তা পর্যন্ত এমন বেপরোয়া এবং দায়িত্বহীন যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলে যে কেউ অতি সহজেই বিশ্বেস করতে বাধ্য হবে যে এই লোক গুপ্তচর না হয়ে যায় না।

ছেলেদের মধ্যে একটা ছুটোছুটি পড়ে গেছে। কেউ গেলো থিয়েটার রোডে, কেউ প্রিন্সেপ স্ট্রীটে। আমাকে কেউ কিছু বললো না। চট করে মনে পড়ে গেলো একদিন কোলকাতা মেট্রোপলিসের পুলিশ কমিশনারকে জাফর সাহেবের সঙ্গে তার বাসায় কথাবার্তা বলতে শুনেছি। তিনিও সাতক্ষীরার লোক। জাফর সাহেবের বাল্যবন্ধু। একজন আরেকজনকে তুই সম্বোধন করেন। নরেশদাকে বললাম, জাফর সাহেবকে ধরলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হতে পারে। নরেশদা বললেন, চলো, তুমি আর আমি জাফর সাহেবের বাসায় গিয়ে তাকে ধরি

আমরা রিপন স্ট্রীটে এলাম। জাফর সাহেবকে সব কথা খুলে বলতেই তিনি তো চটেমটে আগুন। শুয়োরের বাচ্চা মরুক। বাড়ীতে পাছায় তেনা জোটে না, কোলকাতা শহরে এসে বাবুগিরি করা হচ্ছে! তার সুপরিচিত গালাগালগুলো অনেকক্ষণ ধরে করে টেলিফোন ডায়াল করলেন। প্রথমে বাসায়। তারপর অফিসে। কমিশনারকে পাওয়া গেলো। এপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেলো। হ্যালো প্রবীর, আমি জাফর, সিকান্দার আবু জাফর বলছি।

কুশলবার্তা বিনিময়ের পর জাফর সাহেব কথা না বাড়িয়ে আসল কথায় এলেন। প্রবীর একটা ব্যাপারে তোর সাহায্য চাইছি। আমার একটা আধপাগলা ছেলেকে গতরাতে তোর লোক পাকিস্তানী গুপ্তচর সন্দেহে বৌবাজারের একটি হোস্টেল থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। তুই হস্তক্ষেপ না করলে ছেলেটার বিপদ হতে পারে। ওপ্রান্ত থেকে নাম জিগগেস করা হলো। তিনি নাম বললেন, সাবদার সিদ্দিকী।

রিসিভার রেখে জাফর সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন, শুয়োরের বাচ্চা এ যাত্রা বেঁচে গেলো। তিনি নরেশদাকে জিগগেস করলেন, এই যে মাওলানা, তুমি দাবা পারো? নরেশদা বললেন, আমি পারি না, তবে আপনি দানিয়েলকে দিয়ে ট্রাই করতে পারেন। ওকে তো মাঝে মাঝে খেলতে দেখি। আরে কালকে তো তাকে দিয়ে ট্রাই করেছি। লাভের মধ্যে এই হয়েছে, মেজাজটাই নষ্ট হয়েছে।

সাবদারকে বের করতে প্রায় বেলা চারটে বেজে গেলো। লালবাজারের পুলিশ তাকে আচ্ছা করে বানিয়েছে। এতো উল্টোপাল্টা কাজ করেছে যে এরকম একটা সম্বর্ধনা তার একরকম প্রাপ্য হয়েই দাঁড়িয়েছিলো।

দশ

আমি তনুর হাসপাতালে ছুটলাম। গিয়ে দেখি তার বেড খালি। সেই যে সকালে তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এখনো সেখানেই আছে। আমার মনে একটা ঘোরতরো সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তনুকে কি এখানে আর ফেরত পাঠানো হবে? করিডোরে পায়চারী করে ড. মাইতির খোঁজ করলাম। কাউকে কিছু জিগগেস করবার মতো উৎসাহ পেলাম না। সমস্ত কোলকাতা শহর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। হাসপাতালের টুপি পরানো আলোগুলো প্রেতের চোখের মতো জ্বলছে। আমি পায়ে পায়ে ড. মাইতির কোয়ার্টারে গেলাম। তিনি সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে ফিরে পোশাক ছাড়ছেন।

আমার আগমনের সাড়া পেয়ে দরোজার কাছে এসে বললেন, দানিয়েল সাহেব অন্তিমক্ষণ উপস্থিত। নাউ শি ইজ অনলী কাউন্টিং হার আওয়ারস। এ্যাট এ্যানি মোমেন্ট এ্যানিথিং মে হ্যাপেন। আমরা শুধু তার মৃত্যুকষ্টটা কিছু পরিমাণে লাঘব করার চেষ্টা করছি। আপনি কি এক কাপ চা খাবেন? আমি বললাম, না।

ড. মাইতির কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে তিন রাস্তার মোড়ে অনেকক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন আমি কি করবো, কোথায় যাবো?

ভেতরে এমন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, আস্ত পৃথিবী যদি ক্যাপসুল করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, সে ফাঁক ভরাট হবে না। একটা খালি রিকশা দেখে ইশারায় থামিয়ে চড়ে বললাম, গোলপার্ক চলো।

সুনন্দাদের বাড়ীতে এসে দেখি তুমুল যুদ্ধের আলোচনা চলছে। সুনন্দার দাদা আমাকে দেখে বললেন, এই যে ভাই, তুমি এসেছো, খুব ভালো হয়েছে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ফল করেছে, যশোর ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয়দের দখলে। এখন তিন দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ করে ভারতীয় বাহিনী ঢাকা অভিমুখে ছুটছে। ঢাকার পনেরো মাইল অদূরে যুদ্ধ চলছে। দেখবে কাল বারোটার মধ্যে ঢাকার পতন ঘটবে। তোমাদের দুঃখকষ্টের শেষ হবে। আগামী দশ বারো দিনের মধ্যে তোমাদের সমস্ত লোক দেশে ফিরতে পারবে। আমি হুঁ হাঁ করে কোনো রকমে অনিলদার সঙ্গে সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম।

সুনন্দা দোর ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে আমাকে দেখেই জিগগেস করলো, দানিয়েল, তোমাকে হাসপাতালে দেখলাম না যে! আমি জিগগেস করলাম, তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে? সে বললো, হাঁ। এখানে কথা বলা যাবে না। দাদা যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে আছে। চলো, ভেতরে যাই।

ডাইনিংরুমেই বসলাম দুজনে মুখোমুখি। সুনন্দা ম্লানকণ্ঠে বললো, তনুদির তো এখন চূড়ান্ত অবস্থা। আমি বললাম, ড. মাইতি বলেছেন, যে কোনো সময়ে সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারে। সুনন্দা জানতে চাইলো, এখন কি করবে? আমি বললাম, তুমি বল এখন কি করবো। সে বলল, এখন করার কিছু নেই। যা ঘটবার আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘটে যাবে।

সে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো, তুমি কিছু খেয়েছো? বললাম, না। আমার খাবার ইচ্ছে নেই। শুধু আমাকে বেশী করে চা পাঠিয়ে দাও। আমি কাপড়চোপড় ছেড়ে আসি। চা দিয়ে গেলে আমি খুবই নিবিষ্টমনে চা খেতে লাগলাম। সুনন্দা ফিরে এলে বললাম, আমার খুবই ঘুম পাচ্ছে। তুমি কি একটু ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিতে পারো?

সে অবাক হয়ে জানতে চাইলো, হাসপাতালে গিয়ে আরেকবার তনুদির খবর নেবে না? আমি বললাম, সকালে যাবো। সে বললে, আমিও যাবো। ঠিক আছে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। বিছানায় একটা নতুন পাতা চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললো, তুমি শুয়ে পড়ো তারপর তার দাদাকে বললো, দাদা, তোমরা দানিয়েলকে ডাকাডাকি করবে না। সে একটু ঘুমোবে। বেচারী অসুস্থ মানুষ। তার ওপর অনেক ধকল যাচ্ছে। সে রাতে আমার খুব ভালো ঘুম হলো। কোলকাতায় আসা অবধি কোনো রাতে এরকম নিবিড় ঘুম কোনোদিন হয়নি।

পরদিন সকালে বেলা ফুটতেই সুনন্দা আমাকে গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলো। এই হাসপাতালে যাবে না? আমি ধড়মড় করে জেগে শার্টটা কোনোরকমে গায়ে চড়িয়ে নিলাম প্যান্ট পরেই ঘুমিয়েছিলাম। বললাম, চলো। সে বললো, সে কি, কিছু খাবে না! আমি বললাম, না। সুনন্দা একটা কথাও বাড়ালো না।

আমরা একটা বেবীট্যাক্সিতে চেপে বসলাম সারাপথে আমাদের দুজনের একটাও কথা হয়নি। পিজির গেটে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম সামান্য পথটুকু হেঁটে এসে তনুর রুমের সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম একটি খাটে, করিডোরের একপাশে, তার মৃতদেহ চাদর ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। কেবল একটি মাত্র বেটেখাটো মানুষ দেয়াল ধরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে

সুনন্দাকে বললাম, এই মানুষটা কে? ওমা, চেনো না? ইনি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ড. মাইতি কোত্থেকে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন, নাউ শি হ্যাজ গন টু মীট হার লর্ড। আমি বললাম, একটু দেখতে পারবো? ড. মাইতি মুখ থেকে চাদরটা সরালেন। আহা সেই মুখ! আমি বললাম, পা দুটো একটু দেখাবেন? চাদর ওঠালে দেখলাম, সুন্দর ছোট্টো দুটি পা। জীবনে কোনোদিন কোনো মেয়ের এমন পা দেখিনি।

সুনন্দাকে বললাম, চলো। সুনন্দা খুবই অবাক হয়ে গেলো। সে কি, এরই মধ্যে চলে যাবে? তোমার কিছু করার নেই? না আমার আর কিছু করার নেই। তার মৃতদেহ এখন অন্য লোকের সম্পত্তি।

হাসপাতালের গেটের গোড়ায় দেখি লেজঝোলা বানরের মতো হেঁটে আসছেন জাহিদুল হক। তার হাতে রজনীগন্ধার একটা তোড়া। পেছনে অনেক মানুষ সার বেঁধে এগিয়ে আসছে। তনুর মৃত্যুর খবর যখন ছড়িয়ে পড়বে এ হাসপাতালের ফাঁকা জায়গাটুকু মানুষে মানুষে ভরে যাবে।

ছ্যাঁত করে আমার মনে পড়লো, প্রথম যে দিন গেন্ডারিয়ায় তনুদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম ধবধবে সাদা চাদরপাতা বিছানার শিয়রে এমনি একটা রজনীগন্ধার গুচ্ছ সেদিন সাজানো ছিলো। আর আমার পাঞ্জাবীতে ঘামে ভিজে লাল বইয়ের মলাটের রঙ্গ লেগে লাল হয়ে লেগেছিলো। সে রাতে আমার মনে হয়েছিলো, এ রং আমার হৃদয় থেকেই নির্গত হয়ে পাঞ্জাবীতে দাগ ফেলেছে।

আমি সুনন্দাকে বললাম, আমাকে গঙ্গার ধারেটারে কোথাও নিয়ে যেতে পারো? সুনন্দা বললো, চলো। কিছুদূর গিয়ে বললাম, সুনন্দা, আমি আর চলতে পারছিনে, একটা রিকশা নাও। সে একটা টানারিকশা ডেকে নিলে তাতে চড়ে বসলাম।

আমার সারা শরীর অবশ হয়ে আসছিলো। কখন যে সুনন্দার কাঁধের ওপর আমার মাথাটা এলিয়ে দিয়েছি, খেয়ালই করতে পারিনি। আমি প্রকাশ্য রাজপথে সুনন্দাকে একটা চুমু খেলাম। তারপর মনে হলো, একি করলাম!

বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে গঙ্গার ধার হতে ফিরে আসতেই শুনি গোটা কোলকাতা শহরে বাজি ফোটার ধুম পড়ে গেছে। সর্বত্র উৎসবের প্লাবন। প্রতি বাড়ীর শিয়রে শিয়রে শোভা পাচ্ছে অশোকচক্র আঁকা পতাকা। বুঝলাম ঢাকা ফল করেছে।

নিপুণ, ঈদসংখ্যা '৮৫ (জুন ১৯৮৫)

পরিশিষ্ট

for more books visit: https://pdfhubs.com

যুদ্ধ ও প্রেম

অলাতচক্র কাহিনীর দুই পুরাণ

সলিমুল্লাহ খান

মহাত্মা আহমদ ছফার সহিত আমার প্রথম দেখা—আমি বেশ কয়েকবারই লিখিয়াছি—ইংরেজি মতের ১৯৭৬ সালে। ততদিনে বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ছয় বছরও পূরণ হয় নাই। সে সময় তিনি আমাদের বলিতেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ লইয়া একটি উপন্যাস লিখিবেন। উপন্যাসের নামও তিনি ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। নামটা মুখে মুখে বলিতেন ইংরেজি জবানে—দি ওয়ার দ্যাট ওয়াজ বিট্রেড। অর্থাৎ যে যুদ্ধের সহিত বেইমানি করা হইয়াছে। কাহিনীর কিয়দংশ তিনি মুখে মুখে শুনাইতেন। বলিতেন কেহ আমাদের বড় ঠকাইয়াছে। যুদ্ধের ফসল আমাদের ঘরে উঠে নাই। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু সমাজ বদলায় নাই।

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার পর বাংলাদেশ যে অস্থির রাজনীতির আবর্তে জড়াইয়া পড়িল, রক্তপাত ও অভ্যুত্থানের যে পথে রাষ্ট্র পথ হারাইয়া বসিল আহমদ ছফা তাহার কারণটা খুঁজিতেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ খোদ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ক্ষমতার যে কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইতেছিল সেই কেন্দ্র ভারতীয় (বা পশ্চিমবঙ্গীয়) শহর কলিকাতায় তিনিও সশরীরে শরণার্থী হইয়াছিলেন। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা পুঁজি করিয়াই মহাত্মা আহমদ ছফা পণ করিয়াছিলেন মহাবাংলাপুরাণ লিখিবেন

তখনো ১৯৭০ সালের দশক। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসাহিত্য তেমন দানা বাঁধিয়া সারে নাই।

স্মৃতিকথা যাঁহারা লেখেন তাঁহারাও কল্পনার আশ্রয় ষোল আনা না নিয়া পারেন না। স্বাধীনতা তাঁহারাও নেন। আর যুগের পটভূমিতে কল্পনাভিত্তিক কাহিনী যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের স্বাধীনতা আরো বেশি। আহমদ ছফা বলিতেন মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী লিখিতে বসিলে তিনি নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিবেন না।

শুরু হইল ১৯৮০ সালের দশক পরিষ্কার হইতে লাগিল বাংলাদেশ যে পথে গমন করিলে আহমদ ছফা সুখী হইতেন রাষ্ট্রটা সে পথে যাইতেছে না যে দেশ স্বাধীন হইয়াছিল অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া সে

দেশই নতুন করিয়া নতুন নতুন অন্যায়ের অনুষ্ঠান করিতেছে কৃষকসমাজের বঞ্চনাকে ভাগ্য করিয়া বাংলাদেশের নতুন মধ্যমশ্রেণি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ডাক দিয়াছিল। নতুন রাষ্ট্র নতুন শাসকশ্রেণির জন্ম দিল। কিন্তু কৃষকসমাজের সম্যক গতি হইল না। সমাজে ধন ও দারিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল

সবচেয়ে বড় কথা, যেসব কথার আড়ালে বাংলাদেশের কৃষকসমাজকে ঠকাইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র পুঁজি সঞ্চয়নের কারখানা খুলিয়া বসিয়াছিল সেসব কথাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আবার ফিরিয়া আসিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি হইয়াছিল ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের দাবি আকারে। তাই সে রাষ্ট্রে সমস্ত শপথ লওয়া হইত এসলাম ধর্মের নামে। এদিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়া হইল পুরানা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী সমস্ত জনগণের দাবি আকারে। স্বভাবতই এই রাষ্ট্রের শপথ হইল ধর্মসমাজ- (বা সম্প্রদায়-) নিরপেক্ষতা। অথচ পাঁচ বছর না যাইতেই দেখা গেল মানুষ ভাবে এক, আল্লাহ করেন আর।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে যে আন্দোলন তাহার গড়ন ও চলনের মধ্যেই ভবিষ্যতের এই বীজ লুকাইয়া ছিল। কোথায় সেই বীজ? কোথায় গেলে পাইব তাহার সন্ধান? বাংলাদেশে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা আন্দোলনের নেতা—আগেই বলিয়াছি—বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এয়ুরোপিয়া কায়দায় বলিতে বুর্জোয়াশ্রেণি। এই আন্দোলন সফল হইয়াছিল নানান স্তরে বিভক্ত কৃষকসমাজের সমর্থন নিশ্চিত করিবার পর। দুঃখের মধ্যে, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পর পরই এই ঐক্যে ফাটল ধরিল। আর সেই ফাটলে প্রলেপ লাগাইবার জন্যই বুঝি বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণিকে দুই কদম পিছাইয়া ব্রিটিশশাসিত ভারতে ফিরিতে হইল। দিতে হইল এসলামিয়া পরিচয়ের দোহাই।

ইহার বিরোধিতা করিবার দরকার যাহাদের হইল তাহারাও ফিরিতে বাধ্য হইলেন অতীতে—পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সমস্যার সমাধান করিয়াছে বলিয়া বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণি মনে করিয়াছিল। দেখা গেল সেই সমস্যা এখন আর পিছনে নাই, সামনে আগাইয়া রহিয়াছে। এখন সকলেই কহিতে লাগিলেন, এক কদম সামনে যাইতে হইলে অগ্রে দুই কদম পিছাইতে হইবে।

এই দুই দলের কাহারও পতাকাতলে সমবেত হইবার পাত্র ছিলেন না আহমদ ছফা। বাংলাদেশে নতুন সমাজ গঠিতে হইবে বলিয়া গোঁ ধরিয়াই রহিলেন তিনি। কি অখিল ভারতে কি নিখিল পাকিস্তানে ফিরিবার রাষ্ট্রীয় ফিরিস্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। এমন সময় তিনি ফিরিলেন ১৯৭১ সালে। হাত দিলেন *অলাতচক্র* লেখার কাগজে

এক

আহমদ ছফা আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করিতে বসিলেন ১৯৭১ সালের চৌদ্দ বছর পর, মোতাবেক ১৯৮৫ সালে ঐ বছরই জুন মাস নাগাদ স্বল্পপ্রচারধন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় 'অলাতচক্র' নামে নাতিদীর্ঘ এই কাহিনীটি প্রকাশ করিলেন তিনি। পত্রিকার নাম *নিপুণ*। অধুনালুপ্ত এই পত্রিকাটির সেই পুরানা সংখ্যাটি পাওয়া যথেষ্ট কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে একা আমরাই নহি আহমদ ছফার জীবনপঞ্জী বা রচনাবলি যাঁহারা সম্পাদনা করিতেছেন তাঁহারাও ভ্রান্তির ছলনে পড়িতেছিলেন। এখানে গোটা দুই উদাহরণ দিলেই সারিবে।

আহমদ ছফার এন্তেকালের বেশিদিন পার না হইতেই একটি স্মারকগ্রন্থ বাহির হইয়াছিল। (হাসান ও হাসান ২০০৩) ঐ গ্রন্থে যে জীবনপঞ্জী সংযোজিত হইয়াছিল তাহাতে উপন্যাস অলাতচক্রের রচনাকাল ধরা হইয়াছিল ১৯৮৪ সাল। প্রকাশও বলা হইল ১৯৮৪ সালই। (হাসীন ২০০৩) স্মৃতি সততই প্রতারক মনে হইতেছে। স্মারকগ্রন্থের দুই সম্পাদক—মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান—আহমদ ছফার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিয়াছেন। বুঝিতে পারিলাম সাপ্তাহিক *নিপুণ* পত্রিকার ১৯৮৫ সালীন ঈদসংখ্যা—যাহাতে *অলাতচক্র প্রথম ছাপা হইয়াছিল*—তাঁহারাও হাতের কাছে ধরিয়া রাখেন নাই। দলিলের শূন্য ঘরটা মনে মনে গড়িয়া লইয়াছেন। খুঁজিয়া দেখেন নাই।

মহাজ্ঞানী ও মহাজন যে পথ ধরিয়া গমন করিয়াছেন আহমদ ছফার আত্মীয় নূরুল আনোয়ারও সেই পথেই স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধারণ করিলেন। তিনিও বার বার উল্লেখ করিলেন অলাতচক্রের রচনাকাল ১৯৮৪। আহমদ ছফা রচনাবলির তৃতীয় খণ্ডে তিনি অলাতচক্র উপন্যাসের ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত সংস্করণই গ্রহণ করিয়াছেন। (ছফা ২০০৮ক) করিয়া কোন অন্যায় করেন নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৮৫ সালের সংস্করণটি আহমদ ছফার জীবদ্দশায় আর কোথাও নতুন করিয়া ছাপা হয় নাই। বোঝা গেল সেই পত্রিকা সংস্করণটি নূরুল আনোয়ারের হাতেও পড়ে নাই। পত্রিকার কপিও আর সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া আমরাও হইলাম ভুল ধারণার শিকার

নিপুণ পত্রিকার সেই সংখ্যায় ঘটনাচক্রে আমারও একটি লেখা—অস্কার ওয়াইল্ডের এক গল্পের তর্জমা—ছাপা হইয়াছিল নাম 'সুখী রাজদুলাল' যথানিয়মে তাহা আমারও মনে ছিল না

২০০১ সালে মহাত্মা আহমদ ছফার এন্তেকালের মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমি যখন 'অলাতচক্র' কাহিনীর একপ্রস্ত আলোচনা লিখিলাম তখনো আমার হাতে *নিপুণ* পত্রিকার কপিটি ছিল না দ্বিতীয় অর্থাৎ ১৯৯৩ সংস্করণে আহমদ ছফা কাহিনীটি আদ্যোপান্ত প্রায় নতুন করিয়াই লিখিয়াছিলেন ফলে আমার মনে কাঁটার মতন একটা অসোয়াস্তি থাকিয়াই গিয়াছিল। দুই সংস্করণের মধ্যে অপরিহার্য তুলনাটা করিতে পারিতেছিলাম না

যাহা হৌক, এই বছরের গোড়ার দিকে আহমদ ছফার সহৃদয় অনুরাগী এবং আমাদের উপকারী বন্ধু সৈয়দ মনজুর মোরশেদ চট্টগ্রাম হইতে আমাকে একপ্রস্ত *নিপুণ* পত্রিকা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। তিনি ১৯৮৫ সাল হইতেই তাঁহার গ্রামের বাড়িতে এই কপিটি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বাটি রাঙ্গুনিয়া উপজেলার অন্তঃপাতী সরফভাটা গ্রামে। আহমদ ছফার ছাত্র ও বন্ধু মাত্রেই—আজ বলিতে পারি—তাঁহার দেনাদার থাকিবেন। বিশেষ বলিতে আহমদ ছফা রচনাবলির পূর্ণতর সংস্করণ প্রকাশের সময় এই লুপ্তোদ্ধারের কাজটি পরম মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এক্ষণে আমরা সৈয়দ মনজুর মোরশেদ প্রেরিত প্রতিলিপি হইতে *অলাতচক্র* প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ করিতেছি। বলিয়া রাখা ভাল পত্রিকায় প্রকাশিত সংস্করণে অনেক জায়গায় ছাপাখানার ভূত ছিল। আমরা সেই ভূতভ্রান্তি কিছু কিছু সংশোধন করিয়া লইয়াছি। এই সংশোধন অবশ্য প্রুফ সংশোধনের অধিক নহে। দুই এক জায়গায় ব্যাকরণগত অল্প ভুলও শোধন করা হইয়াছে। যেমন, অনেক জায়গায় যে শব্দটির পাঠ ছিল 'যেয়ে' তাহার জায়গায় আমরা 'গিয়ে' পাঠ বসাইয়াছি। অন্যান্য জায়গায় আহমদ ছফার মুদ্রাদোষ—'যেনো' 'কেনো' জাতীয় বানান—যেমন আছে তেমনি রাখা হইয়াছে।

অলাতচক্র কাহিনীর রচনা যে সত্য সত্যই ১৯৮৫ সালের মাঝের দিকে বা শুরুতে হইয়াছিল তাহার আরো একপ্রস্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নূরুল আনোয়ার নিজেই প্রমাণটি আবিষ্কার করিয়াছেন অথচ তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত না হইয়াও পারেন নাই। *আহমদ ছফা রচনাবলি* ৮ম খণ্ডের শেষে তিনি আহমদ ছফার কাগজপত্র হইতে পরলোকগত গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা কয়েকটি পাতার আলোকচিত্র ছাপাইয়া দিয়াছেন। ইহার মধ্যে 'অলাতচক্র উপন্যাসের প্রাক-চিন্তা' নামে দুইটি পাতাও আছে। প্রথম পাতার নিচে সৌভাগ্যক্রমে তারিখ দেওয়া আছে ১০/৫/৮৫ অর্থাৎ ১০ মে ১৯৮৫ (ছফা ২০০৮খ)

আর সৌভাগ্যের মধ্যে, প্রথম পাতার মাথায় আহমদ ছফা লিখিয়াছেন, 'তরুর এই গল্পটা আমাকে চব্বিশ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে।' চব্বিশ তারিখ মানে মে মাসের চব্বিশ তারিখ। তিনি দেখিতেছি যথারীতি লেখাটি শেষই করিয়াছিলেন নহিলে জুন মাসে প্রকাশিত ঈদসংখ্যায় উহা ছাপা সম্ভবপর হইত না আশা করি এতদিনে আমরা অলাতচক্রের প্রথম প্রকাশ ও রচনাকাল বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলাম

এক্ষণে আমরা আরো জরুরি বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারিব।

অলাতচক্র কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ এখন আহমদ ছফা রচনাবলি তৃতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে। এখানে আমরা প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ করিতেছি। আশা করি দুইটি সংস্করণ মিলাইয়া পড়িলে লেখকের মনের বিকাশ বা গতি বুঝিবার একটা উপায়ও হয়ত বা পাওয়া যাইবে। দুই সংস্করণের মধ্যে যে প্রভেদ তাহাকে কেহ বা বলিয়াছেন 'পরিমার্জনা' আর কেহ কেহ বলিয়াছেন 'ব্যাপক রদবদল'। আমরা এখন দেখিতে পারিব এই প্রভেদের অর্থটা কি। লাভের মধ্যে, অপরিণত কিছু সমালোচনার জওয়াবও এখানে মনে হয় পাওয়া যাইবে।

অলাতচক্র লেখার আগে মহাত্মা আহমদ ছফা আপনকার ভাবনার একপাতা মুসাবিদার খসড়া লিখিয়াছিলেন। আরেক পাতায় লিখিয়াছিলেন উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্র ইতিহাসের যে সকল ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিবে তাহাদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা। আরো লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ঘটনার প্রধান প্রধান অকুস্থলের তালিকাও। তাহা ছাড়া তিনি দুইটা ছকও কাটিয়া লইয়াছিলেন। এক ছকের কেন্দ্রে রাখিয়াছিলেন কাহিনীটি যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইবে সেই ব্যক্তিকে। ইঁহার ঐতিহাসিক নাম 'তরু'। প্রথম সংস্করণে ঔপন্যাসিক একটু বর্ণান্তর করিয়া নামটা রাখিলেন 'তনু' আর দ্বিতীয় সংস্করণে দাঁড়া করাইলেন 'তায়েবা'। দেখা যাইতেছে আহমদ ছফা শেষতক 'ত'টা ছাড়িলেন না। আরবি তায়েবা নামের তাৎপর্যও হয়তো তিনি হাতছাড়া করিতে রাজি হয়েন নাই। তায়েবা অর্থ পুতচরিত্রা। এক পা আগাইয়া অর্থটা পবিত্র পুরনারী ধরিলে আহমদ ছফার উদ্দেশ্যও হয়ত আরো প্রসিদ্ধ হয়। পুরাণ জমিয়া যায়। কে জানে?

একই পাতার নিচের দিকে পাওয়া যাইতেছে দ্বিতীয় ছকটি। এই ছকের কেন্দ্রে আছে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি। আর সেই বৃত্তের চারিপাশে ঘুরিতেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, চিন, আমেরিকা ও রাশিয়া—এই ছয় ছয়টি দেশের নাম। মজার জিনিশ, আহমদ ছফা একটি দেশের নাম তৎকালে প্রচলিত পরিচয়ে সোভিয়েত ইয়ুনিয়ন লেখেন নাই, লিখিয়াছেন 'রাশিয়া'।

এই দুই ছক পাশাপাশি রাখিয়া তিনি *অলাতচক্র* কাহিনীর বয়ান শুরু করিলেন। প্রথম সংস্করণে প্রথম ছকের চারিদিকেই বেশি ঘুরিয়াছেন তিনি। দ্বিতীয় ছকের কথা আসিয়াছে যতটা না আসিলেই নহে এমনভাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে পাকিস্তান যুদ্ধ চাপাইয়া দিলে যাহারা প্রাণভয়ে কি কৌশলগত কারণে ভারতবর্ষের সীমান্ত পার হইয়া সেদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করেন তাহাদেরই একজনের জবানিতে *অলাতচক্র* বয়ান করা। এই বয়াতির নাম—আহমদ ছফার ছকে দেখা যায়—রাখা হইয়াছিল নিছক 'আহমদ'। অনুমান করা যায় আহমদ মানে আহমদ ছফা। কাহিনীতে তিনি 'দানিয়েল' নাম লইয়াছেন। দানিয়েল শব্দটি আদপে হিব্রু হইতে আগত। অর্থ এলই (বা এয়াহুদি জাতির ঈশ্বরই) ন্যায়পাল (বেলৎস ১৯৮৩: ২১০)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ বিশ্বপালের—কথাটা আরবি বাক্যে আরবি হরফে লিখিয়া আহমদ ছফা যাত্রা করিলেন। মাত্র তিনটি স্তবকে তিনি যে পরিকল্পনার আভাস ফুটাইয়া তুলিলেন তাহাকে যদি আমরা সত্য না হৌক নিতান্ত তাঁহার প্রত্যয় আকারেও মানিয়া লই, তো ধরিয়া লইতে হইবে এই উপন্যাস তরুর 'জীবনবৃত্ত' বৈ নহে। ঔপন্যাসিক লিখিয়া রাখিয়াছেন: 'আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি, তরুর আত্মা যেনো আমাকে সাহায্য করে, যাতে তার জীবনবৃত্ত আমি মেলে ধরতে পারি।' (ছফা ২০০৮খ)

অলাতচক্র কাহিনীর গোড়ায় আহমদ ছফার 'ভালোবাসার বেদনাঘন গহন কাহিনী' একটি আছে—এ সত্যে সন্দেহ কি! তিনি খোলামনে নিজেকে নিজেই বলিয়া রাখিলেন, 'যে বাসর আমার রচিত হয়নি, এই গল্পটির মধ্যে সে বাসর আমি পাতবো।' তরুর নাম উল্লেখ করিবার পর তিনি জানাইতেছেন, 'এক সময় তো তাকে সব দিয়ে ভালোবেসেছি, সে ভালোবাসার বেদনাঘন গহন কাহিনীটি আমি প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি।'

আহমদ ছফার পণ জীবনমরণ। সেই পণের মতনই তিনি সত্য প্রকাশ করিবেন, হৌক সে সত্যের প্রকাশ যতই অকরুণ। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি প্রার্থনা করবো সূক্ষ্ম চেতনারূপী তরুর আত্মার সকাশে আমার অনুভবে[র] সত্য যেনো প্রকাশমান হয়, যতোই নিষ্ঠুর হোক আমার বিশ্বাসে [যেনো] স্থির নিশ্চিত এবং অটল থাকতে পারি।'

অটল থাকিতে হইলে পায়ের তলায় মাটি চাই। সেই মাটিও তো এক ধরনের বিশ্বাস বৈ নহে। তাই ছফা অকপটচিত্তে আওড়াইলেন: 'মানুষের আত্মা বলতে কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা, আমার কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবু দোষ কি বিশ্বাস করতে, মানুষের আত্মা আছে।' তরুর আত্মার কাছে তাই তিনি সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

তারপরও সত্যের দায় আছে। সে দায় শুদ্ধমাত্র তরুর ভাবমূর্তিতে আত্মনিবেদন করার দায়ই নহে। মানুষ কিংবা তাহার আত্মা যদি গণিতের ভাষায় যাহাকে বলে লব বা উপরের সংখ্যা তাহা হয়, তো তাহার হর বা নিচের সংখ্যা কি পদার্থ? মৃত আত্মারও একটা নাম আছে। কিন্তু সব নামের পা দাঁড়াইয়া থাকে যে দশটা আঙ্গুলের উপর তাহার নামই ভাষা। এই আত্মাকেন্দ্রিক (বা আত্মকেন্দ্রিক) পৃথিবীতে আত্মীয়তার পরম উদাহরণ ভাষা। সেই ভাষা নানান ভাষায় নানান নাম ধারণ করিয়াছে। আহমদ ছফাও সে কথা জানেন না—এমত নহে।

সেই জ্ঞানের প্রকাশ এই ভাষায় করিয়াছেন আহমদ ছফা: 'আল্লাহর কাছে মুনাযাত তিনি যেনো ক্রিয়াশীল শক্তির অপার করুণাবলে আমার চেতনাকে রাগ দ্বেষ ঈর্ষা থেকে মুক্ত করে একটি সমুন্নত দিগন্তের পথে চালিত করেন, আমার [পূর্বসূরী] মহান লেখকদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে এই দীন প্রয়াসকে সফলতার দ্বারদেশে পৌঁছে দেন।' (ছফা ২০০৮খ)

১৯৮৫ সালে আহমদ ছফা যে ভাবে যে ভাষায় গল্পটি শেষ করিয়াছিলেন, আমরা ধরিয়াই লইতে পারি তাহাতে তিনি পুরাপুরি শান্তি পান নাই। নচেৎ আট বছর পরের একদিন ১৯৯৩ সালে বসিয়া তাহাতে 'ব্যাপক রদবদল' কিংবা 'পরিমার্জনা' করিতেন না। তারপরও কথা থাকিয়া যায়। ১৯৮৫ সালের আদ্য সংস্করণে এমন কিছু কথা পাওয়া যাইতেছে যাহা পরের সংস্করণে তিনি বর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সব বিস্মৃত কথাও আমরা মনে করি মূল্যবান। এমনিতেই মূল্যবান।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা হয়তো খানিক ফর্শা হইতে পারে। যেমন ১৯৮৫ সালের সংস্করণে আহমদ ছফা মহাকবি সৈয়দ আলাওল হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া কাহিনীর মাথায় ঠাঁই দিয়াছিলেন। কথাটি ছিল:

অলাহুত চক্রমধ্যে প্রেমের অঙ্কুর
রূপরস বাক্যযোগে সৃজিল প্রচুর।
(উদ্ধৃত, ছফা ১৯৮৫: ১০৯; পরিমার্জিত)

আমাদের ধারণা অলাতচক্র কথাটা কবি আলাওল বর্ণিত সাধু 'অলাহুত চক্র' কথাটিরই অসাধু বা প্রাকৃত রূপবিশেষ। আলাওলের কোন কোন সম্পাদক কথাটির বানান লিখিয়াছেন 'অলাহ্বত'। যদি তাহাই হয় তো আরো ভাল বৈ কি। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের নবাবি আমলে এই কথাটির অর্থ প্রকটিত ছিল। আজিকালি ইংরেজি জমানায় তাহার সহিত অধিক ছাত্রের পরিচয় নাই। না থাকিলেও তাহার উত্তাপ আমরা আমাদের পূর্বসূরি মহান লেখকদের উত্তরাধিকার আকারে পাইয়া থাকি। দ্বিতীয়বারের লেখায় এই কথাটি বাদ দেওয়ার কোন হেতু থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

এই রকম আরো একটি সমস্যার কথা তুলিবার সময় এক্ষণে আসিয়াছে।

দুই

ইংরেজি মতের ১৯৯৫ সালে *আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস* নাম দিয়া একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে অন্যান্যের মধ্যে 'অলাতচক্র' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণটিও পাওয়া যাইত। এই সংগ্রহটির ভূমিকা লিখিয়া দেন অধুনা পরলোকগত ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অন্য চারিটি কাহিনীর অপর্যাপ্ত প্রশংসা করিলেও মহাত্মা ইলিয়াস *অলাতচক্র* গল্পটিকে মোটেও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। আমি তাঁহার এই অকপট ভাষণের তারিফ করিব। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিব যে *অলাতচক্র* কাহিনীটি মনের জোর যতটা বজায় রাখিয়া পড়িতে হইত ততটা জোর দিয়া পড়িবার ফুরসত পান নাই তিনি। কি জানি ইলিয়াস যদি

অলাতচক্রের ১৯৮৫ সংস্করণটিও হাতের কাছে পাইতেন হয়ত বিচারে আরেকটু নমনীয় হইতেন। হয়ত বা আরো কঠোরই হইতেন। কে জানে?

মহাত্মা ইলিয়াস মনের দুঃখে অনুযোগ করিয়াছেন আহমদ ছফা আল্লাহর কাছে যে মুনাজাত করিয়াছিলেন, আল্লাহ সম্ভবত সেই মুনাজাত মোটেও কবুল করেন নাই। আহমদ ছফা চাহিয়াছিলেন আল্লাহ যেন তাঁহার অপার করুণাবলে লেখকের চেতনাকে রাগ দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি রিপুর হাত হইতে মুক্ত রাখেন এবং তাহাকে সমুন্নত কোন দিগন্তের দিকে চালিত করেন। ইলিয়াসের অনুযোগ যদি সত্য হইয়া থাকে তো মানিয়া লইতে হইবে আল্লাহ আহমদ ছফার মুনাজাতটি কবুল করেন নাই। ইলিয়াসের দৃষ্টিতে আহমদ ছফা 'রীতিমত ক্রুদ্ধ' বলিয়া ধরা পড়িয়াছেন।

অলাতচক্র কাহিনীর ঘটনা যখন ঘটিতেছে তখন চলিতেছে বাংলাদেশের প্রসব বেদনা। ইলিয়াসের ভাষায় 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ' চলিতেছে। ইলিয়াস লিখিয়াছেন:

> ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এক কোটি বাঙালি তখন মানবেতর জীবন যাপন করছে, তাদের পরিবারের কেউ না কেউ পাকিস্তানী নরখাদক সেনাবাহিনীর হাতে নিহত, আহতের সংখ্যা আরো কয়েক গুণ। বাঙলাদেশের মানুষের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত, তাদের মেয়েরা লাঞ্ছিত। আবার বাঙালিদের মধ্যেই ইতর কিছু জানোয়ার লিপ্ত রয়েছে নিজেদের মা বোনদের সেনাবাহিনীর ছাউনিতে পৌঁছে দিতে। (ইলিয়াস ১৯৯৫: আট)

একই সময়ে কলিকাতায় ঠাঁই লইয়াছেন 'কয়েকজন শিল্পী, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীরা'। বিবরণটা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসেরই—আহমদ ছফার নহে। ইলিয়াস লিখিতেছেন, ইহারাই হলেন ছফার *অলাতচক্র* উপন্যাসের কুশীলব। ইলিয়াসের বিচারে ছফা তাঁহার উপন্যাসকর্মে স্বাধীনতার ব্যবসায়ীসুলভ প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতাটা বজায় রাখিতে পারেন নাই। আর এই ভারসাম্য হারাইবার ফল হইয়াছে মারাত্মক। পাঠকের মনে কোন আবেদন তৈরি হয় নাই। ইলিয়াসের বক্তব্য তাঁহার কথাতেই তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক :

> বাঙলাদেশের মানুষের বেদনা ও [আকাঙ্ক্ষাকে] বিদেশীদের কাছে তুলে ধরতে, শিল্পচর্চার মাধ্যমে দেশের ভেতরে বন্দি মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে এঁদের ভূমিকা তাৎপর্যময়। কিন্তু এঁদের কারো কারো কোনো কোনো তৎপরতা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেই সব কীর্তিকলাপ ছফা অনুমোদন করেন না এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। তিনি এতোটাই ক্রুদ্ধ যে তাঁর গোটা দৃষ্টি পড়ে থাকে চরিত্রগুলোর পিছলে-পড়া পায়ে। তাদের শরীরের অন্য অংশগুলো তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়। মানুষের

> খুচরাংশ পাঠকের মনে আবেদন তৈরি করতে পারে না। আর তাঁর মতো দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল শিল্পীর হাত থেকে এরকম টুকরা মানুষ পাঠক নেবেই বা কেন? (ইলিয়াস ১৯৯৫: আট–নয়)

একটা জিনিশ মহাত্মা ইলিয়াসের চোখও এড়াইয়া গিয়াছে। আহমদ ছফা শুদ্ধ একটি বিশেষ চরিত্রের সমালোচনা কিংবা বিচার করিতেছেন এমন তো নহে। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে পদ্ধতিতে চলিতেছিল তাঁহারই বিচার বসাইয়াছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাঁহারা লড়াই করিয়াছেন ছফা তাঁহাদের বিচারে বসেন নাই। যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধের নেতা বা নীতিপ্রণেতা তাঁহাদের রাজনীতি বা আদর্শের সহিত ব্যবহার বা চরিত্রের অসঙ্গতি তুলিয়া ধরাও আহমদ ছফার বিচার পরিকল্পনার অংশ।

তাহা ছাড়াও আরো একটা কথা আছে। ভারতবর্ষের জনগণের—বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের জনগণের—প্রীতি আর ভালবাসার ছবিও তিনি আঁকিয়াছেন। সেই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্র ও সরকারের নৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার তৎপরতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই জায়গাতেই আমরা দেখিতে পাই আহমদ ছফার পথ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পথ হইতে আলাদা হইয়াছে, মোড় লইয়াছে ভিন্ন দিকে।

আরো একটা কথা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে সবকিছু দেখিতেছেন। আর আহমদ ছফা দেখিতেছেন নিপীড়িত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জায়গায় দাঁড়াইয়া। তাই দেখা যায় ইলিয়াস আহমদ ছফার *ওঙ্কার* গল্পটির তারিফ করিতেছেন আবার একই সঙ্গে *অলাতচক্র*টির নিন্দা করিতেও তাঁহার আটকাইতেছে না। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না কেন তাঁহার প্রীতিভাজন আহমদ ছফা দুই গল্পে দুই পথ ধরিয়াছেন। ইলিয়াসের জবানিতে সেই অবোধের স্বীকারোক্তি, যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন :

> 'ওঙ্কার'-এ যেখানে একেকজন ব্যক্তিকে ছফা উত্তীর্ণ করেন বহু মানুষের [সঙ্ঘবদ্ধ] শক্তিতে, ক্রোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে 'অলাতচক্র' উপন্যাসে সেখানে একেকজনের টুকরা অংশগুলোকে ছুঁড়ে দিয়ে শিল্পী হিসাবে নিজের মাপটিকেই কি তিনি খাটো করে ফেলেন না? (ইলিয়াস ১৯৯৫: নয়)

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের যে স্তরকে আহমদ ছফা *ওঙ্কার* উপন্যাসে ধরিতে চাহিয়াছিলেন আমাদের ধারণা তাঁহার মূল সুর ছিল কি করিয়া পূর্ব বাংলার কৃষকের মন জাতীয় স্তরে উন্নীত হইতেছে তাহা দেখান। সোজাসুজি বলিতে, গ্রামের কৃষক কিভাবে শহরের মধ্যবিত্ত ও মজুরশ্রেণির সহিত এক কাতারে দাঁড়াইতেছে আর এক সুরে সাড়া দিতেছে তাহা দেখানই ছিল আহমদ ছফার প্রার্থনা।

অথচ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হইল তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ কৃষকদেরও অবিশ্বাস করিতে শুরু করিল। একদিকে দেখা যাইতেছিল ভারতে আশ্রয়গ্রহণের মধ্যে তাহাদের অবিশ্বাসী মুখচ্ছবির একাংশ। আরদিকে যুদ্ধের মধ্যেও ভেদনীতি দেখা যাইতেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে পদ্ধতিতে ভারতের শাসকশ্রেণির হাতে গিয়া পড়িল তাহাই আহমদ ছফার মূল আপত্তির স্থল। আর যে লোভ ও লালসার ছবি, যাহা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে তাহার আবির্ভাবকে ইলিয়াস শুদ্ধ কয়েকজনের—শিল্পী, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীর—পিছলে-পড়া পা আকারে দেখিতেছেন।

আমার ধারণা এই পিছলে-পড়া পায়ের শব্দের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার সহিত কৃষকশ্রেণির বাসনার বিচ্ছেদ যে শুরু হইয়াছে, জাতীয় ঐক্যে ফাটল যে ধরিয়াছে সেই ভাঙ্গনের তীব্র সুর, গোঙ্গানির পরিষ্কার আওয়াজও শোনা গিয়াছে। বলা বাহুল্য *অলাতচক্র* গল্পে আহমদ ছফা তাহাই দেখিবার সাধনা করিতেছেন। এই দেখিবার শক্তিই আহমদ ছফাকে আর দশ মধ্যবিত্ত লেখকের মাপে অনেক বড় জায়গায় উঠাইয়া দিয়াছে।

ওঙ্কার ও *অলাতচক্র* দুই মুহূর্তের দুই ছবি। এক মুহূর্ত জাতীয় ঐক্যের। আর মুহূর্ত জাতীয় দ্বন্দ্বের ও শ্রেণিসংগ্রামের। ইলিয়াস যদি দুই মুহূর্তের এই প্রভেদটা নির্ধারণ করিতেন তো দেখিতে পারিতেন আহমদ ছফা যেখানে সজ্ঘশক্তি আঁকেন সেখানে যেমন তেমনি যেখানে গৃহদাহ দেখাইবেন সেখানেও সমান অবিচল, সত্যনিষ্ঠ।

অলাতচক্র সম্বন্ধে ইলিয়াসের রায়টা এই কারণেই বড় বেদনাদায়ক। তিনি মনে করেন কাহিনীটির সম্ভাবনা অনেক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সম্ভাবনা সত্য হইয়া উঠিল না। ইলিয়াস মনে করেন ইহা বড়জোর উপন্যাস বিশেষের খসড়া হইয়াছে, 'বড়ো মাপের একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা' পাইবে এমন পদার্থ হয় নাই। স্বীকার করিতে হইবে নানান মুনির নানান মত। বাঙালি জাতীয়তাবাদও একশ্রেণির ধনিকশ্রেণির মতবাদ বৈ নহে। এই মতবাদে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবিচল আস্থাও সেই বৈচিত্রের অংশ, বিচিত্র বলিয়া মানিতে হইবে।

এই প্রস্তাবপক্ষে বাড়তি প্রমাণ পাইতেছি মহাত্মা ইলিয়াসের আর একটি উক্তিযোগে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, *অলাতচক্র* উপন্যাসে আমাদের এমন কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গেও দেখা হয় যাহারা পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া ভয় পাইতেছে আর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়-সম্ভাবনায় অসোয়াস্তি বোধ করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ ইলিয়াস স্বীকার করিলেন, 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় মুসলমানের একটি অংশের [প্রতিকূল] মনোভাব' একমাত্র আহমদ ছফার উপন্যাস ছাড়া 'আর কারো উপন্যাসে এসেছে কি-না সন্দেহ'। যাহা সম্পদ হইতে পারিত, ইলিয়াস মনে

করেন, আহমদ ছফার হাতে পড়িয়া সেই বস্তু বিপদেই পরিণত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, 'কিন্তু এদের এই মনোভাবের কোনো ব্যাখ্যা কি বিশ্লেষণ ছফা করেন না।'

আমরা দেখিব ইলিয়াসের এই উক্তি সত্যই দুর্ভাগ্যজনক—অসদুক্তি বৈ নহে।

তিন

বাংলাদেশের কয়েকজন 'শিল্পী, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী' যাঁহারা কলিকাতায় ঠাঁই লইয়াছেন তাঁহাদের একজনের নাম জাহিদুল হক। আহমদ ছফার প্রথম ছকে ইঁহার নাম 'ওয়াহিদুল' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। ভদ্রলোকের সহিত কাহিনীর বয়াতি দানিয়েলের প্রথম সাক্ষাৎ হইতেছে কলিকাতায়। দানিয়েল গিয়াছেন তনু ওরফে তায়েবার ঠিকানাটা ভিক্ষা মাগিয়া আনিতে। আমি ১৯৮৫ সালের সংস্করণ হইতে কিছু উদ্ধার করিতেছি। দানিয়েল তাহার বন্ধু ও অভিভাবক নরেশদাকে বলিতেছেন :

> সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখি একেবারে সিঁড়ির গোড়ার রুমটিতে বিছানো ফরাশের ওপর জাহিদুল হক মটকার পাঞ্জাবী পরে বসে আছে। হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা ইত্যাদি এক পাশে। একটা রিহার্সাল জাতীয় কিছু হয়ে গেছে অথবা হবে। জাহিদুল হকের সঙ্গে আরো চার পাঁচজন মানুষ। একজন বাংলাদেশের, বাকীরা স্থানীয়। আপনি তো জানেন জাহিদুল হক ন্যাকা ন্যাকা ভাষায় চমৎকার গল্প বলতে জানে। সেরকম একটা কিছু বোধ হয় করছিলো। পেছনে আরো তিনটি মহিলার মধ্যে হেলেনকে দেখলাম। মুখখানি বড়ো ম্লান। দাঁতে নখ খুঁটছে। কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে সেটি বোধ হয় উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে। জানেন তো হেলেনটা বরাবর বোকা এবং পরনির্ভরশীল। নিশ্চয়ই জাহিদুলের মধ্যে একটা নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছে। জাহিদুল হক সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে মেয়েটাকে একেবারে নিকে করে ফেলেছে। (ছফা ১৯৮৫ : ১১৯)

তাহাতে, দানিয়েল মন্তব্য করিতেছেন, জাহিদুল হকের কোন বেগই পাইতে হয় নাই। তিনি তো এই পরিবারটির অভিভাবকই ছিলেন ঢাকায়। হেলেন হইতেছেন পরিবারের তিন ভগিনীর সবচেয়ে ছোটটি। তিন ভগিনীকে তিনিই কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন অসুস্থ—মরণব্যাধি লিউক্যামিয়ায় আক্রান্ত—আরজন গিয়াছেন মুক্তিযুদ্ধে, হাসপাতালে কাজ করিতে। আপাতত নার্সের কাজ করিবার প্রশিক্ষণ নিতেছেন। এদিকে ছোট বোনটিকে জাহিদুল হক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন।

জাহিদুল হকের সমর্থনে দানিয়েল অধিক একটি তথ্যও আমাদের গোচরে আনিতেছেন। যেন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা একান্ত নিজ ইচ্ছায় করেন নাই। তাঁহার আসল (মানে পরিণীতা) স্ত্রী রাশেদা খাতুন কোন এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'পৌরুষের দাবি' বর্তমান পদক্ষেপটি লইতে হইয়াছে। তরুণটি ছিলেন তাঁহাদের ঔরসজাত কন্যার গৃহশিক্ষক। আহমদ ছফা এইভাবে প্রেমের আড়ালে আদ্যশক্তি বা অজাচারের দিকে আঙ্গুল তুলিতে শুরু করিলেন।

দানিয়েলের মুখে আমরা আরো একপ্রস্ত পিতা ও কর্তার সাফাই শুনিতেছি। *অলাতচক্র* দ্বিতীয় সংস্করণে এই দরাজদিল সাফাই অপর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়। 'জাহিদুলের বিরুদ্ধে,' দানিয়েল বলেন, 'আমার অনেক নালিশ আছে, তবু তার সৎসাহসের তারিফ করি। বিয়ে না করে অন্যভাবেও মেয়েটিকে সে ব্যবহার করতে পারত।' (ছফা ২০০৮ক: ২৪)

দানিয়েলের সহিত জাহিদুল হকের আরেকটি সাক্ষাৎ ঘটিল খোদ কলিকাতার পিজি হাসপাতালে। সেখানেই তখন তনুর চিকিৎসা চলিতেছে। টেপ বাজাইয়া তনুকে গান শুনাইতেছেন জাহিদুল। গলাটা তনুর ছোট বোন হেলেনের। দানিয়েল মন্তব্য করিলেন, হেলেনের গলাটা অত্যন্ত সুন্দর, 'সুরেলা'। তো তাহাতে যেন বিষাদের একটুখানি ছোঁয়াও আছে। এই ছোঁয়াটুকুর স্পর্শেই সঙ্গীতের সুদূরের আহ্বানটি যেন প্রাণ পাইয়া উঠে। বয়ানকার অকপটে স্বীকার করিতেছেন, জাহিদুল হকের অপরাধ আর যাহাই থাকে থাকুক, যাহাকে গান শেখান তাহাকে সারা মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া শেখান। (ছফা ১৯৮৫: ১৪০)

আহমদ ছফার দানিয়েল যেন বলিতেছেন প্রতিভাই শেষ কথা নয়। মানুষের সমাজ আছে, নীতি আছে, সবচেয়ে বড় কথা—আছে কর্তব্য। তনুর দরদি ভারতীয় চিকিৎসক ডা. মাইতির সহিত আলাপের ছলে দানিয়েল সেই অভিযোগই করিতেছেন। তাঁহার অভিযোগ শরণার্থী শিবিরে আমাদের মানুষের দুঃখদুর্দশার সীমা নাই, ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের তরুণদের হাজার ধরনের অসুবিধার মোকাবিলা করিতে হইতেছে অথচ কলিকাতার যত্রতত্র শুনা যাইতেছে বুড়া, আধবুড়া লোকেরা নতুন করিয়া বিবাহশাদি করিতেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যাহাকে বলিয়াছেন 'প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ' তাহা মনে হয় এই জাতীয় কথা মনে রাখিয়াই।

দানিয়েল বলিতেছেন ইহাদের এই আচরণ তাহার কাছে 'ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদের আচরণের তুলনায়ও বেশি মনুষ্যত্ববর্জিত, অমানুষিক মনে হয়।' অলাতচক্র প্রথম সংস্করণে দানিয়েল বলেন, 'আমি নিশ্চিত বলতে পারি, তনুর সঙ্গে এরা কশাইয়ের মতো ব্যবহার করেছে। তনু আমাকে কোনোদিন বলবে না, আমিও জিগগেস করবো না। তবু একথা সত্যি যে তনু যদি মারা যায়, সেজন্য দায়ী এরাই।' (ছফা ১৯৮৫ : ১৩৮)

তনুর মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিতে আর কত বাকি? বেশি বাকি নাই। খবরটা এতদিনে সকলেই জানিয়া গিয়াছে। এমন কোন বেদনাঘন দিনে সর্বংসহা মহিয়ষী তনুর ধৈর্যের বাঁধও ভাঙ্গিয়া গেল। তনু সেদিন জাহিদুল হককে এমন দুই কথা শুনাইয়া দিলেন যে কথা তিনি কোনদিন হয়ত দানিয়েলকেও বলিতেন না। সে কথাটি সরাসরি উদ্ধার করিতেছি। প্রথম সংস্করণেরই এই কথাটি দ্বিতীয় সংস্করণে দেখি নাই হইয়া গিয়াছে। আহমদ ছফা কেন এই কথাটি ফেলিয়া দিয়াছেন? সৈয়দ মনজুর মোরশেদও মনে হয় এই কথাটা আমল করিয়াছেন। (মোরশেদ ২০১১)

> তনু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, ন্যাকা ন্যাকা কথা সারাটা জীবন ধরে শুনে আসছি। আপনাকে আমাদের এখানে কে নিয়ে আসতে বলেছিলো? ঢাকায় থাকলে পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের তিন বোনকে হয়তো ব্যারাকে নিয়ে যেতো। তারা কি আপনার চাইতে খারাপ কিছু করতো? (ছফা ১৯৮৫: ১৫১)

এই কথাটাই একটুখানি আগে দানিয়েল অন্যভাবে বলিয়াছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ অনেক আনকোরা তরুণের মধ্যে জীবনের মহত্তম সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাইয়াছে। সমাজে বিপ্লবী শক্তির বিকাশ ঘটিয়াছে। অথচ আর একদিকে এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের মুখচেনা অনেক মহাপুরুষের মুখোশও খসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের জান্তব চেহারা দেখা যাইতেছে। (ছফা ১৯৮৫: ১৩৭)

শেষ পর্যন্ত তনুর জীবনাবসান হইল কলিকাতার পিজি হাসপাতালেই। তাঁহাকে সেই হাসপাতালে ভর্তি করিয়াছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। গল্পে স্বনামেই হাজির আছেন। তনুর মৃত্যুর খঁবর ছড়াইয়া পড়িল। দানিয়েল দেখিলেন হাসপাতালের গেটের গোড়ায় জাহিদুল হক। 'লেজঝোলা বানরের মতো' হাঁটিয়া আসিতেছেন। 'হাতে রজনীগন্ধার একটা তোড়া'। (ছফা ১৯৮৫: ১৫৬)

দুঃখের মধ্যে, দ্বিতীয় সংস্করণে আহমদ ছফা এই মহাকাব্যিক বয়ানটুকুও তুলিয়া লইয়াছেন। আমাদের বন্ধু সৈয়দ মনজুর মোরশেদ আশঙ্কা করিয়াছেন, আহমদ ছফাও হয়ত আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না। (মোরশেদ ২০১১) অবশ্য তুলিয়া লইয়াও কি তিনি শেষরক্ষা করতে পারিলেন?

চার

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অভিযোগ হইতে আহমদ ছফা ছাড়া পাইলেন না। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলিকাতায় আশ্রয় লওয়া বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীদের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা একান্ত খণ্ডিত বা আংশিক—অভিযোগ করিয়াছেন

ইলিয়াস। সকল বৃত্তান্তই এক হিশাবে আংশিক। প্রশ্ন হইতেছে তাহাতে যে চিত্র পাওয়া যাইতেছে তাহার আদৌ কোন মূল্য আছে কিনা।

মানুষের ভাষা বিশেষ বিশেষ নিয়ম বাঁধিয়া অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। এক নিয়মের নাম রূপক, আর নিয়মের নাম লক্ষণা। রূপকের অর্থ কোন এক শব্দের প্রথাগত অর্থ ছাড়াইয়া অন্য অর্থে তাহার সদ্ব্যবহার। এই ব্যবহারেরও আবার নানান প্রকার আছে। এক প্রকার ব্যবহার আছে যাহাতে কোন সম্বন্ধই নাই এমন দুইটি শব্দের একটিকে অন্যটির অর্থ বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'লাল গোলাপ' মানে ভালবাসা, 'কালো পতাকা'র অর্থ শোক ইত্যাদি।

আর এক প্রকার ব্যবহার আছে যাহাতে আমরা আংশিক সাদৃশ্য দেখি, আংশিক কল্পনা করিয়া লই। যেমন, বলি 'আগ্নেয়গিরির মুখ', 'চেয়ারের পা', 'সরকারের হাত' ইত্যাদি। তৃতীয় ধরনের রূপকের মধ্যে সাদৃশ্যটা প্রকট। এক শব্দ সেখানে অর্থের দিক হইতে অন্য শব্দের অন্তর্গত। যেমন নৌকা দেখিলাম অর্থে পাল দেখিলাম, বা চা খাইয়াছি অর্থে কাপ খাইয়াছি বলা। দশটি পাল দেখিলাম মানে দশটি নৌকা দেখিলাম। একইভাবে এক কাপ খাইয়াছি মানে এক কাপ চা (বা কফি) খাইয়াছি।

তৃতীয় প্রকার অলঙ্কারের অপর নাম লক্ষণা। ইহাও আবার রূপকের আর একটা ধরন বৈ নহে। লক্ষণার বৈশিষ্ট্য আছে এমন দুই শব্দের মধ্যে একটিকে অন্যটির অর্থ বুঝাইতে যদি আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে অন্যায় নাই। নতুন নতুন অর্থসৃষ্টির এই পথ পূর্বসূরি লেখকেরা শুদ্ধ নহেন, ভাষায় যাঁহারা বাক্য গঠন করেন তাঁহারা সকলেই ধরিয়া থাকেন। এখানে সাদৃশ্য নহে, সাযুজ্যই বড় কথা।

গ্রিক মনীষী মহাত্মা আরস্তুর একটা বিখ্যাত উদাহরণ 'জীবনসন্ধ্যা'। আমরা যখন বলি জীবনসন্ধ্যা (বা 'জীবন-প্রভাত') তখনো আমরা রূপকেরই আশ্রয় লইয়া থাকি। এখানে একই সাথে দুই দুইটা রূপক একত্র করা হইয়াছে। একটা সাদৃশ্য গোটা জীবনকালের সহিত পুরা একটা দিনের। দ্বিতীয় সাদৃশ্যটা সকালের সহিত সন্ধ্যার। দুই সাদৃশ্য এক জায়গায় আনিয়া আমরা বলিলাম দিনের সহিত সন্ধ্যার (বা প্রভাতের) যে সম্বন্ধ, জীবনকালের সহিত বার্ধক্যেরও (বা বাল্যকালের) সেই সম্বন্ধই। অতয়েব জীবনসন্ধ্যার (বা জীবন প্রভাতের) মানে দাঁড়াইল বার্ধক্য ওরফে বৃদ্ধবয়স (বা বাল্যকাল)। (গ্রিগ ২০০৮: ১৬৭–৬৮)

শুদ্ধ বাকশিল্পে নহে, চলচ্চিত্র বা স্থাপত্যশিল্পেও মানুষ বহুদিন ধরিয়া এই রূপক ও লক্ষণার আশ্রয় লইয়া চলিতেছে। কোন কথাকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহার করাও এক প্রকারের রূপক বৈ নয়। যেমন 'যুদ্ধ মানে ভালবাসা' কিংবা 'জন্ম মানে মৃত্যুদণ্ড'। এই শেষের কথাটা খোদ আহমদ ছফাও তাঁহার একটি কবিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

জন্ম মানে মৃত্যুদণ্ড
আজ কাল কিংবা পরে কার্যকর হবে
বন্ধুর মৃত্যুর জন্য শোক কেনো তবে!
(ছফা ২০০০: ৪৩)

আহমদ ছফার *অলাতচক্র* উপন্যাসে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে সেগুলি একদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অংশবিশেষ। সেই দিক হইতে এগুলিকে যুদ্ধের লক্ষণা বলা অবিধেয় নহে। পাল যে অর্থে নৌকার লক্ষণা সেই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের এক অংশও মুক্তিযুদ্ধই। মজার জিনিশ এই লক্ষণার একেকটা লক্ষণকেও আবার সমগ্রের রূপক আকারে ব্যবহার করা যায়। ভাষার নিয়মে তাহাও বিধেয়।

তনুর বেদনাঘন গহন প্রেমের কাহিনীটিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশেষত তাহার প্রস্তুতিপর্বের রূপক আকারে গ্রহণ করিতে আপত্তিটা কোথায়? আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিজেই কি বলেন নাই আহমদ ছফা *ওঙ্কার* গল্পে একেকজন ব্যক্তিকে বহু মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিতে উত্তীর্ণ করাইয়াছেন? *ওঙ্কার* গল্পের বোবা বৌ—যাহার নাম জানা যায় নাই, হয়তো তিনি বোবা বলিয়াই—শেষ পর্যন্ত বাক্য একটা হইলেও তো উচ্চারণ করিয়াছেন। বলিয়াছেন 'বাংলা'।

তাহা হইলে তনু ওরফে তায়েবা কি দোষ করিলেন? তিনি মরিয়াছেন। ইহাকে কি সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির মৃত্যু আকারে আমল করা যায় না? তনু যদি আদর্শবাদের পদ বা পদকল্পতরু হইয়া থাকেন তাহা হইলে জাহিদুলই বা ব্যক্তিসর্বস্বতার, লোভ ও লালসার পদ হইবেন না কেন? তাঁহাকে মানুষের খুচরাংশ বা টুকরা মানুষ বলিতে হইবে কেন?

তনুর যেমন আছে একদিকে আদর্শ, প্রেম, প্রবণতা ও পারিবারিক বন্ধনের টান তেমনি আরদিকে আছে হতাশা, অসুখ, আর গৃহসন্ধানের আকুতিও। সবচেয়ে বড় কথা সকল মানুষই দেশ ও কালের সন্তান। কিন্তু তাহাকে যদি আদর্শের 'পদ' বলিয়া মানিতে পারি—তাহাকে যদি কল্পকন্যা রওশন আরার চাইতেও বেশি ত্যাগী মানুষ বলিয়া গ্রহণ করি—আপত্তি থাকিতে পারে না। একই যুক্তিতে দেশ ও কালের মধ্যে যে ভাঙ্গনের প্রবণতা, মুক্তিযুদ্ধের যে উৎকেন্দ্রিকতা, তাহারও লক্ষণাত্মক রূপক হিশাবে জাহিদুল হক আর রাশেদা খাতুন পরিবারকে কেন গ্রহণ করা যাইবে না?

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রতিভায় ও প্রভাবে আমাদের কালের সেরা লেখকদের মধ্যে। তাই তাঁহার লেখার যথার্থ মর্যাদা দেওয়া দরকার। এই দরকার আছে বলিয়াই আরো একটা কথা আমাকে বলিতে হইবে।

পাঁচ

১৯৮৫ সালের গোড়ার দিকে কাটা ছক দুইটি সামনে রাখিয়া আহমদ ছফা আগাইতেছিলেন। তনুর কাহিনীর মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথাটা পাড়িবেন। তনুর মধ্যে যদি বাংলাদেশের কৃষককে দেখিতে পাই তো কলিকাতার পিজি হাসপাতালের মধ্যে দেখিতে পাই সারা পৃথিবীকে। কাহিনীর দুই চূড়া আসিয়া মিশিয়াছে আজব শহর কলিকাতায়।

অলাতচক্র পহিলা সংস্করণে এই মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীটা কিছুটা সংক্ষেপে বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাতে কয়েকটি নতুন পর্ব যোগ করা হইয়াছে। তবে এ পার্থক্য বাহ্য। মূল পরিকল্পনার কাঠাম অভিন্নই আছে। মুক্তিযুদ্ধকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে? এক কথায় বলিতে, উৎসাহের সঙ্গেই। তার মানে এই নয় যে সেখানে কোন সমস্যা নাই।

হাসপাতাল হইতে শুরু করা যাইতে পারে। তনু ওরফে তায়েবাকে যিনি সেখানে ভর্তি হইতে সাহায্য করিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ স্বপ্নপরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে রাজনৈতিক দলের সহিত তিনি সংযুক্ত তাহার নাম উপন্যাসে আসে নাই—এমনও নয়। সিকান্দার আবু জাফরের মতন সত্যবাদী বাংলাদেশি ধুরন্ধরও একদা তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনিও ইতিহাসের পাতা হইতে উপন্যাসে উঠিয়া আসিয়াছেন। জাফরের জবানিতে আমরা জানিতে পারি দীপেন্দ্রনাথ কমুনিস্ট হইয়া গিয়াছেন। (ছফা ১৯৮৫: ১৫৫) ইনি স্বনামধন্য লেখক এবং পত্রিকা সম্পাদক ইত্যাদি তথ্য হয়ত বাহুল্যই মনে হইয়াছে দানিয়েলের।

আহমদ ছফা ডা. মাইতি নামে যে সহৃদয় তরুণের চরিত্রটি লইয়াছেন তিনিও পশ্চিমবাংলার হৃদয় হইতে আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একই পথে দানিয়েলের বান্ধবী পরিচয়ে আসিয়াছেন অর্চনা ওরফে সুনন্দা। তিনিও অবিস্মরণীয়া। একদা নকশালবাড়ির লাল আগুনে পুড়িয়া শান্তিনিকেতনের চাকরি হারাইয়াছেন তিনি। ভারতের কমুউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও এই উপন্যাসের কাঠামের মধ্যে উঁকি দিয়াছেন দুই চারিবার। সিপিএম দলের মার্কসবাদী প্রকাশক মজহারুল ইসলাম সশরীরে হাজির আছেন।

১৯৯৩ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে আহমদ ছফা কলিকাতার এমন একটা বাঙালি মুসলমান পরিবারে আমাদের লইয়া যান যাঁহাদের বাড়িতে কেহই বাংলা জবানে কথাবার্তা বিশেষ এস্তেমাল করেন না। দানিয়েলের বয়ান অনুসারে তাঁহাদের স্থায়ী নিবাস বর্ধমান হইলেও ইঁহারা হাড়মাসে অস্থিমজ্জায় নিজেদের পশ্চিমদেশীয় মনে করেন। দানিয়েল জানাইতেছেন এই ব্যাপারে উর্দুভাষাটা তাঁহাদের বেশ কাজে লাগিয়াছে। দানিয়েল ঘটনাচক্রে যে পাড়ায় পদধুলি দিতে বাধ্য হইয়াছেন সে পাড়াটির নাম ফ্রি স্কুল স্ট্রিট। এই এলাকার কসাইরা—

দানিয়েল শুনিয়াছেন—উনিশশ ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এখনো ভারতে পাকিস্তানে কোন গোল বাধিলে এই ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হইতে পাকিস্তানের পক্ষে মিছিল বাহির হইয়া পড়ে। এই এলাকা স্বভাবতই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয় নাই।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলিয়াছেন আহমদ ছফা ভারতীয় মুসলমানদের এই প্রতিকূল মনোভাবের কোন ব্যাখ্যা কি বিশ্লেষণ করেন নাই। সবিনয় নিবেদন এই, অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নহে। দ্বিতীয় সংস্করণে তায়েবার চাচা আসগর আলী শাহ জানিতে চাহিলেন, যুদ্ধ কেমন চলিতেছে? দানিয়েল জবাব ছিলেন, সবটা তো জানি না, তবে নিশ্চিত যে একদিন আমরা জিতিব।

শাহ সাহেব বলিয়া দিলেন, জিতিবেন তো বটে, তো আপনারা জিতিবেন না, জিতিবে 'হিন্দুস্থান এবং হিন্দুরা'। আপনারা তো জানেন না লাখো জান কোরবান করিয়া মুসলমানেরা পাকিস্তান কায়েম করিয়াছে। আর আপনারা সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে যাইতেছেন। (ছফা ২০০৮ক: ৭৫)

দানিয়েল একটা প্রশ্ন করিলেন—আপনারা পাকিস্তানকে এত ভালবাসেন, তবু পাকিস্তানে বসবাস করিতে গেলেন না কেন? জওয়াবে শাহ সাহেব বলিলেন—শুরুতে আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম কলিকাতা পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত কলিকাতা তো হিন্দুস্তানের অংশ হইয়া গেল। আমরা সাতপুরুষ ধরিয়া এই কলিকাতায় মানুষ। ইহার বাহিরে কোথাও যাইতে হইবে সেই কথা চিন্তাও করিতে পারি নাই। (ছফা ২০০৮ক: ৭৬)

আরো একটি কারণে তাঁহারা পাকিস্তানে গেলেন না। গেলে তো সহজে যাইতে হইত পূর্ব পাকিস্তানেই। তাঁহাদের মনে একটা সন্দেহ বরাবর জারি ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা সত্যকারের এসলামি হুকুম আহকাম মানিয়া চলে একথা বিশ্বাস করিতে মন চাহিত না। আহমদ ছফার ব্যাখ্যাটাই দানিয়েল দিয়াছেন। এ কথা ধরিয়া লইতে দোষ নাই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই জায়গাটা হয়ত এড়াইয়াই গিয়াছেন।

দানিয়েল মনে করেন ইঁহাদের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। কেন? তিনি মনে করেন, 'পাকিস্তান কী বস্তু, বাস্তব অর্থে তার কোন প্রত্যক্ষ ধারণা এঁদের নেই। এঁরা আছেন তাঁদের স্বপ্ন এবং স্মৃতির জগতে। যেহেতু তাঁরা মনের থেকে হিন্দুদের ঘৃণা করেন সেজন্য তাঁদের একটা কল্পস্বর্গের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশের চিন্তা-ভাবনা এই একই রকম।' (ছফা ২০০৮ ক: ৭৬)

সিপিআই (এম) নেতা মজহারুল ইসলামও মুসলমান বটেন। তিনিও মনে করেন ভারতীয় গোঁড়া মুসলমানেরা বাংলাদেশের মানুষদের হিন্দুদের খেলার পুতুল ছাড়া অন্যকিছু মনে করেন না। (ছফা ২০০৮ক: ৯২)

ঐ দিকে প্রতিক্রিয়াশীল কিছু হিন্দুদলেরও কয়েকটি চরিত্র *অলাতচক্র* উপন্যাসে হাজির হইয়াছেন। বিশেষ দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহাদেরই একজন বলেন, আপনারা মুক্তিযুদ্ধ করিতেছেন অথচ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নাম পর্যন্ত জানেন না, তাহা কেমন করিয়া হয়। (ছফা ২০০৮ ক : ৯৫)

অলাতচক্র উপন্যাসের দুই পুরাণ—প্রেম ও যুদ্ধ কিংবা তনুর মৃত্যু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার হতাশা—শেষে এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। প্রথম সংস্করণে ছফা লিখিয়াছিলেন দানিয়েলের মনের মধ্যে কি একটা খচখচ করিতেছিল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। দানিয়েল ভাবিতেছেন পাকিস্ত ানিরা বাংলাদেশের শত্রু, কিন্তু ভারতকেও তিনি ঠিক বন্ধু ভাবিতে পারিতেছেন না। তাঁহার জবানিতে আমাদের দুঃখই ধরা পড়ে :

> ভারত যুদ্ধে জয়ী হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, একথা জানি। কিন্তু মনের মধ্যে কি একটা খচখচ করছিলো। উনিশশো বাহান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত আমরা যতো আন্দোলন করেছি, যতো রক্ত দিয়েছি, তার পরিণতি কি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে এই একটা যুদ্ধ! (ছফা ১৯৮৫: ১৫৩)

ছয়

যে রাত্রে তনুর জীবনাবসান হইল সেই রাত্রিটা দানিয়েল তাঁহার বান্ধবী সুনন্দাদেবীর গোলপার্কের বাসায় যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুনন্দাদের বাড়িতে সেই রাত্রে তুমুল আলোচনা চলিতেছিল। যুদ্ধের আলোচনা। ততদিনে কুমিল্লার পতন হইয়াছে, যশোর ভারতীয় বাহিনীর দখলে চলিয়া গিয়াছে। তিন দিক হইতে সাঁড়াশি আক্রমণ করিয়া ভারতীয় বাহিনী ঢাকার দিকে ছুটিয়াছে। ঢাকার পনের মাইলের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। আগামীকাল বারটার মধ্যে ঢাকার পতন ঘটিবে বলিয়া বাসার লোকজন বলাবলি করিতেছে।

হিশাব কষিলে পাওয়া যাইবে রাতটি ডিসেম্বর পনের তারিখের দিবাগত বা পরের রাত্রি। পিজির গেটে ট্যাক্সি ছাড়িয়া সুনন্দা আর দানিয়েল হাঁটিয়া চলিলেন। তনুর ঘরের সামনে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলেন করিডোরের একপাশে একটি খাটে তাঁহার মৃতদেহ চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। সুনন্দার সামনে দানিয়েল বলিলেন, 'তার মৃতদেহ এখন অন্য লোকের সম্পত্তি।' (ছফা ১৯৮৫: ১৫৬) মৃত্যুর মধ্যেই তাহলে মুক্তি? এই রূপকটা কিসের আলামত?

বেলা সাড়ে এগারটার দিকে গঙ্গার ধার হইতে ঘুরিয়া আসিলেন দানিয়েল। সঙ্গে বান্ধবী সুনন্দা। শুনিলেন গোটা কলিকাতা শহরে বাজি ফোটার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সর্বত্র উৎসবের প্লাবন। প্রতি বাড়ির শিয়রে শিয়রে শোভা পাইতেছে অশোকচক্র আঁকা পতাকা। বুঝিলেন, ঢাকার পতন হইয়াছে। (ছফা ১৯৮৫: ১৫৭)

দ্বিতীয় সংস্করণে এই জায়গাটা আহমদ ছফা একটুখানি বদলাইয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয়বারের বয়ান অনুসারে তায়েবা দেহ রাখিয়াছিলেন ডিসেম্বরের পনের তারিখে নহে, চার তারিখে। দানিয়েলের জবানিতেই আমরা এই নিবন্ধের তামাম শোধ করিব :

> ডিসেম্বরের চার তারিখ ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐদিন সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত গোটা কলকাতা শহরে বিমান হামলার ভয়ে কোন আলো জ্বলেনি। সেই ব্ল্যাক আউটের রাতে তায়েবার কাছে কোন ডাক্তার আসতে পারেনি। কোন আত্মীয়-স্বজন পাশে ছিল না। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে যে অন্ধকার কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে তায়েবা আত্মবিসর্জন করল। (ছফা ২০০৮ক: ১৩৪)

আহমদ ছফার *অলাতচক্র* সেই অন্ধকারের মধ্যেই একটা হীরার টুকরার মতন জ্বলজ্বল করিতেছে। তাই তায়েবার আত্মবিসর্জন সম্পূর্ণ বৃথা গিয়াছে—এমন কথা বলিবার উপায় নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, ইহাতে আমাদের আরো লাভ হইয়াছে। আহমদ ছফা যুদ্ধপুরাণ ও প্রেমপুরাণের মধ্যে রূপকপুরাণ বা এলেগরির সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। এই আলোচনা অন্য কোন প্রবন্ধে লিখিত হইবে।

দোহাই

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'ভূমিকা', *আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৫), পৃ. [সাত–এগার]।

২. সলিমুল্লাহ খান, 'রাষ্ট্র ও বাসনা,' *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান সম্পাদিত, জাতীয় সাহিত্য ১ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী এবং এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ২০১০), পৃ. ২২১–৩৮।

৩. আহমদ ছফা, 'অলাতচক্র', *আহমদ ছফা রচনাবলি*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত ৩য় খণ্ড (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০৮ক), পৃ. ৯–১৩৪।

৪. _____ 'অলাতচক্র উপন্যাসের প্রাক-চিন্তা,' *আহমদ ছফা রচনাবলি*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০৮খ), ৪৮০ ও ৪৮১ পৃষ্ঠার মধ্যস্থলের ২২ ও ২৩তম পৃষ্ঠায় স্থাপিত আলোকচিত্র।

৫. _____ 'পথিক,' *আহমদ ছফার কবিতা* (ঢাকা: শ্রীপ্রকাশ, ২০০০) পৃ. ৪৩।

৬. _____ 'অলাতচক্র', *নিপুণ*, ঈদসংখ্যা '৮৫ (জুন ১৯৮৫), পৃ. ১০৫–৫৭; *অর্থ: আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা পত্রমালার* তৃতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৪১৮) পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ৪৭–১৫৩।

৭. সৈয়দ মনজুর মোরশেদ, 'আহমদ ছফা, অলাতচক্র, কিছু স্মৃতি,' *দৈনিক পূর্বকোণ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১; *অর্থ: আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা পত্রমালার* তৃতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৪১৮) পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ১৯৪–৯৯।

৮. মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩)।

৯. শাকিনা হাসীন গ্রন্থিত, 'আহমদ ছফা: জীবনপঞ্জী,' মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৪৬৯–৭৮।

১০. Walter Beltz,*God and the Gods: Myths of the Bible*, trans. Peter Heinegg (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1983).

১১. Russell Grigg, *Lacan, Language, and Philosophy* (Albany, NY: State University of New York Press, 2008).